পূর্ব বাঙলার গল্প সংগ্রহ

মিহির আচার্য

সম্পাদিত

শুকসারী প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৬৯

শান্তি আচার্য
শুকসারী প্রকাশক
১৭২/৩৫ আচার্য জগদীশ বসু রোড
কলকাতা ১৪

বীরেশ্বর চক্রবর্তী
স্ট্যাণ্ডার্ড আর্ট প্রিণ্টার্স
১১৫-এ রামমোহন সরণি
কলকাতা ৯

প্রচ্ছদ চারু খান

দাম ৮·০০

সম্পাদকের কথা

আত্মরক্ষা এবং আত্মবিকাশের জলন্ত প্রশ্নে আজ যখন বাঙলা দেশ উত্তাল সেই পরম লগ্নে পূর্ব বাঙলার গল্পসংগ্রহের পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ এপার বাঙলার পাঠকদের উপহার দেওয়া গেল। সংগ্রহটি অধিক প্রতিনিধিত্বমূলক করবার উদ্দেশ্যেই প্রথম সংস্করণের তেরোটি লেখকের মধ্যে একজনকে তুলে নিতে হয়েছে, আরেকজনের নতুন গল্প নির্বাচন করেছি। তুলনামূলক বিচারে প্রথম সংস্করণের সহৃদয় পাঠক আশা করি আমার এই সংশোধনে একমত হবেন। উপরন্তু প্রথম সংস্করণের গল্পের সঙ্গে আরো নয়জন লেখকের জন্যে এই সংস্করণে স্থান করে দিতে হয়েছে। সংগ্রহের গুরুতর বাধার কারণেই ইচ্ছে থাকলেও এই যশস্বী লেখকদের পূর্বে গ্রন্থভুক্ত করা যায়নি। সম্পাদক সেই ত্রুটি বিনয়ের সঙ্গে স্বীকার করেন।

নতুন সংস্করণে ওপার বাঙলার কাহিনী-শাখার চরিত্রকে ধ্রুবপদী এবং ঐতিহাসিক করবার গরজে সম্পাদককে সচেতন দলিল লেখকের ভূমিকা নিতে হয়েছে। লেখক নির্বাচনে কখনো কখনো এমন সমস্যায় পড়তে হয়েছে যা প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে নিন্দিত হতে পারে, কিন্তু ঐতিহাসিক বাস্তবতার প্রয়োজনেই তাদের বর্জন করতে পারা যায়নি। একথাও আমার মনে হয়েছে যে এমনও হতে পারে ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারীদের জন্যে এই সংকলিত গ্রন্থটিই একদিন একমাত্র প্রমাণ হিসেবে দাখিল করা যাবে!

বর্ষীয়ান্ লেখক ইব্রাহীম খাঁ অথবা আবুল মনসুর আহমদ সাহেবের নির্বাচনে গল্পের দাবিই মুখ্য হয়ে উঠেছে, তাঁদের নিজস্ব রাজনীতি এখানে প্রশ্রয় পায়নি। ওপার বাঙলার গল্পের সম্পূর্ণ পরিচয় এপার বাঙলায় তুলে ধরবার ঐতিহাসিক আবশ্যকতায় খাঁ সাহেবের দাংগার পরিপ্রেক্ষিতে অপূর্ব মানবিকতায় ভাস্বর 'দুইটি মানুষ' গল্পটি কিংবা আহমদ সাহেবের লবণের দুর্মূল্যতার বিরুদ্ধে 'নিমকহারাম' গল্পের তীব্র ব্যঙ্গকে সম্পাদক অস্বীকার করতে পারেন না।

প্রবীণ লেখক আবুল ফজল এই সংস্করণে ন্যায্য স্থান করে নিয়েছেন। ত্রিশের অত্যাধুনিক সাহিত্যান্দোলনের ভাবরসে পুষ্ট এবং পরবর্তীকালে ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজের বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম তরঙ্গ

আবুল ফজলের সৃষ্টিপ্রাচুর্য অশেষ প্রাণরসের প্রতীক। মৌলানা বা হাজি সাহেবের ধর্মের খোলসের আড়ালে অন্তরঙ্গ জৈবিক চিত্র রচনায় লেখক অসমসাহসিক। লেখকের প্যাশান টলস্টয়ের গল্পের ভাররসকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

আগের সংস্করণে শওকত ওসমান, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবু জাফর শামসুদ্দীন, আবু রুশ্‌দ, প্রমুখ খ্যাতনামা লেখকদের অনুপস্থিতি সম্পাদকের নিজের কাছেই বেদনার ব্যাপার ছিল। এই সংস্করণে তাঁদের উজ্জ্বল উপস্থিতি পরিতৃপ্তিজনক।

এদেশে প্রায়-অপরিচিত আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী এবং ওয়াজেদ মজনু। এঁদের গল্পদুটি বাঙালী পাঠককে যথেষ্ট চিন্তিত করবে।

তরুণ লেখকের মধ্যে আবদুল মান্নান সৈয়দ ওদেশে তাঁর বাজেয়াপ্ত গল্পগ্রন্থ 'সত্যের মতো বদমাশ'-এর জন্যে এপার বাঙলায়ও কৌতূহলের কারণ হয়েছেন। এঁর রচনাশৈলীর সঙ্গে পরিচিত হবার আগ্রহেই 'আত্মহত্যা ব্যবসায়ী' গল্পটি গ্রন্থভুক্ত করা হল।

এরূপ একটি ঐতিহাসিক সংকলনে লেখক-পরিচিতির অভাবের কারণ সংগ্রহের বাস্তব অসুবিধে, আশা করি সকলেই উপলব্ধি করতে পারবেন। অনুকূল পরিস্থিতিতে এই অভাব দূর করার চেষ্টা করা হবে।

প্রথম সংস্করণের মতোই এই পরিবর্ধিত সংস্করণ বিদগ্ধ-সমাজে আদৃত হলে সম্পাদক কৃতজ্ঞ হবেন।

মিহির আচার্য

সূচীপত্র

ইব্রাহীম খাঁ	দুইটি মানুষ	৯
আবুল মনসুর আহ্‌মদ	নিমকহারাম	১৪
আবুল ফজল	রূপ ও রোপেয়া	২৪
শওকত ওসমান	দুই চোখ	৩৫
আবু রুশ্‌দ	বকশিস্	৪৭
আবুল কালাম শামসুদ্দীন	পথ জানা নাই	৫৭
আবু জাফর শামসুদ্দীন	নেতা	৬৬
সরদার জয়েনউদ্দীন	মামলা	৭৩
আলউদ্দিন আল আজাদ	বৃষ্টি	৮১
আতোয়ার রহমান	পুঁইশাক	৯৬
সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ্‌	একটি তুলসীগাছের কাহিনী	১১০
শাহেদ আলী	জিবরাইলের ডানা	১১৮
শওকত আলী	তৃতীয় রাত্রি	১৩৫
আহমদ মীর	অবেদ্য	১৪৯
হায়াৎ মামুদ	অবিনাশের মৃত্যু	১৫৭
হাসান আজিজুল হক	সুখের সন্ধানে	১৬৮
জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত	গোলাপের নির্বাসন	১৭৪
আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী	রসবতী	১৮৩
ওয়াজেদ মজমু	অন্ধকার	১৮৯
হুমায়ুন কাদির	আশ্চর্য প্রতিমা	২০০
হুমায়ুন চৌধুরী	নশ্বর স্রোত	২১২
আবদুল মান্নান সৈয়দ	আত্মহত্যা-ব্যবসায়ী	২২০

দুইটি মানুষ

ইব্রাহীম খাঁ

১৯৪৬। কলিকাতা। হিন্দু-মুসলমানে তুমুল দাঙ্গা। সে দাঙ্গার প্রমত্ত আহ্বানে মানুষের ভিতরের সুপ্ত শয়তান অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিয়াছে। কোন দিন কোন পরিচয় নাই, কোন কালে কোন কলহের কোনও কারণ ঘটে নাই; উভয়েই মানুষ, শুধু বাহিরের একটি চিহ্ন—একটি টুপি কিংবা একটি টিকি, কেবল ইহারই জন্য আজ একে অন্যের বুকে নির্মমভাবে ছুরি বসাইতেছে। অথবা হয়তো পরিচয় আছে, হয়তো গত দশ বৎসর যাবৎ ইহারা এক পথে চলে, এক বাজারে খরিদ করে, এক হোটেলে বসিয়া চা খায়, গল্প করে, হাসি-তামাশায় মাতিয়া ওঠে। সেই দীর্ঘ-পরিচিত অন্তরঙ্গ, তাহারাই আজ সহসা শয়তানের ইশারায় একে অন্যের গলা কাটে, বাড়িতে আগুন দেয়, নিরপরাধ দুধের বাচ্চাকে পর্যন্ত মায়ের বুক হইতে ছিনিয়া আনিয়া স্পষ্ট দিবালোকে প্রকাশ্য রাজপথে হত্যা করে।

রক্ত, ভস্ম, মৃত্যু—রাজধানীর পথে হাহাকার করিয়া বেড়ায়।

একটি মধ্যবয়সী মুসলমান। মুখে দাড়ি, মাথায় টুপি, পরনে লুঙ্গী। কয়েকজন হিন্দু দিনের বেলায় তাহাকে রাস্তায় ধরিয়া বাড়িতে আনিয়া লুকাইয়া রাখে; সন্ধ্যার পর অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া তাহাকে এক মন্দিরে লইয়া যায়। পুরোহিতকে ডাকিয়া বলে: ঠাকুর, বলির জন্য এনেছি, তার ব্যবস্থা করুন।

ঠাকুর নীরবে বলির জীবকে দেখে, তাহার পর স্থিরকণ্ঠে আগন্তুকদিগকে বলেন: তোমরা বেশ করেছ; একটা শত্রু বিনাশও হবে, মা কালীর পূজাও হবে। আচ্ছা ভাই, তোমরা এখন ওকে রেখে যাও, নইলে কে তোমাদেরকে কোথা হতে দেখে ফেলবে। পাঁজি-পুথি দেখে শুভ-লগ্নে আমি ওর যথাযোগ্য বলির ব্যবস্থা করে নিব।

আগন্তুকেরা তুষ্ট হইয়া চলিয়া যায়। বন্দী মন্দিরের এক কোণে বসিয়া কাঁপে আর মনে মনে 'আল্লা' 'আল্লা' করে।

সময় যায়। রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইয়া আসে। মন্দির প্রাঙ্গণ হইতে একে একে পূজারীরা নিজ নিজ ঘরে যায়।

পুরোহিত বাহিরে আসিয়া এদিক ওদিক লক্ষ্য করেন, দেখেন কোথাও কেহ নাই। তখন তিনি মুখ তুলিয়া আকাশের পানে চান—বিস্ময়ে ভাবেন, একি! আজ আকাশের তারাদের চোখে এত জল! তাঁহার আত্মা হাহাকার করিয়া ওঠে—আর্তস্বরে জিজ্ঞাসা করে: কেন? কেন? কেন?

পুরোহিত বন্দীর কাছে আসেন। বলেন: এস, প্রস্তুত হও।

বন্দী শিহরিয়া ওঠে; ভাবে—তার জীবনের চরম মুহূর্ত বুঝি উপস্থিত! অভিভূতের মত পুরোহিতের সাথে সাথে চলে।

খানিক দূর আসিয়া মন্দিরের দেওয়ালের একটা ভাঙা অংশ দেখাইয়া পুরোহিত বলেন: ওঠ, ঐখান দিয়ে পালিয়ে যাও।

বন্দী পুরোহিতের দিকে আবার বিস্ময়ে চায়,—তাহার চোখ ছলছল। বলে: অনেক উঁচু যে।

পুরোহিত বলেন: আমার কাঁধে পা দিয়ে ওঠ। বন্দী ইতস্তত করে।

পুরোহিত আদেশের সুরে বলেন: জলদী কর, ভাই, এক মুহূর্তও আর দেরি করতে পারবে না।

বন্দী পুরোহিতের কাঁধে চড়ে, তাহার ভারে পুরোহিতের ক্ষীণ দেহ কাঁপিয়া ওঠে, কিন্তু তাঁহার বুকে উৎসারিত হইয়া ওঠে অমানুষিক বল, তিনি ঠিক দাঁড়াইয়া থাকেন।

কিন্তু হায়। ইহাতেও যে দেওয়ালের ফাটল নাগালের বাইরেই থাকিয়া যায়। পুরোহিত ভাবেন: তবে কি ব্রাহ্মণের এ-তপস্যা ব্যর্থ হইবে?

সহসা পুরোহিতের নজরে পড়ে কালীমূর্তি। তিনি তাহাই টানিয়া আনিয়া দেয়ালে হেলান দিয়া দাঁড় করান, বন্দীকে বলেন: মূর্তি আমার চেয়ে উঁচু, এরই মাথায় পা দিয়ে পালিয়ে যাও।

: কিন্তু এ যে তোমাদের দেবতার মূর্তি!—বন্দী বিস্ময়ে বলিয়া উঠে: আমি মরব, তবু এর মাথায় পা দিতে পারব না। বন্দী কাঁদিয়া ফেলে।

ঠাকুর চাপা কণ্ঠে বলেন: হাঁ, এ সত্যি আমার মায়ের মূর্তি। কিন্তু ভাই, ছোটবেলায় মা কি কখনো তোমাকে কোলেকাঁখে মাথায় তোলে নাই? আজ যদি মা কালী তা না পারেন, তবে তিনি কিসের মা?

বন্দী পুরোহিতকে বুকে জড়াইয়া ধরেন। উভয়ের অশ্রুতে উভয়ের বুক ভাসিয়া যায়। এক দেশের সন্তান—এক স্রষ্টার সৃষ্ট।

থপ্—থপ্—থপ্—বাহিরে শব্দ হয়। বন্দী ফাটল পথে ওপাশে নামিয়া যায়।

পুরোহিত আসিয়া মন্দিরের দুয়ার খোলেন; বাহির হইতে স্নিগ্ধ হাওয়া ভাসিয়া আসে; তাঁহার দেহমন জুড়াইয়া যায়। তিনি মুখ তুলিয়া আকাশের পানে চান; দেখেন, তারাদের চোখে তৃপ্তির হাসি।

পুরোহিত মন্দিরের দুয়ারে অর্গল দিয়া ভিতরে আসেন। চোখে পড়ে সেদিনের স্তূপীকৃত ফুল। তাঁহার মনে হয়, যেন সমস্ত ফুল মিলিয়া হইয়াছে একটা বিরাট সুন্দর তোড়া; সেই তোড়া উৎসর্গীকৃত বিশ্ববিধাতার উদ্দেশে। আর তোড়ার ফুলের প্রতি দলের বুকে জাগিয়া উঠিয়াছে সে নিশীথের মুক্তবন্দীর স্মিত মুখচ্ছবি।

১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী। এ দুর্ভাগ্য দেশে আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এবার সে-বহ্নিশিখার অগণ্য স্ফুলিঙ্গ শহরের সীমা ছাড়াইয়া ধিকি ধিকি পল্লীর দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সে স্ফুলিঙ্গ হইতে পল্লীর মাঠে-ঘাটেও দাবানলের সৃষ্টি হইয়াছে।

বরিশাল। একটি মুসলমান অফিসারের বাসা; বাসায় কোন পুরুষ মানুষ নাই, আছেন একটিমাত্র মহিলা, তাঁহারও বয়স মাত্র উনিশ বছর। তাঁহার সাথে দুইটি শিশুকন্যা।

সেদিন দুপুর বেলায় দশজন হিন্দু দাঙ্গার ভয়ে এই বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। মহিলাটি তাহাদিগকে অভয় দিয়া এক নির্জন ঘরে লুকাইয়া রাখিয়াছেন।

দিন ফুরাইয়া আসিল। পশ্চিম গগন অস্তগামী সূর্যের রক্তিম প্রভায় রঞ্জিত হইয়া উঠিল। মহিলাটি সেদিকে চাহিয়া সহসা শিহরিয়া উঠিলেন। ভাবিলেন—এ কি! মানুষের এ নির্মম হানাহানির করুণ দৃশ্য কি অবশেষে আকাশের চোখেও রক্তাশ্রু সঞ্চার করিয়াছে?

আসিল ক্রমে গোধূলির আলো, পাখিরা ধীরে নীড়ে ফিরিয়া রাতের অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। আকাশের শামিয়ানার তলে হাজার হাজার তারার বাতি জ্বলিয়া উঠিল।

অকস্মাৎ অফিসারের বাসার সম্মুখে একদল লোক আসিয়া হাজির হইল। তাহাদের কাহারও হাতে লাঠি, কাহারও হাতে রামদা, কাহারও হাতে সড়কি। তাহারা বাসার মহিলাকে লক্ষ্য করিয়া গর্জন করিয়া উঠিল। বলিল: হিন্দু কয়টিকে আমাদের হাতে দিয়ে দিন এক্ষুনি—নইলে ভাল হবে না, এ নিশ্চিত জানবেন।

মহিলাটি পর্দানশীন। রাস্তাঘাটে কালে কস্মিনে স্বামীর সঙ্গে বাহির হইয়া থাকেন, কিন্তু এমন উত্তেজিত জনতার সামনে কখনও বাহির হন নাই।

আজ মহিলাটির সে পর্দার বাঁধন টুটিয়া গেল। তিনি বাড়িতে একা ছিলেন। মাথায় কাপড় দিয়া একাই বাহিরে আসিলেন। ঘরের বাহিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া বলিলেন: ভাইসকল!

উৎক্ষিপ্ত জনতা হুঙ্কার ছাড়িয়া উঠিল। বলিল: সে মানুষগুলি কোথায়, আমরা তাই শুনতে চাই।

: সেই কথাই আমি বলতে এসেছি।

: না—আমরা কোন কথা শুনতে আসি নি; আমরা মানুষ চাই।

: কি করবেন মানুষগুলি দিয়ে?

: আমাদের যা খুশি তাই করব—আপনার কাছে তার কৈফিয়ত দিতে আসিনি। বলুন, তাদের দিবেন কি না?

: না, দিব না।

: কারণ? কারণ শুনতে পারি?

: কারণ অতি সহজ—তারা আমার আশ্রিত, আমি তাদের দিব না।

: ইস্! ভারি ধার্মিক হয়ে গেছেন তো!

: ধার্মিক আমি নই, কিন্তু আমার ধর্মের খবর আমি কিছু রাখি। আমার ইসলাম বলে—দুর্বলকে রক্ষা কর, জান দিয়ে হলেও আশ্রিতকে বাঁচাও।

: শুনুন, ও-সব ধর্মের কাহিনী আমরা শুনতে চাই না। আমরা এখন চললাম। রাত বারটার পর আসব। তখন ওদের চাই—অকারণে নিজের মৃত্যু ডেকে আনবেন না!

জনতা চলিয়া গেল। হিন্দু কয়জন এতক্ষণ ভিতর হইতে সমস্ত শুনিতেছিল। মহিলাটি অন্দরে যাওয়া মাত্র তাহাদের কয়েকজন ঘিরিয়া ধরিল। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল: মা, আমাদের জন্য আপনি বিপদ ডেকে আনবেন না। খালি বাড়ি—ওরা আবার এলে কে আপনাকে রক্ষা করবে? আমাদের ছেড়ে দিন, আমাদের প্রাণ যাক, আপনি বেঁচে থাকুন।

মহিলাটি বাসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল, আচ্ছা, ওদের ঘরে রেখে আমার জীবন না-হয় দিলাম, কিন্তু তাতে ওদের ফায়দা কি? তিনি আবার ভাবিতে লাগিলেন।

তাহার পর তাঁহার বোরখাটা গায়ে দিয়া তিনি পাছ-বাড়ির পথে গোপনে বাহির হইয়া গেলেন এবং একজন পদস্থ অফিসারের নিকট যাইয়া তাঁহার সাহায্যে হিন্দু কয়েকজনকে অন্য কোন নিরাপদ স্থানে সরাইয়া ফেলিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই জনতা ফিরিয়া আসিল; চিৎকার করিয়া বলিল: লোক-গুলিকে এইবার বের করে দিন, নইলে ঘরে আগুন দিয়ে আপনাকে সহ সবাইকে পুড়িয়ে মারব।

মহিলাটি আবার বাহিরে আসিলেন। বলিলেন: হিন্দুগুলি এখানে নাই, তাদেরে আমিই সরিয়ে দিয়েছি।

: খুন করব—আপনাকে খুন করব—একসঙ্গে অন্তত দশজনে গর্জন করিয়া উঠিল।

মহিলাটি কোথা হইতে কি শক্তি পাইলেন; তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া নরম শান্ত কণ্ঠে বলিলেন—

'হ্যাঁ ভাইসকল আমাকে খুন কর, আমি হাজির, তবু আশ্রিত দুর্বল প্রতিবেশীকে খুন করেছ এ বদনাম যেন তোমাদের না হয়।'

মহিলার সে প্রশান্তকণ্ঠে যে কি ছিল, তাহার দুর্নিবার প্রভাবে জনতা মুহূর্তের মধ্যে নীরব হইল, তাহার পর তাহারা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল॥

নিমকহারাম

আবুল মনসুর আহ্‌মদ

নিমকের সের ষোল টাকা! ষোল পয়সার জিনিস ষোল টাকা! নুনের অভাবে দেশময় হাহাকার! রাজধানীতে হৈ-হল্লা। অগত্যা এম-এল-এরা এবং পি-এস (পুনশ্চ নয়, পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারিরা) মন্ত্রীদেরে ধরিলেন। দেশ যে আর রক্ষা করা যায় না—তার মানে, জনগণকে আর পক্ষে রাখা গেল না। ফলে মন্ত্রীদের গদিও টলমল। একটা কিছু না করিলে নয়।

মন্ত্রি-সভার বৈঠক বসিল ক্যাবিনেট রুমে। সবারই মুখ মলিন ও লম্বা। প্রধান মন্ত্রী সরবরাহ-মন্ত্রীকে ধমক দিলেন: কি করতেছেন আপনে? লবণের সের বড় জোর ৮।১০ টাকা হইবার পারে, একেবারে ষোল টাকায় তুললেন কি কৌশলে?

সরবরাহ-মন্ত্রী আমতা-আমতা করিয়া বলিলেন: সব চেষ্টাই ত আমি করছি, সার। কিন্তু কিছুই ত কৈরা উঠবার পারলাম না। করাচী থাইকা লবণও কম আনলাম না। কিন্তু জাহাজ আইসা নামতেই লবণ নাই।

প্রধান মন্ত্রী: কন্‌ট্রোল করেন না কেন?

সরবরাহ মন্ত্রী: কন্‌ট্রোল ত খুব করতেছি, সার। কিন্তু কন্‌ট্রোল দামে চাইলেই লবণ একরত্তি নাই; আর ষোল টাকা দিলে কয় সের চান?

প্রধান মন্ত্রী: তবে দেখা যাইতেছে লবণগুলি হাওয়া হৈয়া গেছে না। আছে ব্যাপারীদের গুদামেই, তবে ধরবার পারেন না কেন?

স্বাস্থ্য মন্ত্রী: লবণের ব্যাপারীরা ম্যাজিক জানে, সার।

প্রধান মন্ত্রী: কিন্তু তাতে আমরার মন্ত্রিত্বের অবস্থা যে ট্রাজিক হৈয়া উঠেছে। একটা কিছু না করলে যে মন্ত্রিত্ব রাখা দায় হৈব।

চীফ সেক্রেটারী: সার, আগামী কাল ইউনিভারসিটির ছাত্ররা ভুখা মিছিল বাইর করব। গাঁও থাইকা লাখে লাখে লোক রওনা হৈয়া গেছে। কাল তারা আপনার প্রাসাদের সামনে বিক্ষোভ দেখাব ঠিক করছে। শুধু

বিক্ষোভই হয়, না, আরও বেশি অনর্থ কিছু ঘটে, সে চিন্তায় আমার ঘুম নাই।

প্রধান মন্ত্রী : তোমরা আছ খালি ঘুমের তালে। আমি তোমরার গদি ঠিক রাখি, আর তোমরা কর ঘুমের চিন্তা। বাঃ! বাঃ! কিন্তু এখন করি কি? দিমু নাকি ১৪৪ জারি কৈরা?

শিক্ষা মন্ত্রী মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন : আজকাল ছেলেরা যেমন কমিউনিস্ট হৈয়া উঠছে, তাতে ১৪৪ ধারা তারা মান্‌ব কিনা সন্দেহ।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী : তবে দিয়া দেই গুলি চালাবার হুকুম? সার কি বলেন?

প্রধান : না, না, আগেই গুলি না। হাতের পাঁচও ত ওটা থাকলই। আগে অন্য ফন্দি ঠাহর করেন। আপনেরা যেমন কৈরা পারেন, আজকার দিনের মধ্যেই একটা উপায় করেন। আমার বাতের টাটানি বড় বাইড়া গেছে, নইলে আমি একটা-না-একটা ফন্দি বার করবার পারতাম। বাতের বেদনা যে কি ভয়ানক, তা ত আপনেরা জানেন না। এখন আপনেরা বিদায় হন। সন্ধ্যার আগেই সকলে আমার বাসায় জমায়েত হৈবেন একটা ফন্দি বার কৈরা, বুঝলেন ত?

সন্ধ্যা। প্রধান মন্ত্রীর প্রাসাদে সভা। মন্ত্রীরা এবং বিভিন্ন দফতরের হেডেরা ছাড়া বিভিন্ন দলের নেতা-উপনেতারাও আসিয়াছেন। সকলের মুখেই কাল ছায়া।

প্রধান মন্ত্রী বলিলেন : আমার বাতের জোড়টা ক্রমেই বাইড়া চলছে। আমি সারাদিন ছটফট কৈরা কাটাইছি। কোন কিছু ভাববার পারলাম না। আমি আশা করি, আপনেরা একটা-না-একটা ফন্দি ঠাহর করছেন। কারণ আপনেরার বাতের বেদনা নাই।

সরবরাহ মন্ত্রী : সার, বাতের বেদনা না থাকলেও মাথার বেদনায় আর ঘাড় সিধা করবার পারতাছি না।

প্রধান মন্ত্রী : আরে রাইখা দেন মাথার বেদনা, বাতের বেদনার কাছে একসাথে দশটা মাথার বেদনাও কিছু না। ভুগেন নাই ত কোনদিন বাতের বেদনায়। মাথা বেদনা, সে ত ছেলেপিলের অসুখ। এখন বলেন, কে কি ফন্দি ঠাহর করছেন।

কেউ কিছু বলিলেন না। শুধু এ-ওঁর মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন।

প্রধান মন্ত্রী ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন : বুঝলাম আপনেরা কেউ কিছু করছেন না। কোনো যোগ্যতা আপনেরার নাই। এমন সব অপদার্থ লোক লইয়া আমি মন্ত্রিত্ব করবার চাই না। আমি রিজাইন দিমু ঠিক করছি।

এক কোণ হইতে সুফী চেহারার একজন লোক দাঁড়াইয়া বলিলেন: মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর সাথে আমার চাক্ষুষ পরিচয় নাই। আমার নাম খাকসার কেরামত উল্লাহ। লোকে আমাকে মুফতি বৈলাই ডাকে। আমি একটা আরজ করবার চাই।

প্রধান মন্ত্রী বিরক্তি-মাখা সুরে বলিলেন: হাঁ, আপনের তারিফ আমি বহুৎ শুনছি, কিন্তু এখন আমি বড় ব্যস্ত, আপনের কোনো কাজ এখন আমারে দিয়া হৈব না আপনে পরে আসবেন।

মুফতি হাসিলেন। বলিলেন: হুজুর আমি নিজের কোনো মতলবে আসছি না। আগামী কালের বিক্ষোভ ঠেকাবার ফন্দি বাৎলাবার লাগিই আপনার সেক্রেটারি-আত্মীয় ফিরোজ সা'ব আমাকে ডাইকা আনছেন।

প্রধান মন্ত্রী অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন: বে-আদবি মাফ করবেন। আপনে মোল্লা মানুষ, এ সব রাজনীতির কি জানেন?

মুফতি সাহেব মুখে প্রচুর আত্ম-বিশ্বাসের ভাব আনিয়া বলিলেন: হুজুর, আগে জানতাম না, একথা ঠিক। কিন্তু লীগে ঢুইকা কিছুকাল মন্ত্রী-মেম্বারগ সহবতে থাইকা বেলেকে ভর্তি হৈয়া গেছি। এখন রাজনীতি কিছু-কিছু বুঝি।

প্রধান: বেশ, বেশ। তা হৈলে কন, আপনের ফন্দিটা কি?

মুফতি: আগামীকালের মিছিলের উপর কোনো ৪৪ ধারা করবেন না। আপনের বাসায় মাইক বসাইয়া সারা শহরে, দোকানে-দোকানে, রাস্তার মোড়ে-মোড়ে লাউড স্পীকার বসাবেন।

প্রধান: তা যেন করলাম। তারপর আমি কি ঘোষণা করমু? ঘোষণার ত কিছুই নাই।

মুফতি: আপনের বেশি কিছু কওয়া লাগব না। শুধু এইটুকু বলবেন যে, আপনের তরফ থাইকা মুফতি মওলানা অমুক লবণ-সমস্যা সম্বন্ধে বক্তৃতা করবেন।

প্রধান: আর, আপনে কি কইবেন? আমার তা আগে জানা দরকার।

মুফতি: আমি যুক্তি-তর্কের দ্বারা, হাদিস-কোরাণের সনদ দিয়া পরমাণ কৈরা দিমু যে, লবণ খাওয়া ভাল মানুষের, বিশেষত মুসলমানের, উচিত নয় বৈলাই আমরার জনপ্রিয় মন্ত্রিসভা ইচ্ছা কৈরা লবণের দাম বাড়াইয়া দিছেন।

প্রধান মন্ত্রী উচ্চস্বরে কৌতুকের হাসি হাসিয়া বলিলেন: এ সব বাজে কথা লোকে বিশ্বাস করবে কেন?

মুফতি : সে ভার ছাইড়া দেন, হুজুর, আমার উপরে। আপনেরা ত কাছে বইসা সবই দেখবেন শুনবেন। দেইখা ও যাচাই কৈরা নিবেন আপনেরা। আমার বক্তৃতা শুইনা যদি জনতা খুশি না হয়, যদি তারা মন্ত্রিসভা জিন্দাবাদ দিয়া না যায়, তবে আমার নাম ফিরাইয়া রাখবেন। আর যদি জিন্দাবাদ দেয়, তবে আমারে আপনে কি দিবেন?

প্রধান : যদি সত্যই বিক্ষোভ সামলাইতে পারেন মুফতিসাব, তবে আপনে যা কইবেন, তাই দিয়া দিমু। আসলে অর্ধেক রাজ্য ও রাজকন্যাই আপনের প্রাপ্য। তবে আমার মেয়ে না থাকায় রাজকন্যা দেওয়া সম্ভব নয়। প্রধান মন্ত্রিত্বের গদিও আধা-আধি ভাগ করা যায় না। এরপর আপনি যা চান, তাই দিমু, মায় কাজীগিরি পর্যন্ত।

মুফতি : হুজুর, কাজীগিরির এলাকা আজকাল যা ছোট করা হৈছে, তাতে কাজীগিরি নিয়া লাভ নাই। তার চেয়ে বরঞ্চ আমারে একটা কেরাসিনের পারমিট দিবেন।

প্রধান : কেন, একটা লবণের পারমিটই নেন না কেন?

মুফতি : না, হুজুর, আগামী কাল আমি যে বক্তৃতা করুম, তারপরে লোকে আর লবণই খাব না। কাজেই লবণের পারমিট নিয়া আমি ঠকতে রাজি না।

প্রধান মন্ত্রীর বালাখানার সামনে বিশাল আংগিনা, আংগিনার পর প্রশস্ত পিচ-দেওয়া রাস্তা; তার বাদে বিস্তৃত ময়দান। যে দিকে যতদূর নজর যায়, কেবল লোকে লোকারণ্য; চারিদিককার কুশাদা রাস্তাগুলির যে দিকেই চাই, পিঁপড়ার লাছির মত জনতার 'লবণ চাই' 'নইলে মন্ত্রীদের মাথা চাই,' 'লবণ দাও' 'নয়ত গদি ছাড়', 'লবণ চোরের-গর্দান চাই' ইত্যাদি ইত্যাদি শ্লোগানে আসমান-জমিন মুখরিত।

প্রধান মন্ত্রীর বাড়ির গাড়ি-বারান্দার ছাদে মাইক বসান হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রীরা ও নেতারা গোলবন্দী হইয়া মাইকের চারদিকে বসিয়া আছেন। তাঁদের মধ্যে শাদা বড় পাগড়ি বাঁধা মুফতি সাহেবকেও দেখা যাইতেছে।

প্রধান মন্ত্রী মাইকের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বিপুল জনতা 'শেম' 'শেম' 'রিজাইন' 'রিজাইন' বলিতে লাগিল। প্রধান মন্ত্রী কি বলিলেন কিছুই শোনা গেল না। চারদিকে ঘন-ঘন আওয়াজ হইতে লাগিল : 'আমরা লবণ চাই, বক্তৃতা চাই না।'

প্রধান মন্ত্রী জনতার দিকে হাত জোড় করিলেন। জনতা একটু শান্ত হইল। দুইবার কাশিয়া প্রধান মন্ত্রী এই সুযোগে বলিলেন: আপনেরার কথা আমি শুনলাম, আপনেরাও আমার কথাটা শুনেন। লবণ-সমস্যা নিয়া আমরা খুবই চিন্তা করছি। বিশ্ব-বিখ্যাত আলেম মুফতি কেরামতুল্লা সাহেবের কেরামতির দওলতে আমরা একটা সমাধানও করছি। আমি নিজ মুখে সেটা কইবার চাই না; মুফতি সাহেবের মুখেই সেটা আপনেরা শুনবার পাবেন। তাঁর কথা শুনবার পরেও যদি আপনেরা সন্তুষ্ট না হন, তবে আপনেরা যা খুশি করবার পারেন।

জনতা এবার সত্যই শান্ত হইল। মুফতি সাহেব কাল-বিলম্ব না করিয়া একলাফে মাইকের সামনে আসিলেন এবং বাম হাতে মাইকের খুঁটি চাপিয়া ধরিয়া মাইকের সামনে মুখ নিয়া ষাঁড়ের আওয়াজে বলিলেন: বেরাদরানে মিল্লাত, আসসালামু আলায়কুম।

জনতা আর কি করে? 'ওয়া আলায়কুম' বলা ফরজ, তাই যেন নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলিল: ওয়া আলায়কুম সালাম।

মুফতি সাহেব সময় নষ্ট না করিয়া বলিতে লাগিলেন: আপনেরা এই মাত্র আল্লার নামে হলফ কৈরা কইছেন আপনেরা সালাম অর্থাৎ শান্তি চান? কাজেই শান্তির সঙ্গে আমার আরজটা আপনেরা শুনবেন। এটা আমি নিশ্চয়ই দাবি করবার পারি।

জনতা বিরক্ত হইয়া বলিল: কি কইবার চান, জলদি কইয়া ফেলেন।

মুফতি: নিমক নিয়া আপনেরা, হৈচৈ করতে আছেন দেইখা আমি তাজ্জব হৈলাম। আপনেরা কি হাদিস মানেন না? আপনেরা কি মুসলমান না?

জনতা: আমরা মুসলমানও, হাদিসও মানি আমরা। কিন্তু এখানে সে কথা ক্যান?

মুফতি এবার নড়িয়া চড়িয়া সোজা হইয়া বলিলেন: হাদিস শরিফে আছে নিমক হারাম। কথাটা কি আপনেরা কোন দিন শুনছেন না? হাদিস শরিফে মুসলমানের লাগি নিমক কেন হারাম করা হৈল, সেটা কি কোনো দিন আপনেরা চিন্তা কৈরা দেখছেন?

জনতা হঠাৎ নিস্তব্ধ হইল। ক্রমে এখান ওখান হইতে গুণগুণ শব্দ শোনা গেল, নিমক হারাম? মওলানা সাহেব এটা কি কইতে আছেন? ও-কথার অর্থ কি এই?

মুফতি সাহেব তাঁর গলা আরও মোটা, আরও গম্ভীর করিয়া বলিলেন:

শরিফ কি তবে ভুল? নাউযুবিল্লাহে মিন যালেক। আসতাগ্-ফেরুল্লাহ বলুন। হাদিস কখনো ভুল হবার পারে না। আপনেরা গওর কৈরা দেখেন, কেন মমিন-মুসলমানের লাগি, বল্‌কে সমস্ত ইনসানের লাগি, নিমক হারাম করা হৈল।

প্রধান মন্ত্রীসহ সমস্ত মন্ত্রী ও নেতাদের চোখ কপালে উঠিল। কিন্তু তাঁরা খুশি হইলেন।

জনতা প্রশ্ন করিল: কিসের লাগি হারাম করা হৈল আপনেই কন?

মুফতি আবার নড়িয়া-চড়িয়া বুক উঁচা করিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন: হাদিস শরিফে আছে,—নিমক না খাওয়ার ফজিলত তিনটি। পয়লা ফজিলত এই যে, যে লবণ না খাব তার বাড়িতে কোন দিন চুরি হৈব না।

মন্ত্রীরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন।

জনতা বিস্ময়ে বলিল: চুরি হৈব না! ইটা সত্য নাকি?

মুফতি: নিশ্চয় সত্য। তারপর দুসরা ফজিলত এই যে, যে লবণ খাব না, তারে কোনো দিন কুত্তায় কামড়াব না।

মন্ত্রীদের একজন আরেকজনের পেটে আঙুল দিয়া গুঁতা মারিতে লাগিলেন।

জনতার মধ্যে বিস্ময় ও উত্তেজনা দেখা দিল। তারা এ ওর কাঁধে ধাক্কা মারিয়া বলিতে লাগিল: মওলানা ইসব কি কৈতে আছেন? এসব কথা সত্য হবার পারে?

মুফতি: আমার কথা সত্য না হৈলে আপনেরার হাতে আমি যে-কোনো সাজা গ্রহণ করবার লাগি তৈয়ার আছি। তারপর তেসরা ফজিলতের কথা শুনেন।

এত বড় জনতা পলকে শান্ত হইয়া গেল।

মুফতি গলা আরো উঁচা করিয়া তুলিয়া বলিলেন: লবণ না খাওয়ার তেসরা ফজিলত এই যে, যে লবণ না খাব, তার চুল-দাড়ি শাদা হৈব না, তার দাঁত পড়ব না।

বিস্ময় ও আনন্দের গুঞ্জনে জনতা মুখর হইয়া উঠিল। জনতার বিষণ্ণ মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তারা বলিল: কিন্তু এসব কথা যে ঠিক তার পরমাণ কি? আমরা পরমাণ চাই।

মুফতি: যে কোনো প্রমাণ দিতে আমি প্রস্তুত। যা তা প্রমাণ না, একেবারে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ। দাঁত ও চুল-দাড়ির কথা ডাক্তারী ব্যাপার, চুরি-ডাকাতির কথা পুলিশের ব্যাপার, আর কুত্তার কথা ভেটারিনারি সার্জনের

ব্যাপার। তাঁরা যদি আমার কথার সত্যতা স্বীকার করেন, তবে আপনেরা বিশ্বাস করবেন?

জনতা: হাঁ করমু। কিন্তু বিশ্বাসী লোক হওন চাই। ঘুষখোর লোকে চলব না।

প্রধান মন্ত্রী মাইকের সামনে আসিলেন। মুফতি সাহেব সরিয়া জায়গা করিয়া দিলেন। প্রধান মন্ত্রী বলিলেন: ভাই সাহেবান, লবণের অভাবে আপাতত দু'চারদিন আমরা কষ্ট পাইলেও কেন আমার গভর্নমেণ্ট লবণের সের ষোল পয়সার জায়গায় যোল টাকা করেছেন, তার কারণ এতক্ষণে আপনেরা নিশ্চয়ই বুঝবার পারছেন। আমাদের রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্র। এখানে আমরা আলেমরার উপদেশে নিজামে-ইসলাম কায়েম করছি। এখানকার লোক যাতে আস্তে-আস্তে নিমক খাওয়া ছাইড়া দেয়, সেই মতলবেই আমরা লবণ এমন মাংগা কৈরা দিছি। মুফতি সাহেব বিশ্ববিখ্যাত আলেম, তাঁর মুখে আপনেরা হাদিসের হুকুম এবং সে হুকুম মানবার ফজিলতের বয়ান শুনলেন। তিনি আমরার কাছেও এই কথাই কইছেন। আমরা তাঁর কথায় বিশ্বাস কইরা লবণের দাম বাড়াইয়া দিছি। আমি প্রধান মন্ত্রীর সমস্তা ক্ষমতা ও দায়িত্ব লৈয়া আজ এই বিপুল জনতার সামনে ঘোষণা করতে আছি যে, আমার দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তার মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল সাহেবকে চেয়ারম্যান এবং গোয়েন্দা পুলিশের কর্তা ডি-আই-জি সি-আই-ডিকে ও ভেটারিনারি হাসপাতালের সুপারিণ্টণ্ডেণ্টকে মেম্বর কৈরা একটি কমিশন নিয়োগ করলাম। মুফতি সাহেবের কথা ঠিক কি-না, এই কমিশন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তা তজ্জদিক করবেন। আমি প্রধান মন্ত্রী হিসাবে আরো ঘোষণা করতে আছি যে, যদি এই কমিশনের কাছে মুফতি সাহেব তাঁর কথার সত্যতা প্রমাণ করবার না পারেন, তবে মুফতি সাহেবকে চরম দণ্ড দান করা হৈব। আজকার জনতার মত বিরাট জনতা ডাইকা তাদের সামনে মুফতি সাহেবের ফাঁসি দিমু। কি মুফতি সাহেব, এতে আপনে রাজি?

মুফতি সাহেব সহজ পদে মাইকের সামনে আসিয়া বলিলেন: জি হাঁ, আমার কথা মিথ্যা হৈলে ঐ শাস্তি আমি মাথা পাইতা নিমু।

জনতা উল্লাস প্রকাশ করিল। কিন্তু বলিল: আমরা জানবার চাই, কমিশনের রায় কবে বাইর হৈব?

প্রধান মন্ত্রী মুফতির দিকে চাইয়া মাইকের সামনে মুখ নিয়া বলিলেন: মুফতি সাহেব, কয়দিনে আপনে ইটা প্রমাণ করবার পারবেন?

মুফতি প্রবল আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলিলেন: আমি সবসময়ই প্রস্তুত আছি। কালই আপনেরা প্রমাণ নিবার পারবেন।

প্রধান মন্ত্রী জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন: শুনলেন ভাইসাহেবান, মুফতি সাহেব কালই প্রমাণ করবার পারবেন। তা-হৈলে পরশুদিন সকালে খবরের কাগজে সরকারী প্রেসনোটে কমিশনের রিপোর্ট দেখবার পাবেন। যদি মুফতি সাহেব কমিশনকে সন্তুষ্ট করবার না পারেন, তবে ঐ প্রেসনোটে মুফতির ফাঁসির দিন ঘোষণা করা হৈব। আপনেরা নির্ধারিত সময়ে এইখানে জমায়েত হৈবেন। মুফতিকে প্রকাশ্যে আপনেরার চোখের সামনে ফাঁসি দেওয়া হৈব। কেমন, এতে আপনেরা খুশি হৈলেন ত?

বিপুল জনতা উল্লাস ও উত্তেজনায় জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল: প্রধান মন্ত্রী জিন্দাবাদ। মন্ত্রিসভা জিন্দাবাদ। আমরা লবণ চাই না, লবণ আর খামু না। আল্লা আকবর।

জনতা বাঁধভাঙা নদীর স্রোতের মত চলিয়া যাইতে লাগিল। মন্ত্রীরা খুশিতে গাল প্রসারিত ও দাঁত বিকশিত করিলেন। নেতারা মুফতিকে বুকে জড়াইয়া টানা-হেঁচড়া করিতে লাগিলেন।

লম্বা নিশ্বাস ছাড়িয়া প্রধান মন্ত্রী শিরওয়ানির বোতাম খুলিয়া বুকে ফুঁ দিতে লাগিলেন ও বলিলেন: আপাতত বাঁচা ত গেল। কিন্তু এর শেষ কোন্‌খানে? মুফতিকে শেষ লাগাৎ ফাঁসিই দেওন লাগব। কিন্তু তাতেও আমরার রক্ষা নাই। কি হৈব মুফতি সাব?

মুফতি হাসিয়া বলিলেন: কোন চিন্তা করবেন না হুজুর। কিন্তু আমার কেরাসিনের লাইসেন্‌সের কথাটাও যেন ভুইলা যাবেন না।

কমিশনের বৈঠক। মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল চেয়ারম্যান হিসাবে মধ্যস্থলে বসা। তাঁর ডানদিকে ডি-আই-জি সি-আই-ডি, বামদিকে ভেটারিনারি সুপার। কমিশন সিগারেট পুড়াইয়া সময় কাটাইতেছেন; কারণ মুফতি সাহেবের দেখা নাই। তাঁরা হাসাহাসি করিতেছেন।

প্রিন্সিপাল সাহেব বলিলেন: আমি ত আগেই বলছিলাম, মুফতি আসবে না। আসবে কোন্ সাহসে? আমরারে সে কি পাগল পাইছে নাকি? আমি বুঝি না, মাননীয় প্রধান মন্ত্রী এই পাগলটাকে দিয়া যা তা বলাইয়া এই ঝক্কিটা নিলেন ক্যান?

ডি-আই-জি : আমি মাননীয় প্রধান মন্ত্রীকে বলছিলাম, ব্যাটাকে পুলিশ-গার্ডে রাখা হোক। ফাঁসি যার ধরা-বান্ধা, সে পলাব না ক্যান?

ভেটারি স্যুপার : কিন্তু মোল্লাটারে ফাঁসি দিয়াই কি মন্ত্রীরা রক্ষা পাইতেন। বড় জটিল অবস্থা সৃষ্টি হৈছে কিন্তু। আমি কোনো উপায় দেখতেছি না।

মেডিক্যাল : উপায় ওদিকেই আছিল নাকি? যা জনতা জমা হৈছিল, আর তারা খেপছিলও এমন সাংঘাতিক যে ঐ রকম একটা কিছু না কৈরা চারাই বা কি আছিল?

ডি-আই-জি : হাঁ, উপায় আবার আছিল না; একটু হুকুল পাইলে সব ব্যাটাকে তোপের মুখে উড়াইয়া দিতাম। প্রধান মন্ত্রী খামোখা গেলেন এক বান্দর নাচাবার। এখন সে ব্যাটাকে পাই কোনখানে?

'এই যে বান্দরটা হাজির' বলিতে-বলিতে মুফতি সাহেব কামরায় প্রবেশ করিলেন এবং হি হি করিয়া হাসিতে থাকিলেন। অবশেষে হাসি থামাইয়া বলিলেন : মোল্লা মানুষ ঘড়ির ধার ধারি না! দু'চার মিনিট দেরি হৈয়া গেছে; কিছু মনে করবেন না। মাফ করবেন।

মেডিক্যাল : আচ্ছা আচ্ছা, যা হবার হৈয়া গেছে। এখন কাজ শুরু করা যাক। মেম্বর সাহেবান, প্রশ্ন করুন।

ডি-আই-জি : বলেন মুফতি সাব, নিমক না খাইলে চুরি হৈব না ক্যান?

মুফতি : লবণ না খাইলে যক্ষা-কাশি অবধারিত, এ কথা ঠিক কিনা, ডাক্তার সাহেবই কন।

ডাক্তার সাহেব অর্থাৎ মেডিক্যাল প্রিন্সিপাল সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়িলেন।

মুফতি : যক্ষা-কাশি হৈলে সারা রাত কাশতে হৈবে? সেই কাশির শব্দে ঘরে চোর ঢুকবার পারব না। ঠিক কি না?

ডি-আই-জি : (বিস্ময়ে গাল প্রশস্ত করিয়া) ঠিক ত। এতক্ষণে আপনের কথার ভেদ বুঝবার পারলাম।

ভেটারিনারি : কিন্তু লবণ না খাইলে কুত্তায় কামড়াব না ক্যান?

মুফতি : যক্ষা-কাশিতে লোক দুর্বল ও গুজা হৈয়া পড়ব। লাঠি ভর না দিয়া তারা চলবার পারব না। লাঠি হাতে থাকলে কুত্তায় কামড়াবার পারব না, এটা বুঝবার পারলেন না?

কমিশনের মেম্বরদের মুখ বিজয়-আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সকলে বলিলেন : কথাগুলা ত সত্য বৈলাই বোধ হৈতেছে।

মেডিক্যাল : কিন্তু চুলদাড়ি শাদা হৈব না, দাঁত পড়ব না, এটা কিছুতেই ঠিক হৈবার পারে না।

মুফতি : এটাও হবার পারে। যক্ষা-কাশিতে লোকেরা অল্প বয়সেই মারা যাব, ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের বেশি কেউ বাঁচব না। ঐ বয়সে চুল-দাড়ি পাকবার আর দাঁত পড়বার সময় কই ?

প্রচণ্ড বিস্ময়ে কমিশনের মেম্বরগণ স্তম্ভিত হইলেন। তাঁদের বিস্ময় কাটিলে মুফতি সাহেবকে ধন্যবাদ দিলেন। প্রবল উৎসাহে তাঁরা করমর্দন করিলেন।

পরদিন সরকারী প্রেসনোটে বলা হইল : কমিশন সর্বসম্মত রিপোর্ট দিয়াছেন যে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, যে লবণ না খাইবে :

(১) তার বাড়িতে চুরি হইবে না। (২) তারে কুত্তায় কামড়াইবে না। (৩) তার চুল-দাড়ি শাদা হইবে না ও দাঁত পড়িবে না।

অতএব মওলানা মুফতি কেরামতুল্লা সাহেবের মতই ঠিক। কাজে-কাজেই হারাম নিমকের দাম প্রতি সের ষোল টাকা করিয়া মন্ত্রিসভা ঠিক কাজই করিয়াছেন॥

রূপ ও রোপেয়া

আবুল ফজল

আশ্চর্য, ঢাকায়ও সব কথা ঢাকা থাকে না।

অত্যন্ত আকস্মিকভাবে একদিন খানবাহাদুর জনাব এম, এ, মতিনের জীবনের একটি অধ্যায়ের ঢাকনা খুলে গেল। আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী যে শুনল, সেই প্রথমে বিস্ময়ে হতবাক হ'ল; পরে নাক সিঁটকিয়ে ছি ছি করে উঠল। ভাগ্যে খানবাহাদুর ছিলেন বিপত্নীক, না-হয় অন্দরমহলে কুরুক্ষেত্র ও কারবালা একসঙ্গে শুরু হয়ে যেত।

খানবাহাদুরের বয়স পঞ্চাশের উপর। দেহ-গঠন বেশ বলিষ্ঠ ও ঋজু, ফরসা মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ির ঐশ্বর্য ও শোভা দেখবার মতো। পাঁচ ওয়াক্ত নমাজের চার ওয়াক্তই তিনি তাঁর বাড়ির সংলগ্ন মসজিদে গিয়েই পড়েন। শুধু এ'শার সময় তিনি গর-হাজির থাকেন প্রায়ই। মগরিবের পর মসজিদ থেকে বেরিয়ে তিনি ইসলামপুর জাহাজ-ঘাটা-আমপট্টির রাস্তায় পায়চারি করেন নিয়মিত, হাতে হাজার দানার তসবিহ্-ছড়াটা থাকে সব সময়। খানবাহাদুরের দু'পকেটে থাকে দুটি রুমাল, একটি আতরে মাখানো আর একটি এসেন্সে। যতক্ষণ মসজিদে থাকেন ততক্ষণ আতর-মাখানো রুমালটিই তিনি ব্যবহার করেন। রাস্তায় পায়চারি করতে করতে হঠাৎ চারদিক চেয়ে নিয়ে বিশেষ এক গলিতে তিনি ঢুকে পড়েন। তখন বাঁ পকেট থেকে এসেন্স মাখানো রুমালখানি বের করে নাকের সামনে ধরেন। নর্দমার বদবোর সঙ্গে সঙ্গে হয়ত এইভাবে নিজের পরিচয় কিঞ্চিৎ ঢাকতে চান খানবাহাদুর মতিন সাহেব।

রাত এগারোটায় তিনি এই গলি থেকে বের হন। এই তাঁর কাপড়চোপড় চক-পট্টির হোসেন খলিফাই সেলাই করে। কোনো কোনো দিন যাওয়া-আসার পথে খানবাহাদুর খলিফার দোকানে ঢুকে চেয়ারে বসে পড়েন। নিজের রুপালী সিগারেট কেস্ খুলে বুড়ো হোসেনকেও একটি বাড়িয়ে দেন এবং সিগারেট টানতে টানতে খানিকক্ষণ ধরে খোশগল্প ক'রে কাটান। খান-

বাহাদুরকে দেখলেই হোসেন মুচকে হাসে। সেই হাসির অর্থ খানবাহাদুরও হয়ত বুঝেন। যেদিন তার দোকানে খানবাহাদুর বসেন না সেদিনও তাঁকে রাস্তায় পায়চারি করতে দেখে হোসেন মুখ টিপে টিপে হাসে।

কোনো কোনো দিন রাত এগারোটায়ও হোসেনের দোকান খোলা থাকে। তখন চারদিকে নিরালা, নিঝুম ও নিস্তব্ধ হয়ে যায়। ফিরতি পথে খানবাহাদুর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে এক একদিন হোসেনের দিকে সিগারেট ছুঁড়ে দিয়ে বলেন: খাও, ভালো ঘুম হবে।

হোসেন বলে উঠে: বসবেন না হুজুর?

: না অনেক রাত হ'ল, যাই।

হোসেন এবার তার অভ্যস্ত প্রশ্ন করে বসে: খানবাহাদুর সা'ব, কবে হজ্জে যাচ্ছেন?

: ইনশা আল্লাহ্, আগামী বার। এইটিও খানবাহাদুরের অভ্যস্ত

হোসেনও নাকে মুখে ধুম ছাড়তে ছাড়তে উৎসাহ ভরে বলে উঠে: ইনশা আল্লাহ তো বটেই হুজুর। বলে মৃদু মৃদু হাসতে থাকে। অর্থপূর্ণ হাসি। খানবাহাদুর সেই হাসির অর্থ বুঝেন। তাই হয়ত বলেন: যখনই যাই তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।

হোসেন বলে: আমি গরীব মানুষ, হজ্জ তো আমার উপর ফরজ হয়নি, আর তেমন গোনাহ্ও……। অর্ধসমাপ্ত বাক্যের মাঝে হোসেনের বিলম্বিত ঠোঁটে একটা বাঁকা হাসি ফুটে উঠে। খানবাহাদুরও হোসেনের মুখের উপর একটা অর্থপূর্ণদৃষ্টি হেনে পথ চলতে শুরু করেন। এবার ডান পকেট থেকে আতর মাখানো রুমালটি বের করে নাকে দেন। আতরের মৃদু খোশবু শুঁকতে শুঁকতেই তিনি বাড়ির দিকে পা বাড়ান।

খানবাহাদুরের গ্রামে কিছু জমিদারী আছে, আর শহরে আছে কিছু ভাড়াটে ঘর। কাজেই জীবিকার জন্য তাঁকে মাথা ঘামাতে হয়নি কোনোদিন। একটি মাত্র মেয়ে, তারও বিয়ে হয়েছে মাস ছয়েক আগে ম্যাট্রিকের চৌকাঠে বার তিনেক ধাক্কা-খাওয়া এক জমিদার তনয়ের সঙ্গে। এই মেয়ে সম্বন্ধেও আত্মীয় মহলে নানা গুজব ও কানাঘুষা আছে। খানবাহাদুরের বিবি দিলারা বেগম মারা গেছেন বছর পাঁচেক আগে নিঃসন্তান অবস্থায়। বিবির এন্তেকালের বছর তিনেক আগে হঠাৎ খানবাহাদুর সাহেব কলকাতা থেকে বছর আট দশেকের একটি মেয়ে নিয়ে এসে হাজির। বাড়ি ঢুকেই তিনি

ঘোষণা করেন—এই তাঁর মেয়ে সিতারা। এই বিবির ঘরে কোনো ছেলেপুলে হচ্ছে না বলে অনেকদিন আগে তিনি কলকাতায় এক শাদী করেছিলেন। পারিবারিক অশান্তির আশঙ্কায় এই খবর তিনি জানাননি কাউকে, জাহির করেননি কোথাও। সম্প্রতি সিতারার মা কলেরায় মারা গিয়েছে, তাই মেয়েকে তাঁর নিজের কাছে নিয়ে আসতে হয়েছে। প্রকাশ্যে মুখ বন্ধ হ'ল বটে, কিন্তু মনে রয়ে গেল অনেকের সন্দেহ। আত্মীয়দের অনেকে বিশেষত যাঁরা নিঃসন্তান খানবাহাদুরের সম্পত্তির ওয়ারিশ হওয়ার আশায় ছিলেন এতদিন, তাঁরা ভাবলেন, আগাগোড়া কাহিনীটা খান-বাহাদুরেরই নিজের রচনা। হক-ওয়ারিশদের মাহরুম করার জন্যই তিনি না-হক্ কোথা থেকে একটা মেয়ে আমদানী করেছেন। এ শুধু তাদের ঠকাবার একটা ফন্দি। পরে ব্যাপারটি আরো রহস্যময় হয়ে উঠেছিল, সিতারা নিজেই যখন কারো কারো গোপন ফুসলানো প্রশ্নের উত্তরে বলেছিল তার মা মরেনি, বেঁচে আছে। এই নিয়ে দিলারা বেগম স্বামীর সঙ্গে বেশ কিছুদিন মুখ ভার করেছিলেন—রাগারাগিও করেছেন। পরে অবশ্য নিঃসন্তান দিলারা বেগমের পক্ষে এইসব সন্দেহ মন থেকে মুছে ফেলে সিতারাকে মেয়ে বলে গ্রহণ করতে বাঁধেনি। সে যখন এ ঘরে ঘর করতে আসছে না, তখন মরলেই বা কি আর বাঁচলেই বা কি—এই হয়ত তিনি ভাবলেন। বিশেষত মন ছিল তাঁর সন্তানের জন্য বুভুক্ষু। কাজেই অল্পদিনেই দিলারা বেগম হয়ে পড়লেন সিতারার আম্মাজান।

কালক্রমে সিতারা শুধু খান-বাহাদুরের নয়, দিলারা বেগমেরও হয়ে উঠল নয়ন-পুত্তলি। সবাই জানল, সিতারাই খান-বাহাদুরের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী।

শরাফতী বজায় রেখে যতটুকু লেখাপড়া শিখানো সম্ভব, সিতারার বেলায় তার ব্যতিক্রম হয়নি। খান-বাহাদুর তাকে স্কুলেও ভর্তি করে দিয়েছিলেন। বড় হয়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়ে বাড়িতে শিক্ষয়িত্রী রেখে বিয়ের আগ পর্যন্ত তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন বেশ ভালো করেই।

সিতারা দেখতে মন্দ নয়, রঙ খুব ফরসা না হলেও তার দেহ-গঠন ও মুখের গড়ন অপূর্ব। আয়ত চক্ষু দু'টি কোমল মাধুর্য-মণ্ডিত। সবচেয়ে মধুর তার গলার স্বর। মধু-কণ্ঠী একমাত্র ওকেই বলা যায়। মনে হয় ঐ কণ্ঠ যেন একমাত্র গানের জন্যই তৈরী হয়েছে। কিন্তু খান-বাহাদুর তাকে গান শিক্ষা দেন নি। তবে মাঝে মাঝে দিলারা বেগমকে বলতেন সিতারা তার মা'র গলাই পেয়েছে।

মরা কুকুর কেন, মরা বাঘেও কামড়ায় না। শুনে তাই দিলারা বেগম কিছুমাত্র ঈর্ষান্বিত হননি। বরং জিজ্ঞাসা করতেন: ভাল গান গাইতে পারতেন বুঝি? খান-বাহাদুর কেমন আনমনা হয়ে যান। বলেন, গান না, কলকাতার মেয়ে গজল গাইতে পারতেন খুব ভাল।

: তাতেই বুঝি আপনার মন গলেছিল?—বলেই দিলারা বেগম একটু বাঁকা হাসি হাসতেন। আশ্চর্য, খান-বাহাদুর কিন্তু হাসির উত্তরে নিরুত্তরেই উঠে পড়তেন। পাছে বা কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ে!

যাক্ সিতারার যখন বিয়ের বয়স হ'ল তখন খান-বাহাদুরের একমাত্র উত্তরাধিকারিণীর জন্য প্রার্থীর কোনো অভাব হল না। কিন্তু খান-বাহাদুর চাকরিজীবীদের দু'চক্ষে দেখতে পারেন না—সামান্য মাইনের টাকায় শরাফতি রক্ষা করে ভালো খাওয়াপরা পর্যন্ত ওরা করতে পারে না। বিশেষত অধিকাংশ চাকরিজীবী শরা-শরীয়তের ধার ধারে না। না রাখে দাড়ি, না পড়ে রীতিমতো নমাজ। এইসব কারণেই তিনি সৈয়াদাবাদের ম্যাট্রিকের চৌকাঠে হোঁচট-খাওয়া জমিদার নন্দনটিকে জামাতা হিসেবে পছন্দ করলেন। সৈয়দ আরশাদ হোসনের শরীরের পরিধি দেখলেই বোঝা যায়, খাওয়া-পরার অভাব কাকে বলে তারা তা চোদ্দপুরুষ ধরে জানে না। আবার এরি মধ্যে তার মুখমণ্ডলে দাড়ি-গোঁফের যে ঐশ্বর্য দেখা যাচ্ছে, তাতে মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে শ্বশুরের সম্পত্তির শুধু নয়—তাঁর দাড়ি গোঁফেরও সে যোগ্য উত্তরাধিকারী হবে। কেউ কেউ সে টিপ্পনি কাটতেও ছাড়ল না।

বিয়ের দিন, শুভদৃষ্টির সময় নওশা-রূপে আরশাদকে দেখে সিতারার মনে যেটুকু উৎসাহ-ঔৎসুক্য জেগেছিল, শ্বশুর বাড়ি এসে স্বামীর হালচাল দেখে দু'দিনে তা কিন্তু উবে গেল। নিষ্কর্মার ঢেঁকি নিয়ে হয়ত ঘর করা যায়, দুষ্কর্মের ষাঁড়কে সামলাবে সে কি করে!

বাড়ির চাকরানী মতিজানের প্রতি-ই আরশাদের যত ফাই-ফরমাস। আরশাদকে পান-পানি তামাকটা দিতে মতিরও যেন আগ্রহটা কিছু বেশি। সিতারার চোখে এইসব শুধু অশোভন দৃষ্টিকটু নয়, অন্যায়ও। এইসবের ভার এখন থেকে সে নিজের হাতেই নিলে। কিন্তু ফল হল হিতে বিপরীত। আরশাদ এখন বাইর বাড়ি থেকেই পান চেয়ে পাঠায় এবং তামাক সেজে মতিকেই হুঁকা নিয়ে আসতে হুকুম করে। নেশার প্রতিও যে আরশাদের টান ও অভ্যাস আছে, তা টের পেতেও দেরি হ'ল না।

সিতারার মুখে আপত্তি শুনতেই সে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে ধমকে উঠলো একদিন : কারো বাপের টাকায় খাই ?

বিয়ের পর প্রথমবার যখন বাপের বাড়ি এল ইশারায় বাপের কানে আরশাদের হাল-চাল সম্বন্ধে আভাস দিয়ে দেখেছে সিতারা। বাপ শুধু বললেন : বড়লোকের ছেলেদের ঐ রকম এক আধটু স্বভাবদোষ থাকে বইকি, মা। ধীরে সুস্থে সেরে যাবে আপনি।

সিতারার মন কিন্তু কিছুমাত্র সান্ত্বনা পেলনা ও-কথায়। মনে মনে রাগও হ'ল কিছুটা, ভাবল পুরুষমাত্রই বোধ করি এরকম।

মাস ছয় পরে সিতারা আবার স্বামীকে নিয়ে বাপের বাড়ি এল। ইচ্ছা : মাস দুই এখানে বাপের সামনে, স্বামীকে চোখে চোখে রেখে শোধরাবার চেষ্টা করবে।

মেয়েজামাই আসার পর থেকে খানবাহাদুর কিন্তু ন'টা দশটার মধ্যেই রাত্রে বাড়ি ফিরতে লাগলেন। জামাই প্রথম দু'চারদিন সকাল সকালই ফিরত, কিন্তু ক্রমশ ফেরার সময় তার বিলম্বিত হতে হতে বারটা, একটা, কোনো কোনো দিন দু'টা তিনটাও হতে লাগল। কোনো কোনো দিন ফিরত নেশায় বুঁদ হয়ে। সিতারা জীবন-সমুদ্রে যেন কোনো কূল-কিনারাই দেখতে পেল না। মা নেই যে তাঁর কাছে মনের দুঃখের কথা বলে, চোখের জল ফেলে একটু সান্ত্বনা পাবে। বাপ পুরুষমানুষ, গম্ভীর প্রকৃতির লোক, দূরে দূরেই থাকেন। বল্লে হয়ত আগের মতোই বলবেন : বড়লোকদের ছেলের স্বভাব এরকমই হয়ে থাকে, মা।

বহু কণ্ঠ-মুখরিত সেই বিশেষ গলিটি। যে গলিতে খানবাহাদুর প্রায় রোজই মগরেবের পর ঢোকেন—এসেন্স মাখানো রুমালখানি নাকে দিয়ে ধব ধবে বিছানায় মোটা তাকিয়া ঠেস দিয়ে খানবাহাদুর বসেছেন। মাঝে মাঝে টান দিচ্ছেন আলবোলার সুদীর্ঘ নলে। বিছানায় এক পাশে বসে গৃহকর্ত্রী মন্নুজান সুললিত কণ্ঠে হারমনিয়ামের সুরে সুরে গেয়ে চলেছেন উর্দু গজল। মন্নুজান প্রায় প্রৌঢ়া, বয়স বোধ করি চল্লিশের কাছাকাছি, কিন্তু কণ্ঠ তার মধুবর্ষী—সুরের তরঙ্গে তরঙ্গে তার কণ্ঠের মাধুর্য যেন দূর-দিগন্তে ভেসে চলেছে। খানবাহাদুর তন্ময়, মাঝে আলবোলায় টান দিতেও ভুলে যাচ্ছেন।

গান থামতেই খানবাহাদুর উঠে পড়লেন।

মন্নুজান বলে উঠল : আজ এত সকাল সকাল যে ?

: মেয়েজামাই এসেছে, এখন সকাল সকালই ফিরতে হবে।

: জামাই এসেছে? আমাকে একবার জামাই দেখাবেন না? খুশি ও উৎসাহে চোখমুখ তার জ্বল জ্বল করে উঠল।

: কি করে দেখাই! জামাইকে তো আর এখানে নিয়ে আসা যায় না, আর তোমাকেও বা সেখানে নিয়ে যাই কি করে?

: তাই তো! দমে গেল মন্নুজান। নিভে গেল চোখ-মুখের আলো।

: আচ্ছা যদি·····মন্নুজানের মনে কি একটা কথা যেন আনাগোনা করছে।

: কি? খানবাহাদুর জানতে চাইলেন উদাস কণ্ঠে।

: জামাইকে ত আমার কিছু উপহার দেওয়া উচিত···আমার খুব ইচ্ছা। বিয়ের সময় আমাকে তো নিয়ে রেখে আসলেন কলকাতায়। এ-পাড়া থেকে অন্যত্র বাস উঠিয়ে নিয়ে গেলেই তো কোন ল্যাঠা বাধত না।···

: সাবধানের মার নেই, তখন কিছু জানাজানি হলে হয়ত বিয়েটাই পণ্ড হয়ে যেত।

: যাক, এখন আমি কিছু উপহার দেবই।

: কি দেবে?

: এই ঘড়ি-চেন, সোনার-বোতাম, ফাউণ্টেনপেন, আর কিছু জামাকাপড় ইত্যাদি। আর কি দেব?

: তা বেশ, জোগাড় করে রাখ সব, একদিন নিয়ে গিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে।·····বল্লেন খানবাহাদুর।

: তা কি বলে দেবেন? কে দিয়েছে বলবেন?

: বলব একজন দূর-সম্পর্কীয়া আত্মীয়া দিয়েছেন। বিয়ের সময় দিতে পারেননি বলে এখন পাঠিয়েছেন।

মন্নুজান বল্লে: তার চেয়ে বলবেন তোমার শাশুড়ি মরবার সময় কিছু টাকা রেখে গিয়েছিলেন জামাইকে জিনিসপত্র দেওয়ার জন্য, তা দিয়েই এগুলো কেনা হয়েছে। এতদিন মনে ছিল না।

: বেশ, তাই বলা যাবে। জীবিত লোকের মৃত্যুসংবাদ রটালে তার নাকি আয়ু বেড়ে যায় অনেক। খানবাহাদুরের গম্ভীর মুখেও হাসি ফুটে উঠল।

: আয়ু আর চাই না। মরলেই বাঁচি। নিজের মেয়ে-জামাইর কাছেও যে পরিচয় দিতে পারে না, তার বেঁচে থেকে লাভ?·····বিমর্ষমুখে মন্নুজান জানালে।

খানবাহাদুর হালকা হতে চাইলেন : দিলারা চলে গেছে বহু আগে ; তুমিও যদি চলে যাও, তা হ'লে এ বেচারা বাঁচে কি করে ?—বলেই দাড়ির ফাঁকে হাসি ফুটিয়ে তুল্লেন আর একবার।

কিছুটা ব্যঙ্গ সুরে মন্নুজান বল্লে : আর একটা মনোওয়ারা জুটতে দেরি লাগবে না।

তেমনি হালকা সুরেই খানবাহাদুর বল্লেন : শুনেছি মনোওয়ারাই তো মন্নুজান হয়েছে।

কথাটা সত্য বলেই হয়ত মন্নুজান কোনো উত্তর দিতে পারলে না। ততক্ষণে খানবাহাদুর নেমে পড়েছেন রাস্তায়।

মাসখানেক পরের কথা।

খানবাহাদুর বিদায় হয়েছেন অনেকক্ষণ। রাত প্রায় এগারটা। গরমের দিন, মন্নুজান হাওয়ার আশায় দরজাটা খুলে রেখেছিল। হঠাৎ এক অপরিচিত যুবক এসে ঘরে ঢুকলে। দেখলেই মনে হয়, নেশা করেছে। পা টলছে, মুখের কথা জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে।

টলতে টলতেই আউড়াচ্ছে : বাঈজী, গানা গাও। বাঈজী, গানা গাও।

এইসব দৃশ্য মন্নুজানের অদেখা নয়, নয় অজানা—এবং কিছুমাত্র অঘটন নয় এইসব পাড়ার। কিন্তু সে চমকে উঠল ছোকরার হাতের ছড়িটা দেখে। পাঞ্জাবীর সোনার বোতামগুলোও তো সে যে প্যাটার্নে তৈয়ার করিয়েছিল অবিকল সেরকম। হাতের রিস্টওয়াচটাও তাই মনে হচ্ছে। আংটিটাও তো। জামাইর জিনিসপত্র চুরি হয়েছে বলে কোনোদিন শোনেনি খানবাহাদুরের মুখে! তবে সত্যিই কি চুরি হয়েছে! সন্দেহ-দোলায় দুলতে লাগল তার মন।

জামাইর চেহারা ও অবয়ব সম্বন্ধে সে বহুদিন খানবাহাদুরের কাছে খুঁটে খুঁটে জিজ্ঞাসা করেছে। যে রকম শুনেছিল, তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতেই তার মনে যেন কোনো সন্দেহ রইল না। লজ্জায় সঙ্কোচে তার মরে যেতে ইচ্ছা হ'ল……তার সব অবয়ব, তার সমস্ত অস্তিত্ব যেন বলতে লাগল……ধরণী দ্বিধা হও, ধরণী দ্বিধা হও।

ঐদিকে মাতালটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে আর বলে চলেছে : বাঈজী গানা গাও, বাঈজী গাও।

মন্নুজান যতই সরে যায়, মাতাল-ও ততই তার দিকে এগিয়ে আসে।

অগত্যা মন্নুজান ঝিকে ডেকে বল্লে : এঁকে হাত মুখ ধোবার পানি দাও। মাতালকে বলে : বাবা তুমি চেয়ারে বস, হাত মুখ ধোও, কিছু খাও, আমি গান শোনাচ্ছি এক্ষনি। বলেই সে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

ঝি এসে মাতালটাকে গোসলখানায় নিয়ে গিয়ে ভালো করে মাথা ও হাত মুখ ধুইয়ে খানিকটা প্রকৃতিস্থ করে নিয়ে এল। মন্নুজান একহাতে গ্লাস ও অন্যহাতে এক থালা মিষ্টি নিয়ে ফিরে এসে তার সামনে রেখে বল্লে : বাবা, খাও। এবং পাশে দাঁড়িয়ে একখানা হাতপাখা দিয়ে পাখা করতে লাগল তার মাথায়।

যুবক তবুও ইতস্তত করছে দেখে মন্নুজান ফের অনুনয়-বিনয় করে বলে : বাবা, খাও, খেয়ে একটু ঠাণ্ডা হও, বাবা। ভালো আছত বাবা?

মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু সাহস হয় না, যদি খপ্ করে হাতটা ধরে বসে। সে দাঁতে জিব কাটলে।

যুবক কিছুটা ঝাঁজের সঙ্গে বলে উঠল : বাবা, বাবা করছ কেন? এখানে আমি মিষ্টি খেতে আসিনি, গান শুনতেই এসেছি, গান। বোতল টোতল থাকেত বের করো; মিষ্টি কে খায়? শরবত খায় তো মেয়েরা।

: সব দেব, বাবা, আগে একটু মিষ্টি-মুখ করতে হয়। খাও বাবা, একটু শরবত খাও, ভালো হবে।

যুবকের নেশার ঘোর বোধ করি এর মধ্যে দমতে শুরু হয়েছে। সেও এবার কিছুটা অবাক হ'ল বইকি। হয়ত ভাবলে, দেখাই যাক না। কাজেই পেট-ভরে মিষ্টিও খেলে, বরফের শরবতও বাদ দিলে না। ঝি পান ও সিগারেট দিয়ে গেল একটি ছোট প্লেটে করে। কি খেয়াল হ'ল, কে জানে, মন্নুজান ড্রয়ার খুলে সেই প্লেটের উপর রাখলে দু'টি গিনি।

এবার আরশাদের আরো অবাক হবার পালা। মাথা মুণ্ডু সে কিছুই বুঝতে পারলে না। কিন্তু একটি জিনিস লক্ষ্য করে তার বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রইল না। এই প্রৌঢ়ার চিবুক ও নাকের সঙ্গে সিতারার আশ্চর্য মিল রয়েছে, চলার ভঙ্গিটাও প্রায় একই রকম। গলার গড়নে শুধু নয়, স্বরেও অদ্ভুত মিল— এই বয়সে সিতারা নিশ্চয়ই এ রকম হবে। সিতারার বয়সে এ বোধ করি অবিকল সিতারার মতোই ছিল। বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে সে তাকিয়ে রইল মন্নুজানের দিকে। হঠাৎ মন্নুজান গিনি দুটি তার হাতে তুলে দিয়ে বল্লে : নাও বাবা, তোমাকে দেখে আমার জীবন সার্থক হ'ল আজ।

বিস্মিত আরশাদ বলে উঠল : তুমি, তুমি……আপনি কে ?

: আজ নয় বাবা, পরে বলব।

: না, আজই বলতে হবে। উঠে দাঁড়াল উত্তেজিত আরশাদ।

: না বাবা। আজ শুনতে চেয়ো না, আর একদিন বলব। আমি তোমার পর নই, শুধু এইটুকু জেনে রাখ আজ।

: না, এক্ষুনি বলতে হবে সিতারা আপনার কে ?

: সিতারা! সিতারা! সিতারা আমার কে? কেউ না।—মন্নুজানের বিস্মিত কণ্ঠ বলে ফেল্ল।

: নিশ্চয়ই কেউ। উত্তেজনায় আরশাদের সর্বশরীর থর থর করে কাঁপতে লাগল। হঠাৎ টেবিলের উপর থেকে রুটি-কাটা ছুরিখানা তুলে নিয়ে সে চিৎকার দিয়ে উঠল : না বলতো……। সে ছুরিখানা বাগিয়ে ধরল।

: সিতারা আমার মেয়ে বাবা। তার অজ্ঞাতসারেই যেন মন্নুজানের ভীত-কম্পিত কণ্ঠ থেকে কথা কয়টি বের হয়ে পড়ল।

: সিতারা তোমার মেয়ে। বেশ্যার মেয়ে!—ছুরিখানা ছুঁড়ে ফেলে সে দ্রুত বেরিয়ে গেল। বাইর থেকেও মন্নুজানের কণ্ঠ শোনা গেল : আমি কি করলাম, খোদা আমি কি করলাম ?

মন্নুজান মূর্ছিত হয়ে পড়ল কি ?

* * * *

সিতারা ঘুমিয়ে পড়েছিল। রাত একটা দু'টা হবে বোধ করি, হঠাৎ কি একটা শব্দে তার ঘুম গেল ছুটে। কোথায় যেন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে তর্ক ও বাদানুবাদ হচ্ছে। সে উঠে বসল। আরশাদ বিছানায় নেই, হয়ত আসেনি। উত্তেজিত ও চাপা-কণ্ঠের শব্দ যেন তার আব্বার ঘর থেকেই আসছে। সে ছুটে গেল বাপের ঘরের দিকে। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে শ্বশুর-জামাইর তর্ক সে কিছুক্ষণ ধরে শুনল।

আরশাদ উত্তেজিত কণ্ঠে তার বাবাকে ধমকাচ্ছে : তুমি একটা বেশ্যার মেয়েকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছ, আমি কাল থানায় খবর দেব। ফৌজদারী করব, খবরের কাগজে তুলে দেব সব ঘটনা, তোমার কীর্তি-কাহিনী।

খানবাহাদুর অনুনয়-বিনয় করছেন : এইসব বাবা, ঘরের কথা বাইরে জাহির করে কি লাভ ? তোমাকে আমি যত টাকা চাও দিচ্ছি, আর আমার সমস্ত সম্পত্তি সিতারাই তো পাবে, বলত এখনি তাকে সব লিখে দিই।

আরশাদ উত্তেজিত ক্রুদ্ধকণ্ঠে জানালে : এক্ষুনি নগদ পাঁচ হাজার টাকা

আমাকে গুনে দাও। আর সিতারার নামে নয়, আমার নামেই সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিতে হবে।

অসম্মান ভয়ে ভীত খানবাহাদুর তাতেই যেন রাজি। তক্ষুনি উঠে লোহার সিন্দুক খুলে পাঁচ হাজার টাকার নোট গুনে টেবিলের উপর রাখলেন। বল্লেন: কাল উকিল ডাকিয়ে দলিল করিয়ে দেব।

বাইরে দাঁড়িয়ে সিতারা সবই শুনল। এইবার ঘরে ঢুকে বাবাকে লক্ষ্য করে সে বলে উঠল: আব্বা, আমি তোমার মেয়ে তো?

: নিশ্চয়ই। হতভম্ব খানবাহাদুরের কণ্ঠ থেকে নির্গত হ'ল।

: আমার মা মরে গেছেন জানতাম। আমার আর একটি মা যদি বেঁচে থাকেন, তাতে কিছু এসে যায় না। তুমি যখন আমার বাপ, আর আমি যখন তোমার মেয়ে, তখন তোমার সমস্ত টাকা-পয়সা ও সম্পত্তির আমিই মালিক। আমার কথা ছাড়া এর এক কপর্দকও কাকেও দিতে পারবে না।— বলেই টেবিলের উপর থেকে পাঁচ হাজার টাকার নোট সব নিজের হাতে তুলে নিলে।

এইবার আরশাদকে লক্ষ্য করে বল্লে: মন্নুজান বাঈজীর কাছে যখন গিয়েছিলে, শাশুড়ি ভেবে, বা স্ত্রী ভেবে তো যাওনি; বেশ্যা ভেবেই তো গিয়েছিলে? তবে বেশ্যার মেয়ের প্রতি এত ঘৃণা কেন? অথচ বেশ্যার মেয়ের টাকার প্রতি লোভ তো এতটুকুও কম নয়? বেশ্যার মেয়ের টাকা চাও নাকি? চাইলে পাবে, ঠোঁটে তার বিদ্রূপের বাঁকা রেখা। তোমার মুখের গ্রাস আমি কেড়ে নিতে চাই না। আব্বা এই ছ'মাসে আমার বিয়ের সাধ মিটে গেছে। আমি আর এ-রকম অপদার্থ তথাকথিত বড়লোকের ছেলেকে নিয়ে ঘর করতে পারব না। গরীব হক, কোনো শিক্ষিত ভদ্রছেলেকে যদি পাওয়া যায় তখন না-হয় আর একবার নীড় বাঁধার চেষ্টা করা যাবে।

আরশাদকে লক্ষ্য করে ফের বল্লে: এই টাকা চাও নাকি? চাইলে শরীয়ৎ মতো আমাকে তিন তালাক দিয়ে দাও, এক্ষুনি টাকা দিয়ে দিচ্ছি। বলো, তিন তালাক……

দুর্দান্ত জমিদার-তনয় তক্ষুনি সুবোধ বালকের মতো আউড়ালে: তিন তালাক।

সিতারা নোটগুলি সব আরশাদের গায়ের উপর ছুঁড়ে মেরে স্যাণ্ডেলের পটাপট শব্দ করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আরশাদ উপুর হয়ে ঘরময় ইতস্তত ছড়িয়ে-পড়া নোটগুলি এক একটি করে

গুনে গুনে কুড়িয়ে নিতে লাগল। আর অজ্ঞাতেই যেন বলে চল্ল, এই বাবা, ফেল না নয়, এক একটা কাগজের দাম দছ্ দছ্ রোপেয়া! আর এই টাকায় শত সিতারা……

আশ্চর্য একদিন যেতে না যেতেই দেখা গেল শহরের সব দৈনিকে "খানবাহাদুরের কেলেঙ্কারী" এই শিরোনামায় সব কথাই বেশ পল্লবিত ও মুখরোচক করে পরিবেশন করা হলো। বলাবাহুল্য তার জন্য যে কিছু খরচ হ'ল তাও খানবাহাদুরের টাকা।

তাই বলছিলাম: ঢাকায় সব কথা ঢাকাও থাকে না॥

দুই চোখ

শওকত ওসমান

—কাস্টমর জাহাজ আইস্‌সে।

সত্যই রিভার পুলিশের লঞ্চ আসিতেছিল। নৈশ নদীর ভিতর একটানা যন্ত্রধ্বনির আওয়াজ ক্রমশ স্পষ্টতর।

জহির মিয়া সাম্পানের নিবন্ত আলো আরো বাড়াইয়া দিল।

বর্ষার আকাশে ইতঃক্ষিপ্ত মেঘ। সারা দুপুর বৃষ্টি হইয়াছিল। জলস্রাবী মেঘের দল দিগন্তের কোণে ছাউনী ফেলিয়াছে। আপাত নভ-অভিযানের কোন সম্ভাবনা নাই।

সাম্পানের ভিতর ঈষৎ হাওয়ায় লণ্ঠন দুলিতেছে। আলোর দিকে পিঠ, জহির মিয়ার ছায়া-মূর্তিটুকু আন্দাজ করা যায়। গলুইয়ের মুখে আরো একটি মানুষ বসিয়াছিল। ছায়ার রেখামাত্র।

জহির মিয়া আবার বলিল, কাস্টমর জাহাজ আইস্‌সে।

—আইতে দাও, আঁঅর সাম্পানে আফিমের পা'ড় আছে? সঙ্গী করিমের জবাব।

—না, বা'ই, খামাখা মুশ্‌কিলে ফেলায়। হেবার মনে আছে, এক্কারে সাম্পান তছ্‌নছ করে ছাড়ছিল্‌।

—ভরের কি আছে? আইতে দাও।

নদীর কিনারা হইতে কয়েক শ' ফিট দূরে নোঙর করিয়াছিল জহির মিয়া। স্রোতের তোড়ে আছাড় খাইতেছে সাম্পানখানি।

—বা'লো হয়ি বইয়ো, মিয়াঁ। পানির মদ্দি যাআঁর চাউ নঅ?

জহির মিয়া আন্‌মনা বসিয়াছিল, পানির মধ্যে নিশ্চয় সে যাইতে চায় না। সঙ্গী প্রশ্নের কোন উত্তর পাইল না।

—বা'লো হয়ি বইয়ো, মিয়াঁ।

জহির মিয়া এইবার সাম্পানের মাঝখানে সরিয়া বসিল।

অন্ধকার নদীবক্ষে লণ্ঠনের আলো চকচক করিতেছে। সেই দিকে দৃষ্টি ফিরাইল সে।

—চুপ বইয়ে? মন তোয়াঁর খারাব, অ মিয়াঁ? করিম পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল।

জহির মিয়ার মন খারাপ হওয়ার কথা। কয়েকদিন বাড়ি ছাড়া সে। আজ ফিরিয়া যাওয়ার নির্ধারিত দিন। এখনও বিলম্ব হইতেছে।

—আঁঅর মন আছে? ইডা কি কও, মিয়াঁ? হফ্‌তা পারায়। গ'রৎ একৃগুয়া চৈল ন আছিল্।

এক সপ্তাহ জহির মিয়া বাড়ি ছাড়িয়াছে। ঘরে একদানা চাউল দিয়া আসে নাই।

—ও বা'বী সা'ব বা'লা মানুষ। ডর কিল্লাই?

কিসের জন্য ভয়? জহির মিয়ার স্ত্রী কুলসুম যখন ভাল মানুষ।

—বা'লা মানুষি দি' পেট ন ভরং।

জহির মিয়া বোঝানোর চেষ্টা করিল, ভালমানুষি দিয়া জঠর সমস্যার সমাধান হয় না।

বোধহয় কেরোসিন ছিল না, লণ্ঠনের আলো আরো ক্ষীণ হইয়া আসিল। স্তব্ধ দুই ছায়া-মূর্তি। লঞ্চের ইঞ্জিনের শব্দ নিকটতর হইতেছে। জহির মিয়া চক্ষু বুজিয়া মাথাখানি দুই হাঁটুর উপর রাখিল।

(রাত্রির কৃষ্ণচ্ছায়া জিভ মেলিতেছে। মেঘের আনাগোনা শুরু হইয়াছে পুনরায়। বর্ষার অনিশ্চিত আকাশ। ঝড়ের ছোঁয়াচ লাগিতে কতক্ষণ।

দিগন্তে ঘন-অন্ধকারের নিঃশব্দ বিস্তার রাঙা মাটির গিরিশ্রেণীর ধূসর স্তব্ধতায় বিভীষিকার প্রলেপ আঁকিতেছে। পাতলা মেঘরাশি পাহাড়ের শীর্ষে, প্রস্তর ও তরুশ্রেণীর কায়ালোকে প্রতিবেশীর মমতা-সন্ধানী। চকিত ইশারায় সঙ্গীহীন একটি নক্ষত্র অস্তিত্বের পরিচয় দিয়া পুনরায় হাবসী জুলুমের মুখে আত্মসমর্পণ করিল।)

সেইদিকে দুই ছায়া-মূর্তির বোবা দৃষ্টি।

বন্দরের আর এক দিকে দিনের সূচনা। বিদেশী জাহাজের বাতি, পোর্ট-ইয়ার্ডের আলো, জেটির পাহারাদারের তীক্ষ্ণ সন্ধানী-রশ্মি—সব মিলিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রতীক, ধ্রুপদ, গুরু-গম্ভীর কার্গো জাহাজের হুইসেলে স্বতন্ত্র জগৎ থরথর কাঁপিতেছে।

এই দিকে আবার চোখ ফিরাইল জহির মিয়া।

দূর হইতে দেখা যায়, নৈশ বন্দরের আলোকাকীর্ণ রূপ। তবু অন্ধকারের জনতা গরীব আত্মীয়ের মত মানবিক দম্ভের প্রাসাদ-চত্বরে প্রতীক্ষমাণ। শীর্ণ-

দেহ, সঙ্কোচ-আড়ষ্ট। দুই দিগন্ত, দুই ভিন-দেশী অরকেস্ট্রার মত মিশিয়া যাইতেছে বিচিত্র গমক ও মূর্ছনায়।

—খুব দেরি হইয়ে, মিয়াঁ।

—দেরি আলবৎ হৈব। উয়াঁগোর নাম সদাগর।

—আঁঅর সদাগর বা'লা মানুষ।

—বা'লা! হিতাল্লাই দেরি! কি কও?

সওদাগর ভাল মানুষ। সেইজন্য দেরি হইতেছে। করিমের কণ্ঠে শ্লেষ জড়ানো।

—চৈল আনব?

—ঠিগ্, দেইখ্যো। চুলা ঠিগ্ করিয়ারে—

জহির মিয়া সঙ্গীর কথার মধ্য-পথে বলিল, চৈল। অস্পষ্ট বাহির হইয়া আসিল তার ঠোঁটে, চৈল! নিরুদ্দিষ্ট পুরাতন বন্ধুর মত সে যেন চাউলের অবয়ব দেখিতেছে মনশ্চক্ষু দিয়া।

সাম্পানের অন্য মাঝি মহাজনের আড়তে গিয়াছে পাওনা টাকা আদায় করিতে। সে চাউল কিনিয়া আনিবে। তারই প্রতীক্ষা-রত দুইজন।

—বড্ড দেরি হইয়ে।

—কলা'ম না, উয়াঁগোর নাম সদাগর। টিয়াঁ ন দিইয়ে, বা'ই।

জহির মিয়া প্রতিবাদ জানাইল। মহাজন নিশ্চয় টাকা মিটাইয়া দিবে। চাউলের সওদায় দেরি হইতেছে।

দম্‌কা ঠাণ্ডা বাতাস শন্‌শন্ বহিয়া গেল। আবার বৃষ্টির সম্ভাবনা। জেলে-পাড়ায় কুকুরগুলি ইস্তার ডাকিয়া যাইতেছে। নদীর কিনারায় নৌকা ও সাম্পানের মাস্তুলের সারি-সারি ছায়া-রেখা। বাঁশের স্তূপ পড়িয়া রহিয়াছে কোথাও। অন্যদিক জ্যোৎস্নার আলো-আঁধারে জাল-বোনা ভূমি-শায়িত বাঁশের রেখা স্তব্ধ ঝর্ণা মনে হয়, যেন বাতাস দিলেই ঢেউ উঠিবে।

জহির মিয়ার মাথায় কিস্তী টুপী। মগ্‌রীবের নামাজের পর আর খুলিতে মনে নাই। নগ্ন দেহ তার। নদীর জলো-বাতাসে ঠাণ্ডা লাগে। গামছা সাম্পানের আর এক কোনায় পুঁটলির ভিতর। অলসতার জগদ্দল সম্মুখে। দেহ আবরণের কোন বন্দোবস্ত করিল না জহির মিয়া। বক্ষস্থিত হাত দু'টির মধ্যে উত্তাপ খুঁজিতে লাগিল।

লঞ্চের শব্দ নিকটতর। আলো জ্বালে নাই পুলিশের লোক। শুধু ঘুট্‌ঘুট্ শব্দে মাঝিরা লঞ্চের হাল-হকিকৎ বুঝিতে পারে।

সঙ্গী করিমকে সাম্পানের ভিতর যাইতে দেখিয়া জহির মিয়া বলিল, আঁঅর গাম্ছা খান্।

কিন্তু তার চেয়ে শশব্যস্ত হইয়া সে পুঁটলি ভালরূপে দেখিবার জন্য অনুরোধ করিল। দুপুরের বৃষ্টির সময় সে এদিকে মনোযোগ দিতে পারে নাই। পুঁটলির ভিতর একটি শিশুপাঠ্য পুস্তক ছিল। ভিজিয়া গিয়াছে হয়ত।

জহির মিয়ার তর সহিল না। সে নিজেই সাম্পানে ঢুকিয়া পড়িল।

—না, মিয়াঁ বা'ই, কিতাবের গা'ত পানি ন লাগই। সঙ্গী বলিল ভিতর হইতে।

তবু ভরসা নাই! জহির মিয়া নিজেই পুঁটলি পরীক্ষা করিতে লাগিল। অতি কষ্টে সে পুত্রের জন্য পুস্তকখানি খরিদ করিয়াছে। এক টাকায় পাঁচ পোয়া চাউল ত' হইত। কুলসুমের সঙ্গে ইহা লইয়া বচসা শুরু হইবে। জঠরে অন্ন না দিয়া লেখাপড়া শেখানোর পক্ষপাতী সে নয়। মাইয়া ফুয়ার আক্কেল।

জহির মিয়া তন্নতন্ন করিয়া পুস্তকের পাতা দেখিল। না, কোথাও স্যাঁতসেঁতে দাগ পর্যন্ত লাগে নাই। করিম হাসিতে লাগিল।

—যা' করতাছেন, বা'ই, আঁঅর হাসি মুখত্তন ঝাঁপ দি পড়ে।

—ফুয়ার কিতাব, বা'ই।

করিম ভাবিয়াছিল কোন মণি-মাণিক্য। বিদ্রূপ করিয়া সে জানাইল।

—আঁঅর ফুয়ার কিতাব।

জহির মিয়ার পুত্র সমিরুদ্দীনের পুস্তকখানি।

—ঠিগ্ আছে?

—বেগ্ গুয়ান ঠিগ্।

দুইজনে সাম্পানের বাহিরে আসিল। লণ্ঠনের শিখা নিবু-নিবু। করিম দোলাইয়া দেখিল, তেল নাই। নিবিয়া গেল লণ্ঠন।

—শলাই আছে?

—হাঁ।

জবাব আসিল, হাঁ।

দেশলাই ভিজিয়া না যায়। সঙ্গী মহাজনের আড়ৎ হইতে ফিরিয়া আসিলে রান্না চাপাইতে হইবে। এই স্রোতের তোড়। বাড়ি ফেরা মুশ্কিল। জহির সাবধান করিয়া দিল।

—মিয়াঁ বা'ই, সমিরুদ্দী মক্তবে পড়ে?

—হ। খুব 'জেহেন' তেজ। মুলুবী সা'বে কন।

—গরীবের ঘরৎ জেহেন-তেজ ফুয়া। আল্লার রহমৎ।

—জেহেন তেজ অইলে কি। আঁই লেখাতে পড়াতে পারমু?

—আল্লা মালিক, মিয়াঁ-বা'ই। নিয়ৎ রাইখেন। পুরা হৈব।

জহির কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিল, সদাগরের গ'রৎ এত দেরি। আজ আর ন' আইয়ে। করিম মহাজনদের উদ্দেশ্যে গালি বর্ষণ করিতে লাগিল।

—চুপ, মিয়াঁ। মিছা গাল দি' হৈব কি?

করিম বিড়বিড় শব্দে আক্রোশ ঝাড়িতে লাগিল তবু জহির মিয়া গলুয়ের মুখে স্তব্ধ। গায়ে গামছাখানি বেশ উত্তাপ ছড়াইতেছে। আজ বাড়ি-ফেরা উচিত ছিল তার। একটি পয়সা দিয়া আসে নাই। কুলসুম কোথায় হাত পাতিবে! ঋণ-দেওয়ার লোকই বা কোথায়! স্ব-স্ব বিব্রত প্রতিবেশীবর্গ। সমীরের মক্‌তব নিয়মিত যাওয়া হইবে না। মৌলবী সাহেব বলিয়াছেন, এমন মেধাবী ছাত্র তিনি জীবনে দেখেন নাই। কোন স্বকমে পড়ার খরচ জোগাইতে পারিলে এই ছাত্র কালে বড় 'অফিসার' হইবে। জহির মিয়া ভবিষ্যৎ মরীচিকা-জাত আনন্দের পাশাপাশি নিরাশা-ক্লিষ্ট বর্তমানের ব্যঙ্গ কশাঘাত অনুভব করিতেছিল সারা শরীরে। মহাজনের টাকা না পাইলে ক্ষতি নাই। কিছু চাউল লইয়া সে বাড়ি ফিরিত! সঙ্গে কিছু টাকা আছে। কিন্তু সঙ্গীটি এমন আহম্মক, দেরি করিতেছে বৃথাই। তিনজন না হইলে উজানে যাওয়া অসম্ভব।

আকাশে চাঁদ নাই। জোয়ারের সময় ঠিক করা যাইবে না। চাঁদের কাঁটায় কাঁটায় জহির মিয়া বলিতে পারে, কখন শুরু হয় জোয়ার-ভাঁটা।

(মেঘের দৌরাত্ম্যে কালো ছায়া পড়িয়াছে নদীর আরশীর উপর। দিগন্তে পাহাড়ের রেখা অন্তর্হিত। শুধু মেঘ-পুঞ্জ ফেনস্ফীত সমুদ্রের মত গর্জন করিয়া অগ্রসর হইতেছে। তীব্র বাতাস উঠিলে ঘূর্ণিঝড় শুরু হইতে পারে।)

সাম্পানে দুইজনের মনে অবশ্য এই আশঙ্কার কোন ছায়া নাই। সঙ্গীর প্রতীক্ষার পিছনে অন্যান্য চিন্তার বিভীষিকা লোপ পাইয়াছে।

লঞ্চ এবার নিকটতর। নদী-সমতল অন্ধকার। তবু ইঞ্জিনের ঘট্‌ঘট্‌ শব্দ ও বাষ্প-নিস্রাবী নলের সুইং-সুইং রব মাঝিদের আন্দাজে প্রতারণার জাল ফেলিতে পারে না।

—খুব নজদিগ আইয়ে।

—আইতে দাও। আঁমর কিছু আছে? এত ডর কিল্লাই?

—লণ্ঠন নাই। সন্দ করমু না?

—ডর কিল্লাই? আঁরা আপিম বেচি, ন গাঁজা?

করিম আন্‌কোরা যুবক। কণ্ঠে ঝাঁঝ বেশি। আবার জোর দিয়া বলিল, ডর কিল্লাই, জহির-বা'ই ?

জেলে পাড়ায় ডুগ্‌ডুগ্‌ ঢোলক বাজিতেছিল। দানা-বাঁধা মেঘ বাতাসের ফুৎকারে উড়িয়া গেল। মৃত চাঁদের প্রেতাত্মা বোধ হয় কোথাও মেঘের কাঁধে সওয়ার। আকাশের ভয়ঙ্কর রূপ ফিকে হইয়া গিয়াছে। শ্যাম-শুভ্র জলধর নৈশ-জগতের পটভূমি রচনা করিতেছে।

জহির মিয়া আন্‌মনা। এত রাত্রে গ্রামের পথ পিচ্ছল। খানা-খোন্দক বৃষ্টির পানিতে ভরা। ব্যাঙের ডাক অনুযায়ী সাপের দল জুটিতেছে। মজিদ এখনও ফিরিল না। না, বাড়ি ফেরা হইবে না আজ। সমীর মক্‌তবের পড়া করিতেছে' ডিবার আলোয়। তাগিদ দিতেছে কুলসুম। কেরোসিন পুড়িতেছে, তাড়াতাড়ি পড়া সারো। তাড়াতাড়ি···

লঞ্চ খুব নিকটে। কিন্তু কিছু ঠাহর করা চলে না। জহির মিয়া শঙ্কান্বিত বুকে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ-সজাগ করিল অন্ধকার সমতলের উপর দিয়া। না, চোখ এখানে পঙ্গু ইন্দ্রিয়।

—কাস্টমর জাহাজ আইয়ে।

—হ।

অন্ধকার নদীবক্ষ চিরিয়া হঠাৎ আলোর বর্শা নিক্ষেপ করিতেছে তারা যেন। সন্ধানী-আলোয় চোখে দিশা লাগে। সব স্বচ্ছ হইয়া আসে কিছুক্ষণ পরে। পঞ্চাশ ষাট ফিট দূরে রিভার-পুলিশের লঞ্চ। ডেকে আলো জ্বলিতেছে। টর্চ ফেলিতেছে লঞ্চের আপাতত মালিকেরা।

নৈশ ডাকে কম্পন জাগে : অ' সাম্পানের মাঝি।

টর্চের আলো পড়িল জহির মিয়ার সাম্পানের উপর। আশেপাশে আরো সাম্পান রহিয়াছে। কোন্‌ মাঝিকে ডাকিতেছে ইহারা ?

—অ সাম্পানের মাঝি-ই-ই-ই···

জহির মিয়ার সঙ্গী চিৎকার করিয়া জবাব দিল : কি রুন ?

লঞ্চের ডেকের উপর দু-তিনজন কনেস্টবল। একজন অফিসার। পরনে হাফ-প্যান্ট, হাফ-শার্ট, ক্রসবেল্ট, রিভলভার ঝুলিতেছে নিতম্বদেশে। তীক্ষ্ণ বিদ্যুতের আলোয় স্পষ্ট প্রত্যেকটি আরোহী।

কনেস্টবল চিৎকার করিয়া যাইতে লাগিল : অ সাম্পানের মাঝি।

করিম প্রাণপণে জওয়াব দেওয়ার চেষ্টা করিল প্রতিটি বার। কাহার উপর এই আহ্বান-বাণ বর্ষিত হইতেছিল, জানা গেল না। কনেস্টবল ডাকিয়া চলিল।

সমস্ত গাঙের মাঝি ও তাহাদের অনাগত শিশু-মাঝিদের যেন আজ কনেস্টবলের প্রয়োজন।

কি প্রাণপণ চিৎকার!

জহির মিয়া জবাব দিতে যাইতেছিল, করিম বারণ করিল।

—বইয়ো। হালাগো গলায় কি গিরামোফোনের কল আছে?

—আঁই জবাব দি'।

—না, মিঁয়াবা'ই। ডর কিল্লাই? বে-আইনী কিছু করিয়ারে ত, ডর।

জহির মিয়া মাস্তুলের খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। শঙ্কিত সে। ভয়ের মাত্রা আরো বাড়িয়া গেল। হঠাৎ লঞ্চের আলো নিমেষে নির্বাপিত হইল। ঘড়ঘড় শব্দ, লঞ্চের পাখ্‌না স্রোত কাটিতেছে। নদীর উপর কাজল তমসার আলিঙ্গন ঘনতর ঠেকে এখন।

—বাতি বুজাইল্, এ্যাঁ।

—হ।

—হালার মতলব আছে।

বোধ হয় আত্মীয়তা পাতাইতে সাম্পানের নিকটে আসিয়া লঞ্চের আলো জ্বলিয়া উঠিল। সাম্পান হইতে মাত্র কয়েক হাত দূরে।

ডেকের উপর হইতে কনেস্টবল জিজ্ঞাসা করিল: অই, এত ডাকি, কানে ছ্যাঁদা নাই? রাও নাই মুখে?

জহির মিয়া জবাব দিল: দিছি ত' জবাব।

—জবাব দিয়েছ? আমাদের কানে ছ্যাঁদা নাই?

—ঝুট কই না, হুজুর।

—নজ্‌দিক আয়। লঞ্চ হইতে জবাব আসিল।

আবার নোঙর তোলার হাঙ্গামা, ইতস্তত করিতেছিল জহির মিয়া।

—হুজুর, লঞ্চ ইন্দি লইয়্যাসেন। পানির জুর বেশি।

কনেস্টবল-অফিসার সকলে গেটের মুখে দাঁড়াইয়া। প্রত্যেকের হাতে টর্চ।

—নোঙর বাড়িয়ে দে।

মন্দ যুক্তি নয়। জহির মিয়া নোঙরের শিকল বাড়াইয়া সাম্পান লঞ্চের গায়ে ভিড়াইল। একজন কনেস্টবল লাফাইয়া পড়িল সাম্পানের উপর।

অন্য একজন কনেস্টবল বলিল: এত ডাক্‌লাম—বাতি জ্বালাস্‌নে কেন? আয় লঞ্চের উপর।

জহির মিয়া লঞ্চের উপর উঠিয়া গেল।

দুই হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইল সে অফিসারের সম্মুখে।

—এই মাঝি, সাম্পানে আলো নেই কেন?

—হুজুর কেরোসিন নাই। গ'রৎ সব আঁদার।

—মিথ্যে কথা।

—আল্লার কিরা হুজুর।

—ফের মুখে আল্লার নাম, বে-তমীজ।

সিগারেট টানিতেছিল প্যাণ্ট-বুট ধারী। জিজ্ঞাসা করিল, নামাজ পড়ো?

—আঁই?

—হ্যাঁ তুমি, তুমি।

—পাঞ্জেগানা নামাজ কা'জা ন কইরি, হুজুর।

বুটধারী হাসিল, পাঞ্জেগানা নামাজ। যা হয় হোক, সাম্পানে আপিম রেখেছ?

—না, হুজুর। আঁরা বাঁশ বইয়ি।

ধমক দিল প্রশ্নকর্তা: সাম্পানে আপিম আছে?

শঙ্কিত বিহ্বল জহির মিয়া। প্রশ্নকর্তার অবয়বের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। নরম চর্বিদার শরীর। এত রুক্ষ কণ্ঠস্বর।

—কথা বলিস্ না। সাম্পানে আপিম আছে?

—না, হুজুর।

—লঞ্চ দেখে নদীতে ফেলে দিয়েছ, না?

—বিশ্বাস না লয়, ছাইখেন সরেজমিন।

সাম্পানের ভিতর কনেস্টবল ছিল। তার উদ্দেশ্যে চিৎকার করিয়া সে বলিল, কনেস্টবল, ঠিক্-সে দেখো।

জবাব আসিল, জী আচ্ছা।

তোমার লাইসেন্স আছে?

—লাইসিন? জী।

লুঙ্গীর খোঁট হইতে একটি চিরকুট বাহির করিল জহির মিয়া। ইহার ভিতর কোন জুয়াচুরি নাই।

সাম্পান হইতে কনেস্টবল হাঁকিল: না কিছু নেই।

বুটধারী সিগারেট মুখ হইতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া ধমক দিল। কনেস্টবল, সাম্পানের তক্তা শুঁকে ছাখ আপিমের গন্ধ আছে কি না। তর সহিল না তার। নিজে আরো দুইজন কনেস্টবল সহ সাম্পানের উপর উঠিয়া পড়িল। একজন কনেস্টবলের জিম্মায় রহিল জহির মিয়া লঞ্চে।

কনেস্টবলগণ উপুড় হইয়া সাম্পানের তক্তা শুঁকিতে লাগিল। পুলিশের ভয়ে আফিম ফেলিয়া দিলেও গন্ধ সহজে যাইবে না।

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে নাকি একরকম ঘ্রাণ-তীক্ষ্ণ কুকুর ব্যবহার করা হয়। এখানে কোন কুকুর ছিল না।

একটি কনেস্টবল হঠাৎ সানন্দে চিৎকার করিয়া উঠিল, স্যার।

স্যার সাম্পানের বাহিরে ছিলেন। কনেস্টবলেরা ছাউনীর ভিতর ঢুকিয়াছে। পুঁটলি-হাতে একজন বাহির হইয়া আসিল।

—স্যার, এর ভেতর আপিমের গন্ধ।

—চলো, লঞ্চে খোলা যাক।

কিন্তু তার ধৈর্য অত ঘন নয়। কনেস্টবলটি পুঁটলি খুলিতে খুলিতে অগ্রসর হইতে লাগিল।

জহির মিয়া বোকার মত এই দিকে চাহিয়াছিল, হঠাৎ সে হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল: আস্তে খোলেন সাব।

—আস্তে!

বুটধারী খুব জোরে এক থাপ্পড় দিল তার গালে। সংঘবৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছে। আরো কয়েকজন অংশগ্রহণ করিল।

—শালা ঝুট্ বাৎ করতা হ্যায়।

কান ধরিয়া দুই ঠোক্কর দিল জহির মিয়ার নিতম্বে।

কিন্তু নিরস্ত হইবার বান্দা নয় জহির মিয়া। তার চোখ নিজের শরীরের দিকে নয়।

—আস্তে খোলেন, সাব। উয়ার ভিতর আঁর ফুয়ার কিতাব।

—কিতাব আছে, আর আফিম আছে?

এইবার ব্যঙ্গ-ধমকানি ও লাথি খাইল সে। মোটা বুটের লাথি।

—মারেন আঁঅরে। পানির মদ্দি কিতাব না পড়ে, হুজুর।

করিমকেও ধরিয়া আনা হইল লঞ্চে।

—আঁই আপিম খাই, হুজুর। পেটের অসুগ আপিম খাইয়ারে।

জোরে চিৎকার করিয়া কহিয়া উঠিল জহির মিয়া। চিৎকার-বেশী অসহায় প্রতিবাদ।

পুঁটলি খোলা হইল। জহির মিয়া এইবার মিথ্যা বলে নাই। শালপাতার মোড়কে দু-আনা ওজনের আফিম। বহুবার পেটের অসুখে পড়িয়াছে। ডাক্তার কিছু করিতে পারে নাই। এখন আফিম খাইয়া সে ভাল থাকে।

বাংলা দেশে পাড়াগাঁয়ে আফিম ত আফিম নয়। ধন্বন্তরী। রোগে, শোকে ও দুঃখে।

—ঝুট্টা তবে যে বল্‌লি—কনেস্টবল, আমার মাফ্‌লারটা দে, বড়ঠাণ্ডা—আপিম নেই সাম্পানে।

—চোরাই আপিম কণ্ডে, সা'ব।

চোরাই আফিম কোথায়। জহির কাঁপিতেছিল। হঠাৎ চড়া কথা বলিয়া ফেলিয়াছে সে।

মাফ্‌লার পরা শেষ হইল।

—সব ঝুট্টা। চল্ থানায়।

—হুজুর!

একটি কনেস্টবল করিমকে ইঞ্জিন-রুমের এক দিকে লইয়া গেল। আব্‌ছা অন্ধকার জায়গাটা। নীচে স্রোত তরতর বহিয়া যাইতেছে।

—বন্দোবস্ত করো, মিয়া। হাজার হাঙ্গামা। থানায় যাও। এক দিনের রুজি কামাই। বাঘে ছুঁলে—

—বেকসুর।

—আরে তোর কসুরের নিকুচি—। আমি বলব সাব-কে বুঝিয়ে—এইবার ছেড়ে দিন।

নদীর কিনারা হইতে ডাক ভাসিয়া আসিতেছিল: অ সাম্পানের মাঝি-ই···অ সাম্পানের মাঝি, কিনারউ।

মজিদের কণ্ঠস্বর। কে জবাব দিবে এখন।

—অ সাম্পানের মাঝি কিনার খাড়াউ-উ-উ···

কণ্ঠস্বর থামিয়া গেল। জবাব দেওয়ার উপায় নাই। উৎকর্ণ করিম। তাকে কথাবার্তা চালাইতে হইতেছে।

—অ জহির বা'ই সাম্পান কিনার লাগাইও।

কনেস্টবল আবার জহিরকে ইঞ্জিন রুমের দিকে লইয়া গেল।

পৌঁছানো মাত্র করিম বলিল: আছে গাঁঠৎ পা'শ টিঁয়া।

—হ।

সাম্পান ঠেলিয়া দিয়া পাটাতনের উপর বসিয়া পড়িল জহির মিয়া। মাথা ঘুরিতেছে তার। হঠাৎ সুপ্তোত্থিতের মত সে বলিল: ও বা'ই। আঁঅর পুঁটলি, আঁঅর পুঁটলি।

হাতড়াইতে লাগিল সে। উর ভেতর আঁঅর ফুয়ার কিতাব।

জহির মিয়া চাহিয়া দেখিল, লঞ্চ চলিয়া যাইতেছে। নদীর দু'পাশে অন্ধকারের পরিখা।

—আঁঅর পুঁটলি ?

—তোঁঅর হাথৎ মিন্না-বা'ই।

অন্যসময় হইলে করিম হাসিয়া কুটি-কুটি হইয়া যাইত। এমন অন্যমনস্ক, উদ্‌ভ্রান্ত মানুষ। চুপ করিয়া রহিল সে।

দুইজন কিছুক্ষণ স্তব্ধ বসিয়া রহিল। কি যেন ঘটিয়া গিয়াছে। এখনও স্পষ্ট উপলব্ধির বাহিরে।

—অ সাম্পানের মাঝি কিনারও। আঁই মজিদ। অ···

জহির মিয়া নোঙর খুলিয়া দিল।

(পরদিন সকালে গ্রামে ঢুকিয়া জহির মিয়ার চোখে পড়িল ঝড়ের আক্রোশ-শান্ত রূপ। গাছ-গাছালির ভাঙা ডালে সড়ক বোঝাই। উঠানের মুখে ভাঙা মুণ্ড লইয়া সুপারি গাছটা দুলিতেছে। সূর্য উঠিয়াছিল। চিক্‌চিকে রৌদ্র ছড়ানো দাওয়ার উপর) এক পাশে বসিয়া সমিরউদ্দিন। সম্মুখে কেতাবের দপ্তর খোলা।

হাই তুলিয়া চোখ ফিরাইতে সে সানন্দে চিৎকার করিয়া উঠিল, বা-জান। সমীর নিজের জায়গা ছাড়ে নাই। সে জানে, পড়া ছাড়িয়া বাবার খাতিরদারি করিতে গেলে বকুনি খাইতে হয়।

—আব্বা আঁঅর ল্লাই—

কি যেন জিজ্ঞাসা করিতে গেল সমীর। ততক্ষণ জহির মিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়াছে। বাহির হইয়া আসিল সে তখনই।

—তোঁআর মা কণ্ডে গেইয়ে।

—বা-জান কর্জের ল্লাই।

কুলসুম সকালেই কর্জের জন্য বাহির হইয়াছে।

জহির মিয়া আবার ঘরে ঢুকিল। তৃষ্ণা পাইয়াছে তার।

কলসে জল ছিল না। বাহিরে আসিল তৎক্ষণাৎ।

—আব্বা আঅর ল্লাই কিতাব—

—হারামজাদা, কিতাব! উডন পারস না ?

—আঁই পড়ি, আব্বা।

—পড়স্। পইড়্যা হৈব কি। উড্ হারামজাদা। ডাক তোঁয়ার মারে। আঁই পড়ি। পৈড়্যা হৈব কি।

ভীত সমীর বসিয়া রহিল। পিতার এমন মূর্তি সে কোনদিন দেখে নাই।

—আঁই পড়ি! উড্।

বিভ্রান্ত সমীর।

জহির মিয়া বলিয়া যায়: পইড়্যা হৈব কি? ইলেম—ইলেমের মার—স্যুট-বুট পাছায়, ফির গু'স চায়। ইলেমে দরকার নাই। উড্। পড়নের কাম নাই।

সমীর কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিতেছিল না। ভয়ে কাষ্ঠ-পুত্তলী বনিয়া গিয়াছে সে।

—উড্। জল্‌দি।

সমীর এইবার দাঁড়াইল। সঙ্কোচ-আড়ষ্ট।

—হালার পুত্ কাউরে ডাইক্‌তে পারস না। পইড়্যা হৈব কি। পড়স তুই, খাড়া র—

জহির মিয়া তখনই পুঁটলি খুলিয়া নূতন পুস্তক ফড়্‌ফড়্ শব্দে ছিঁড়িতে লাগিল। মুখের কামাই নাই: ইলেম—এই ইলেমে হৈব কী।

হঠাৎ তার চোখে পড়িল সমীরের দপ্তরের উপর। কয়েকটি বই খোলা পড়িয়াছিল। তুলিয়া লইল সে ছোঁ মারিয়া এবং শকুন যেমন মৃতপশুর অন্ত্র ছিন্নভিন্ন করে, বইয়ের পাতাগুলি তেমনই নির্দয়ভাবে ছিঁড়িতে লাগিল।

মুখে তুপ্‌ড়ি ছুটিতেছে তার: হালার ইলেম। স্যুট-বুট আর গু'স। তারপর একটি অকথ্য গালি দিয়া বলিল, স্যুট পাছাং, গু'স মুখে, এই ইলেমে হৈব কি। বেদ্দমার জাত। (সমীরের দিকে ফিরিয়া) তোঁয়ার মারে ডাক্। উড্—হারামীর ছাউ—উড্।

বকৃশিস

আবু রুশ্‌দ

এমন মুনিব পাওয়া বস্তুতই ভাগ্যের কথা। প্রায় সাত বছর ধরে শফি চাকরের কাজ করেছে। এ সময়ের মধ্যে ছয় সাত জায়গায় সে কাজ করেছে, মুনিবও দেখেছে নানা রকমের, কিন্তু এমন মুনিব তার ভাগ্যে আর কখনও জুটে নাই। মাইনে আট টাকা। বকশিসও পাওয়া যায় যখন তখন। সময় সময় পুরনো পাঞ্জাবী ধুতিও পাওয়া যায়। সব মিলে শফি মিঞা বলতে গেলে রাজার সুখে আছে।

মুনিবের নাম মকবুল আহমদ। এখনও বিবাহ করে নাই, মাইনে শ' দুই টাকা পায়। দু'হাতে টাকা খরচ করে। কলকাতায় টাকা খরচ করে সুখ আছে। শফি এটা লক্ষ্য করেছে, মুনিবরা যতদিন অবিবাহিত থাকে ততদিন তাদের দিলটা থাকে বেশ দরাজ। বিবাহ হলেই প্রধানত স্ত্রীদের উস্কানিতে তারা কেমন যেন বদলে যায়, তখন একটা আধলাও এদিক ওদিক হবার যো থাকে না। মকবুলেরও শোনা যাচ্ছে শীঘ্রই বিবাহ হবে। তখন শফিকে বাধ্য হয়েই অন্য ঘর দেখতে হবে।

যার সঙ্গে মকবুলের বিয়ে হবার কথা হচ্ছে তাকে সে আগে থেকেই চেনে। মকবুলের মা বাবা অবশ্য এ বিবাহে তেমন রাজী নন—তাঁদের ইচ্ছা ছিলো কোন এক ধনীকন্যার সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিতে। তবে ছেলে একেবারে বেঁকে বসাতে তাঁদের সে ইচ্ছা আর কাজে পরিণত হতে পারলো না। ছেলের মনের ইচ্ছাকে অত সহজে উপেক্ষা করা যায় না, বিশেষ করে যখন তার মূল্য নগদ দু'শ টাকা দাঁড়ায়। তাই মকবুল যাকে চায় তারই সঙ্গে তার বিয়ে হওয়া প্রায় ঠিকঠাক হয়ে গেছে।

বাবুদের এই একটা বিলাস—পছন্দ করে বিয়ে করা। বাবুদের ভাষায় একে বলে প্রেম। যে মেয়ের সঙ্গে প্রেম না হোল তাকে বিয়ে করা বাবুরা এক গর্হিত পাপ মনে করেন। কথাটা ভেবে হাসিতে ঠোঁট বেঁকে যায় শফির। তাহলে বলতে হয় ফুলজানকে শফি ভালোবাসে। স্বাস্থ্য আছে ফুলজানের, তার মুখের

শ্রী অনেক ভদ্রঘরের বউকে লজ্জা দেবে। লাস্যে এবং চটুলতায়, দেহ-সৌষ্ঠব এবং প্রাণশক্তিতে ফুলজান কারুর থেকে কম যায় না। আর একটু ভালো ঘরে জন্মালে ও কিছুটা লেখাপড়া শিখলে ফুলজানকেই হয়ত মকবুল পছন্দ করে ফেলতো। তখন ফুলজানের কৃপণতার জন্যই শফিকে এখানকার চাকরিটা ছাড়তে হতো। এ সম্ভাবনা মনে হওয়াতে শফি গাল ফুলিয়ে প্রকাণ্ড হাসি হাসে।

এখন অবশ্য শফির কোন ভাবনা নেই। যা ইচ্ছে খুশি তাই করে, মকবুল কিছুই বলে না। মকবুলের 'গডরেজ' (নং ১) সাবান দিয়ে মুখ ধোয়, জবাকুসুম মাথায় দেয়, হেজ্‌লীন স্নো মুখে মাখে, ৯৯নং 'স্টেট এক্সপ্রেস' টিন থেকে যখন যে কটা ইচ্ছে সিগ্রেট তুলে নেয়।

হয়ত কোন দিন মকবুল বলে : টিনে সিগ্রেট একটু কম মনে হচ্ছে শফি।

শফি মধুর হেসে বলে : সিগ্রেট আর কে নেবে, আমরা গরীব লোক বাবু, বিড়ি ফুঁকি।

লজ্জিত হয়ে মকবুল তাড়াতাড়ি বলে : না, আমি কি আর তাই বলছিলাম রে।

শফি সন্তুষ্ট মনে নিজের কাজে চলে যায়।

চা খেয়ে মকবুল কাগজ পড়ছে। এমন সময় বাজারের টাকার জন্য শফি এসে হাজির। টাকা চাইবার আগে অন্তরঙ্গ স্বরে বলে, বাবু, যুদ্ধের খবর কি ?

মকবুল যতই ভালো ছেলে হোক্, যুদ্ধ নিয়ে সে শফির সঙ্গে আলোচনা করতে প্রস্তুত নয়। একটু বিরক্তির স্বরে বলে : খবর আর কি, এই জার্মানরা জিতছে।

হাওয়া কোন দিকে বইছে তা শফি টের পায়। তাই যুদ্ধের প্রসঙ্গ আর না তুলে সোজা কাজের কথাটি পেড়ে বসে : বাজারের টাকা বাবু।

চেয়ার থেকে উঠে নিজের কামরায় গিয়ে আলমারী খুলে একটা টাকা বের করে মকবুল শফির হাতে দেয়। শফি জিজ্ঞেস করে : বাজার থেকে কি আনবো, বাবু ?

—যা রোজ আনিস তাই। নির্লিপ্ত স্বরে মকবুল বলে।

—আজকাল বাজারে টোমাটো উঠেছে, আনবো ?

—কি দিয়ে রাঁধবি টোমাটো—আল্‌গা আগ্রহের স্বরে মকবুল জিজ্ঞেস করে।

—কেন মাংস দিয়ে। শফি চট করে জবাব দেয়।

—তা আনগে যা। মকবুল আবার খবরের কাগজটা হাতে তুলে নেয়।

ঝুড়ি নিয়ে বাজারে যায় শফি। তার ভারি মায়া হয় মকবুলের প্রতি। আহা বেচারী এ রকম লোক। বিয়ে না করলে সকলে তাকে একেবারে চুষে খাবে। মকবুলের মুখ দেখলেই কেমন যেন একটা মায়া পড়ে যায়। মায়ার আধিক্যে শফির মন বাজার-খরচা থেকে আজকে দু'আনার বেশি লাভ করতে রাজি হয় না। বিবেক বলেওত' মানুষের একটা জিনিস আছে।

মকবুল অফিসে যাওয়ার পর একটু বিশেষ সাজ ক'রে শফি ঘরদোর বন্ধ করে ফুলজানের ওখানে যায়। ফুলজান তখন কাজটাজ সেরে নিজের টিনের কামরায় এসে বসেছে। শফিকে দেখে এক গাল হেসে বলে: তোকে যে আজকে দেখতে রাজপুত্তুর হয়েছে। কাকে ঘর থেকে বের করতে আজকে বেরিয়েছিস তুই?

—তোরে। শফি বলে।

—বেশি ঢঙ করিসনে। তোর জন্য আমি ঘর থেকে বেরুবো এমন মুরোদ তোর নেই।

—কেন, চেহারাটা আমার খারাপ হোল নাকি? শফির গলার স্বরটা একটু চড়ে যায়।

ফুলজান মিটিমিটি হাসে।

ভাঙা খাটের এক কোণে বসতে গিয়ে ফুলজানের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হয়ে যায় আর কি।

—এই দুপুর বেলা তোকে ফষ্টি করতে কে বলেছে। ফুলজান তেতো কথা বলে।

—নে আমার কাছে আর সতীগিরি ফলাস নে। বীরত্ব-ব্যঞ্জক স্বরে শফি বলে।

—অমন কথা যদি আবার বলিস তো তোরে ঝাঁটা মেরে বের করে দিব। ফুলজান রেগে গেছে। ফুলজানের রাগকে শফি রীতিমত ভয় করে চলে। ফুলজানের রাগ যে কি জিনিস তা এর আগে দু'একবার সে টের পেয়েছে। তাই ফুলজানকে খুশি করবার জন্য বলে: আমি এলাম কাজ ছেড়ে তোর সঙ্গে একটু গল্প করবো বলে, আর তুই অমনি চটে গেলি।

—তা চটবার কথা বললে চটবো না? ফুলজান অনেকটা নম্র সুরে বলে।

—চটলে কিন্তু মাইরি বলছি ভাই, তোকে ভারী সুন্দর দেখায়। ফুলজানকে খুশি করতে শফি বদ্ধপরিকর। মনে মনে খুশি হলেও বাইরে গোমরা ভাবটা বজায় রেখে ফুলজান বলে: রঙ্গ দেখে বাঁচিনে। কিছুক্ষণ চুপচাপ।

নিস্তব্ধতা ভাঙে ফুলজানই: আমায় ত তুই বিয়ে করবি ঠিক, মিনসে আমাকে তালাক দিতে রাজি হয়েছে।

—এখন বিয়ে করবো তোরে কি করে, টাকা পয়সা একটু জমাতে দে। শফি ভাসা ভাসা কথা বলে।

—টাকা জমালে ত বিয়ে করবি ঠিক, খোদার কসম খা। ফুলজানের স্বরে অনুনয়।

—তা করবো রে বিবি সাহেব, করবো।

শফির প্রতিশ্রুতিতে ফুলজানের মুখ আনন্দোজ্জ্বল হয়ে উঠে।

শফি ফিরবার উপক্রম করছিলো, ফুলজান বলে: ওঃ ভুলেই গিছলাম, একটা কথা আছে তোর লগে।

—কি কথা রে? শফি জিজ্ঞেস করে।

—আমায় পরশু দিনের মধ্যে একটা টাকা জোগাড় করে দিতে লাগবো, ভারী ঠেলাতে পড়েছি।

—এখন এই মাসের শেষে আমি টাকা পাব কই? অপ্রস্তুত স্বরে শফি কথাগুলো বলে।

—তার আমি কি জানি, কিন্তু টাকা আমার চাই-ই।

—এই ত আর একটা মুস্কিলে ফেললি তুই। শফি বিব্রত বোধ করে।

—যে মরদ একটা টাকা জোগাড় করতে পারে না তার আবার পীরিত করা কেন? আবার রেগে যায় ফুলজান।

এবার বুক ফুলিয়ে চড়া স্বরে শফি বলে: কে তোরে বলেছে আমি টাকা জোগাড় করতে পারবো না, মরদের বাচ্চা না আমি।

—সাবাস মরদ, এই ত চাই। কৌতুকে হঠাৎ উছলে ওঠে ফুলজান।

—আমায় তুই কি ভেবেছিস; এ মিঞা ইচ্ছা করলে কি-না করতে পারে। নওয়াবী চালে শফি বলে। ফুলজান কিছুক্ষণ নীরব থাকে, তারপর অদ্ভুত স্বরে বলে: যদি পরশু দিন বিকেলের মধ্যে আমায় এনে দিস তবে বুঝবো তুই আমায় সত্যিই নিকাহ্ করবি, আর যদি টাকা না আনতে পারিস তবে তুই ও আমার এখানে আর আসিস নি।

—একটা কেন পরশু দিন তোরে দু'টো টাকা দিয়ে যাব দেখিস—অসতর্ক মুহূর্তে শফি প্রতিজ্ঞাই করে বসে।

ফুলজান উৎফুল্ল হয়ে বলে: সাধে কি তোরে দেখে আমি মজেছিলাম।

আমিরী কায়দায় পা ফেলে শফি ফুলজানের কামরা থেকে বেরিয়ে আসে।

বাসায় ফিরে কিন্তু শফিকে টাকা জোগাড় করবার ভাবনা পেয়ে বসে। মাঝখানে আর মাত্র একটি দিন। এর মধ্যে কোত্থেকে সে গোটা একটা টাকা

জোগাড় করবে? মাসের একদম শেষের দিকে তাকে ধার দিতেই যাবে বা কে। যে একটা বন্ধু আপদে বিপদে টাকা দিয়ে সাহায্য করতো, তার সঙ্গে শফির ফুলজানকে নিয়ে চির-বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। জ্ঞানী লোকেরা কথাটা ঠিকই বলেছেন, মেয়েমানুষরাই যত নষ্টের গোড়া। ফুলজানের সঙ্গে আলাপ না হলে বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়াও হোত না, এবং বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া না হলে একটা টাকা ধারও সে পেতো। অবশ্য ভাবনার তীব্রতায় এ কথাটা শফি স্রেফ ভুলে যায় যে, ফুলজানের সঙ্গে আলাপ না হলে তাকে একটা টাকার জন্য এত ভাবতেও হোত না।

আসল কথা হোল কি করে টাকাটা জোগাড় করা যায়। বাবুর অজান্তে তার ড্রয়ার থেকে একটা টাকা নেবে নাকি? না, তা হয় না। অমন করে চুরি করা কিছুতেই ঠিক হবে না। আর বাবু লোকটা ভারী ভালো। এমন ভাবে তার ক্ষতি করতে থাকলে ফলটা খারাপ না হয়ে যায় না। অতটা অন্যায় খোদা সইবেন না। বাজারের টাকা থেকে রোজ আনা তিনেক করে রাখলেও এক টাকা সঞ্চয় করতে প্রায় ছয়দিন লেগে যায়। আর এদিকে ফুলজান গোঁ ধরে বসেছে, পরশু দিন টাকা না পেলে তার চলবেই না। অসম্ভব রকম জেদী মেয়ে ফুলজান। যখন যা মনে হয় তাই করবে, অন্য কারও কথাতে কান দেবে না। ফুলজানের প্রতি তার নিজেরও কেমন একটা দুর্বলতা হয়ে গেছে। একটা টাকা কেন, একশো টাকা দিলেও ফুলজানের ঠিক দাম দেওয়া হয় না।

টাকার চিন্তায় শফির কাজেও দু'একটা ভুল হয়ে যায়। মকবুল বলে: তোর আজকে হয়েছে কি রে, শফি? কাজে একদম মন নেই?

—না, কি আর হবে বাবু।

—কিছু যদি না হয়ে থাকে তবে পানি আনতে বললে খালি গ্লাস আনিস কেন? মকবুল জানতে চায়। শফি খালি বোকার মত হাসে।

মকবুল আবার বলে: এইটুকু ত তোর কাজ, তাতেও ঢিলা দিতে লেগেছিস।

লজ্জিত বদনে শফি তার মনিবের দিকে চেয়ে থাকে।

মকবুল বলে: যা, আর বোকার মত অমন করে দাঁড়িয়ে থাকিস না, এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি নিয়ে আয়। শফি তাড়াতাড়ি চলে যায়।

একদিন পরে। আজকে বিকালের মধ্যেই ফুলজানকে টাকা দিয়ে আসতে হবে—এই চিন্তা নিয়েই শফির ভোরে ঘুম ভাঙে। বিমর্ষ মনে উনোন ধরায়। ধোঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে মনে মনে চিন্তা করে কি করে টাকাটা জোগাড় করা যায়। বাবুর কাছ থেকে চাইবে নাকি? মাসের শেষে বাবু বোধ হয়

টাকা দিতে পারবে না। এ এক আচ্ছা ল্যাঠায় পড়া গেলো, যাহোক! চা দেবার সময় বাবুর মুখের দিকে চেয়ে দেখে, মকবুলের মুখে বেশ হাসিখুশি ভাব। বাবুর মেজাজ ভালই আছে। খোদা সত্যিই মেহেরবান।

মকবুল বলে: একটা কাজ করতে পারবি রে, শফি?

—কি কাজ বাবু? শফি আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করে।

—দশ নম্বরের বড় বিবিসাহেবকে চিনিস ত?

—তা আর চিনি না বাবু। সেই যে তাঁর কাছ থেকে একটা চিঠি এনে দিয়েছিলাম আপনাকে। বিবিসাহেব লোক খুব ভাল বাবু, আমাকে প্রায়ই বকশিস্ দেন।

মকবুল হেসে বলে: সেই বিবিসাহেবের কাছেই তোকে একটা চিঠি দিয়ে আসতে হবে, পারবি ত?

—খুব পারবো। শফি মকবুলকে আশ্বাস দেয়।

—যদি চিঠিটা ঠিক করে পৌঁছে দিতে পারিস ত তোকে বকশিস্ দেবো। কিন্তু দেখিস আর যেন কেউ টের না পায়।

—তা আপনি কিছুটি ভেবেন না বাবু, আমি কি আর অতই কাঁচা লোক। বলে মনের আনন্দে শফি রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিলো।

তাকে ডেকে মকবুল বলে: কোথায় যাচ্ছিস রে শফি?

—যাই বাবু, রান্না চড়াতে, দশটায় আবার আপনার অফিস।

—আরে বস না, তোর ফুলজানদের ওখানে আজকাল আর তুই যাস না?

—যাই বাবু, হাসিতে শফি প্রায় গলে পড়ে, আজকে সন্ধ্যার দিকে তার ওখানে যেতে বলেছে।

—তোদের নিকাহ্ হবে কবে? বেশ আগ্রহের স্বরে মকবুল জিজ্ঞেস করে।

—টাকা কিছু আগে জমিয়ে নি, বাবু।

হঠাৎ শশব্যস্ত হয়ে নিজের কামরার দিকে যেতে যেতে মকবুল বলে: যা এবার রান্না করগে যা, চিঠিটা ঠিক জায়গায় পৌঁছিয়ে দিতে ভুল হয় না যেন।

মকবুল অফিসে চলে গেলে নিজের খাওয়া দাওয়া সেরে শফি বাবুর কামরা গুছাতে আসে।

প্রথমেই তার চোখে পড়ে ৯৯৯নং 'স্টেট এক্সপ্রেস'-এর টিনটা। বাবু তাড়াহুড়াতে দেরাজে বন্ধ করে রাখতে ভুলে গেছেন। টিনটা খোলা পড়ে আছে। বন্ধ করতে গিয়ে সিগ্রেট-এর গন্ধে শফির নাক আমোদিত এবং মন প্রলুব্ধ হয় তবে আজকের দিনটা কিছু চুরি না করাই ভালো। বাবু বলে গেছেন বকশিস্

দেখেন। বাবু লোক খুব ভাল। কয়েকটা সিগ্রেট শফি না চুরি করলই বা। বাবুকে এমন ভাবে সর্বস্বান্ত করা তার কিছুতেই উচিত হবে না। কলেজা আছে তার বাবুর, নইলে কথায় কথায় কেউ এমন বকশিস্ দেয়।

শফি সব কিছু গুছিয়ে একবার কামরাটার দিকে চেয়ে দেখে। মকবুলের রুচি যে অনিন্দণীয় তা তার কামরা দেখলেই বোঝা যায়। একটা কামরা সাজাতে যা-কিছু দরকার তার প্রত্যেকটি মকবুল এনে জড়ো করেছে। তার বিছানাটা দুগ্ধ-ফেনিল শুভ্র। দেখলেই শরীরটা আলস্যে মদির হয়ে আসে।

বিছানায় বেশ আরাম করে শফি গড়িয়ে পড়ে। তার শরীরটা এখন ভারী নরম মনে হচ্ছে। একেই বলে আরাম। ফ্যানটা ছেড়ে দিলে কেমন হয়। না থাক্। অত বাবুগিরি আরাম ভালো না, এমনিই হাওয়া দিচ্ছে বেশ।

হঠাৎ শফির মনে পড়ে: তার যদি এ রকম স্বচ্ছলতা থাকতো! খোদা যে কেন একটা লোককে ধনী এবং আর একটা লোককে গরীব করেন তার রহস্য শফি শত চেষ্টা করেও ভেদ করতে পারে না। শফি যদি কোন স্বচ্ছল সংসারে জন্মাতো, তবে সে হয়ত মকবুলের চেয়েও বেশি উন্নতি করতে পারতো। শফির আত্মবিশ্বাস দুর্মদ। আচ্ছা, কল্পনা করা যাক, এখন সে-ই এ ঘরের মালিক। এ কামরাটা তার নিজের। ওই যে দক্ষিণ দিকের জানালা ঘেঁষে চেয়ারটা তাতে, ধরা যাক, ফুলজান বসে আছে। আর শফি বিছানায় গা এলিয়ে অলস চিন্তা করছে। ফুলজান হয়ত তার সন্তানের জন্য 'সোয়েটার' বুনছে। আড়চোখে কর্মরত স্ত্রীর দিকে শফি চেয়ে দেখছে এবং নিজের ভাগ্যকে মনে মনে প্রশংসা করছে। বস্তুত, একটু মাজাঘষা করলে ফুলজানকে বেগমদের মতই দেখাবে। দুত্তোর ছাই, কেবল কল্পনা করে আর কতটা সুখ পাওয়া যায়। বিরক্ত মনে শফি বিছানা থেকে উঠে বিছানাটা ঝেড়ে দেয়। সিগ্রেটের টিনটার দিকে আবার তার লুব্ধ দৃষ্টি পড়ে। দু'তিনটা সিগ্রেট বের করে নিলে মকবুলের কিই-বা আর ক্ষতি হবে। টেরই পাবে না সে হয়ত। টিন খুলে কয়েকটা সিগ্রেট শফি বের করতে যাবে এমন সময় বাইরে কার পদধ্বনি শুনে ধড়ফড়িয়ে সে টিনটা বন্ধ করে দেয়। বাবু কোনো কাজে হঠাৎ ফিরে এলেন নাকি? বাইরে এসে শফি দেখে, মর এ যে ফুলজান!

—তুই আবার এখন এখানে মরতে এলি কেন? শফির কণ্ঠ একটু কর্কশ।

—টাকা জোগাড় করেছিস্? ফুলজান সোজা জিজ্ঞেস করে বসে।

—বিকেলে টাকা পাবি, এখন তুই যা।

—যাবই ত রে। এখানে আমি ঘর পাতবার লগে এসেছি নাকি— টাকাটা দে।

—বাবু অফিস থেকে ফিরলে টাকা দিবে, তখন তোরে দিয়ে আসবো গিয়ে।

—ঠিক দিস যেন, নইলে তোর সঙ্গে আমার কথা বন্ধ। যাবার সময় ফুলজান শাসিয়ে যায়।

দরজার কাছে এসে শফি বলে: এমন করে না বলে-কয়ে আর আসিস না. বাবু যদি বাড়ি থাকতো।

রাস্তার দিকে এক পা বাড়িয়ে ফুলজান বলে: বাবুরে তুই এত ডরাস কেন, আমায় দেখে বাবুর পছন্দও ত হয়ে যেতে পারে। আমার কদর তুই বুঝলি না এখনও!

কিছুক্ষণ শফি বোকার মত স্তব্ধ বদনে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ঘরে তালা বন্ধ করে দশ নম্বরের বড়বিবির কাছে চিঠিটা পৌঁছিয়ে দিতে যায়।

ফিরে এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে শফি ভাবে: যাক্ এবার বকশিস্ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া গেলো। আচ্ছা বাবু কত বকশিস্ দিবেন? এক টাকার কম ত নয়, টাকা দুইও দিতে পারেন। বাবুর দিলটা সত্যিই খুব বড়। আচ্ছা টাকা দুই বকশিস্ পেলে ফুলজানকে খুশি করবার জন্য তাকে একটা সিকি বেশিই দেওয়া যাবে। বাকি থাকে বারো আনা। তা থেকে একটা ভাল দেখে আয়না কিনতে হবে। তার আয়নাটা অনেকদিন ভেঙে গেছে, চেহারা দেখার অসুবিধা হয় বড়। আয়না কিনে যা বাকি থাকবে তার থেকে সে 'তাজমহল টকি হাউস'এ 'দিলকি ডাকু' ছবি দেখতে যাবে। ছবিটা নাকি খুব ভালো হয়েছে। ভাবতে ভাবতে শফির গলাটা শুকিয়ে যায়। বিড়ি খেতে এখন ভালো লাগছে না। বাবুর টিন থেকে কয়েকটা সিগ্রেট তুলে আনলে কেমন হয়? শেষ পর্যন্ত শফি লোভ সম্বরণ করতে না পেরে ৯৯৯ নং স্টেট এক্সপ্রেস টিন থেকে তিনটা সিগ্রেট তুলে আনে।

একটা সিগ্রেট ধরিয়ে বাবুর নাস্তা তৈরী করতে বসে শফি। আজকে নাস্তাটা খুব ভালো করা চাই। নাস্তা খেয়ে বাবুর মন যাতে আরও খুশি হয়। পরোটা শফি চিরকালই ভালো তৈরী করতে পারে, আজকে আবার সে বিশেষ যত্ন নিচ্ছে। পরোটা তৈরী করা হয়ে গেলে শফি উনোনে মাংস চড়িয়ে দেয়। তারপর প্লেটগুলো মাজতে বসে। যতক্ষণ না সেগুলো ঝকঝকে তকতকে হয়ে উঠলো ততক্ষণ অপরিসীম উৎসাহের সঙ্গে সে মেজেই গেলো।

অতর্কিতে এক সময় তার মনে পড়ে: আচ্ছা, বাবু যদি আজকে আমাকে বকশিস্ না দেন। পরক্ষণেই শফি তার মন থেকে সে চিন্তা ঝেড়ে ফেলে। এ সব ছাইপাঁশ সে কি ভাবছে। তার এত পরিশ্রম কিছুতেই ব্যর্থ যেতে পারে না।

তবে সিগ্রেট তিনটা এমন করে টিন থেকে না তুলে নিলেই হোত। দু'টো সিগ্রেট এখনও আছে তার কাছে, টিনে রেখে আসাই উচিত। সিগ্রেট দুটো হাতে নিয়ে শফি উঠতে যাচ্ছে এমন সময় বাইরে কড়া নাড়বার শব্দ। সিগ্রেট দু'টো তাড়াতাড়ি লুকিয়ে বাইরে এসে সে দরজা খুলে দেয়। মকবুল অফিস থেকে ফিরেছে। মুখটা তার খুব বেশি প্রফুল্ল মনে হচ্ছে না, হয়ত অফিস থেকে শ্রান্ত হয়ে ফিরে এসেছে বলেই এমন লাগছে। কিছু না বলে মকবুল নিজের কামরার অভিমুখে পা বাড়াল।

বাবুর্চিখানায় ফিরে গিয়ে শফি ট্রেতে মকবুলের নাস্তা ভাল করে সাজায়। রান্নাটা সত্যিই খুব ভালো হয়েছে। চমৎকার গন্ধ বেরুচ্ছে মাংসের 'কারী' থেকে, শফির নিজেরই খিদে পেয়ে যায়। হাসিমুখে শফি 'ট্রে' নিয়ে মকবুলের কামরায় যায়।

হাত মুখ ধুয়ে গম্ভীর মুখে মকবুল বসে আছে হাতল-দেওয়া চেয়ারে। টেবিলে যখন শফি ট্রো-টা রাখে মকবুল তখন নিজের নিস্তব্ধতা ভাঙে: চিঠিটা দিয়েছিস?

একগাল হেসে শফি বলে: হ্যাঁ, বাবু।

—কারে দিয়েছিস?

—কেন সেজবিবিকে।

—চিঠিটা তোকে কারে আমি দিতে বলেছিলাম?

হঠাৎ শফির প্রচণ্ড আকস্মিকতার সঙ্গে মনে পড়ে বাবু চিঠিটা সেজবিবিকে নয়, বড়বিবিকে দিতে বলেছিলেন। স্তম্ভিত বদনে শফি দাঁড়িয়ে থাকে।

অস্বাভাবিক শান্ত স্বরে মকবুল বলে: তোকে কাল থেকে আমার আর চাই না, অন্য জায়গায় চাকরি খোঁজ।

এতটা বিমূঢ় হয়েছে শফি যে একটা কথাও সে মুখে আনতে পারে না। আর শফি জানে, মকবুলের কথায় প্রতিবাদ করাও নিষ্ফল।

বিমর্ষ বদনে শফি রান্নাঘরে ফিরে যায়। ফুলজানের কথা এখন তার মনে পড়ছে না। বকশিসের কথাও নয়। এমন আরামের চাকরিটা তার সামান্য একটা ভুলের জন্য খসলো, এ দুঃখে তার প্রায় কান্না পায়। এখন কি করবে সে, কোথায় যাবে, ফুলজানকেও বা মুখ দেখাবে কেমন করে? চারদিকে শফি অন্ধকার দেখে। রান্নাঘরের যেখানে সে দু'টো সিগ্রেট লুকিয়ে রেখেছিলো সেদিকে তার দৃষ্টি পড়ে। সিগ্রেট দু'টার ওপর তার বিজাতীয় বিদ্বেষ হয়। এই সামান্য লোভ সামলাতে পারলো না বলেই ত তার এত বড় সৌভাগ্য-বিপর্যয়!

অসহায় ক্রোধে সিগ্রেট দুটো কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলে পায়ের তলায় দাবিয়ে সে উপরে বসে বসে চক্কোর খেতে থাকে। তেমন অবস্থায় ফুসজান যদি তাকে দেখতো তবে সে ভাবতো, একটাকা বকশিস পেয়ে শফি মিঞা মনের সুখে নাচতে বসেছে॥

পথ জানা নাই

আবুল কালাম শামসুদ্দীন

মাউলতলার গফুর আলী ওরফে গহুরালী প্রায় উন্মত্তের মতো একখানা কোদাল দিয়া গ্রামের একমাত্র সড়কটাকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিতেছিল।

তাহার এই মত্তজনোচিত কার্যের পশ্চাতে একটা ইতিহাস আছে; দীর্ঘ এক কাহিনীও বলিতে পারো তাহাকে। একটু সহানুভূতির সহিত সে ইতিহাস বিচার করিলে তাহার এ কার্যের একটা সমর্থনও হয়তো খুঁজিয়া পাওয়া যায়; নহিলে যে সড়ক একদা সকলেরই সমবেত চেষ্টায় গ্রামের উন্নতিকল্পে গড়িয়া উঠিয়াছিল, এমন কি গহুরালিও যাহার জন্য তাহার স্বল্প জমির বিরাট একটা অংশ ছাড়িয়া দিতে পারিয়াছিল, হঠাৎ তাহা ভাঙিয়া ফেলিবার জন্য সে-ই বা এমন উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিবে কেন?

এই গতযুদ্ধের পূর্বকাল পর্যন্ত পাকিস্তানের সুদূর দক্ষিণ অঞ্চলের যে গ্রামগুলি বহির্জগতের সহিত একপ্রকার সম্পর্ক-শূন্য থাকিয়াই সম্পূর্ণ মধ্যযুগীয় জীবনযাত্রা যাপন করিতেছিল, এই মাউলতলা গ্রামও তাহাদের একটি। বিরাট এই দেশের ইতিহাসে রাজ্যরাষ্ট্রের ভাঙা-গড়া বহুবার ঘটিয়াছে; সুদূর দিল্লী কিংবা ঢাকা-মুর্শিদাবাদের বাদশাহী তখ্‌তে কতো রাজশক্তির উত্থান-পতন ঘটিয়াছে—মগ, পর্তুগীজ, বর্গীর বন্যা কতোবার কতো স্থানে ঝড় তুলিয়া বহিয়া গেছে, কিন্তু মাউলতলার স্বকীয় জীবনযাত্রায় তাহা কিছুমাত্র আলোড়ন তুলিতে পারে নাই। ইংরেজ সভ্যতা সনাতন ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির মর্মমূল ধরিয়া নাড়া দিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু তবু এই যুদ্ধের পূর্বকাল পর্যন্ত মাউলতলা গ্রামে তাহার কোনো বিশেষ প্রভাব অনুভূত হয় নাই।

অন্তত এই সড়কটি নির্মিত হইবার পূর্ব পর্যন্তও মাউলতলা সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য লইয়াই বাঁচিয়া ছিল।

তখনকার মাউলতলার কথা এখন হয়তো নিছক কাহিনীর মতোই শোনাইবে তোমাদের কাছে। এখানকার মৃত্তিকা-সংলগ্ন জীবনগুলি তখন সংগ্রাম-শৌর্যে ভরপুর। বিরূপ প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহারা ক্ষেতে ক্ষেতে শস্য ফলাইত; ভোগের অধিকার লইয়া আদিম বীরত্ব সহকারে মধ্যযুগীয় অস্ত্রশস্ত্র

লইয়া লড়াই করিত, জোর করিয়া ধরিয়া-আনা মেয়েমানুষকে বিবাহ করিয়া ভালোবাসিত আর অবসর কালে গান কিংবা পালা বাঁধিয়া আনন্দ উৎসব করিত। বাহিরের জগতের সহিত কোনোরূপ যোগাযোগ এক প্রকার ছিল না বলিলেই চলে। জীবনযাত্রার একটা একান্ত নিজস্ব ও স্বয়ংসম্পূর্ণ রীতি ও, পদ্ধতি বর্তমান ছিল। বিংশ শতাব্দীর বণিক সভ্যতার কিছুমাত্র স্পর্শ তাহা ব্যাহত করে নাই!

কিন্তু ক্রমে করিল—

একদিন এই গ্রামেরই একজন পুরুষ তরুণ বয়সে ছিটকাইয়া বাহিরে গিয়া পড়িয়াছিল; ধরিতে পারো এখন হইতে সে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বেকার কথা। সে যখন আবার ফিরিয়া আসিল তখন সাথে করিয়া সে শুধু ধনসম্পদই আনিল না, আপাতদৃষ্টিতে উন্নততর আরেক জীবন-পদ্ধতি ও সভ্যতাও যেন সে তাহার চিন্তা কর্ম চরিত্রে বহন করিয়া আনিল। কৌতূহলী চিত্তে দীন মাউলতলা-বাসীরা সেদিন তাহার চারিদিকে আসিয়া ভিড় করিল।

সে কহিল—এই মাউলতলার বিল, খাল, ঐ বিশখালী, আড়িয়লখাঁরও ওপাশে, রাজার যে কাছারীতে সকলে বছরে একবার খাজনা দিতে যায়,—তাহারও দূরে আরেকটা দেশ আছে—শহর তাহার নাম,—সেই দেশের সহিত, সেই দেশের জীবনের সহিত পরিচিত না হইলে এই গণ্ডগ্রাম মাউলতলায় এমন হীনভাবে জীবন কাটাইবার কোনই অর্থ হয় না। মানুষ হইতে হইলে, ভালো ভাবে জীবন-ধারণ করিতে হইলে ঐসব শহর-বন্দরের সহিত যোগাযোগ একান্ত দরকার।

এবং সেক্ষেত্রে তাহার প্রস্তাব হইল, অবিলম্বে এই যোগাযোগের প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে একটা সড়ক নির্মাণ করিতে হইবে।

জোনাবালী হাওলাদার সেদিন এমন ইচ্ছাও প্রকাশ করিল যে, এখন হইতে তাহার স্বীয় জন্মভূমি মাউলতলার উন্নতি করাই তাহার জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় কর্তব্য বলিয়া মনে করিবে।

চেষ্টা চরিত্র করিয়া জেলা বোর্ডের দ্বারা সে এই সড়ক প্রস্তুতের বন্দোবস্তও করিয়া ফেলিল। মাউলতলার স্বল্প-সংখ্যক সঙ্গতিপন্ন যাহারা, তাহারা প্রচণ্ড উৎসাহে গ্রামোন্নয়নের তথা স্ব স্ব জীবনোন্নয়নের কাজে লাগিয়া গেল।

কিন্তু মুশকিল বাধাইল এই গহুরালির মতো দীন দরিদ্র প্রজারা। সড়ক প্রস্তুতের জন্য তাহাদের জমির যে অংশখানি মারা পড়িবে তাহা কিছুতেই ছাড়িয়া দিতে রাজি হইতেছিল না। গহুরালি বলিল: মোডে পাঁচকুড়া আমার ভুঁই, হের দুই কুড়া-ই সড়কে খাইলে আমি খামু কি?

জোনাবালি জবাব দিয়াছে: আরে মেয়া, কেবল ক্ষেতের ধান বেচইয়াই পয়সা হয় শেখছো এতোকাল। সড়কটা হইতে দেওনা, দেখবা উপায়ের আরো কতো রাস্তা খুলইয়া যায়। কইলাম যে, এ সড়কের কেবল সড়ক বলইয়াই ভাইব্যোনা, এ তারো চাইয়া বড় জিনিস। সব কথা তো বোঝবানা, তউ কই হোনো, এ রাস্তা নতুন জীবনেরো।

গহুরালি কী বুঝিয়াছে, প্রতিবাদের তীব্রতা কিছুটা কমিয়াছিল বইকী। একে জোনাবালির মতো ধনী মানী লোকের কথা; তাঁহার উপরে স্বপ্নের মতো সে দেশের বর্ণনা শুনিয়া তাহারও মন তখন এক অদ্ভুত সম্ভাবনায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। এই সড়কের কল্যাণে বাস্তবিকই যে জীবনের সম্মুখে এক নতুন পথ প্রসারিত হইয়া পড়িবেনা তাহা কে বলিতে পারে! জোনাবালির বাড়ি হইতে বাহির হইয়া তাহার যে জমিখানার উপর সড়ক যাইবার কথা, তাহার উপর আসিয়া দাঁড়াইল।

এখনও—এই অগ্রহায়ণের শেষেও প্রায় গোড়ালির উপর পর্যন্ত সেখানে কাদায় ডুবিয়া যায়। ধান পাকিতেছে, তাহার শীষগুলি নুইয়া পড়িয়াছে স্তবের মতো, অধিকাংশই লুটাইয়া পড়িয়াছে কাদার মধ্যে। মজা বিলের জমি—এমন হইবেই। কোনো বৎসরই লাভজনক ফসল এখান হইতে পাওয়া যায় না। পানি জমিয়াই প্রায় অর্ধেকেরও বেশি ফসল নষ্ট করিয়া ফেলে। তবু এ-দিনে ক্ষেত-খানার দিকে চাহিয়া তাহার মন ভরিয়া উঠিত এতোকাল; আজ কী জানি কেন মনটা খুব বিরস হইয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিল আর কাঁহাতক এইভাবে দুটি দুটি ধান খুঁটিয়া জীবন চালানো যায়। তাহার চেয়ে সম্মুখে যে নয়া জীবনের হাতছানি, তাহাকে বরণ করিয়াই দেখুক না এবার। জোনাবালির কথায় সুখ-সমৃদ্ধি, মানুষ হইয়া বাঁচিয়া থাকা, সবই নাকি তাহাদেরও জীবনে সম্ভব হইতে পারে। শুধু যে-আবহে, যে-রীতিতে জীবন চলিত এতকাল, তাহাকে পালটাইয়া নতুন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। দোষ কী, দেখুকই না একবার পরখ করিয়া। জোনাবালি, দশবৎসর পূর্বেও যাহার পিতা উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়া এক মুষ্টি অন্ন সংস্থান করিতে পারিত না, তাহারই পুত্র যখন আজ সেই জগতের কল্যাণে জীবনে অগাধ ধন-ঐশ্বর্য-সমৃদ্ধি আহরণ করিতে পরিয়াছে, তাহারাই বা কেন তাহাদের তাকৎ ও হিম্মত লইয়া ভাগ্য বদলাইতে পারিবে না?

বাড়ি ফিরিয়া স্ত্রীকে কহিল: ঠিক করলাম, রাস্তার লইগ্যা দিমু জমিটা ছাড়াইয়া।

বউটি অল্পবয়সী হইলেও বুদ্ধি নিতান্ত কম ছিল না, ভাত বাড়িয়া দিতে দিতে

হঠাৎ থামিয়া অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল কিছুকাল ; কহিল : তা হইলে থামু কী ?

—অতোশতো ভাবতে গেলে কী আর ছ্যাশের কাম হয় ? সকলেরই মঙ্গলের জন্য যে কাম তার লাইগ্যা সকলেরই কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করতেই হইবে। গহুরালি অবিকল জোনাবালির কথাগুলি স্ত্রীকে বেশ ভারিক্কিচালে শুনাইয়া দিল।

স্ত্রী তবু খুঁত খুঁত করিল : বুঝিনা ছ্যাশের দশের কাম কারে কয়—মৌলবী সাইবে তো কইয়া গেলেন বেশ আছি আমরা, রাস্তা-ফাস্তা বানাইয়া এম্নে-ওম্নে গেলে জীবনে আরো কষ্ট বাড়বে ছাড়া কমবে না। আরো কইলেন বোলে হগোল-ডিরে বাইর অওনইয়া স্বভাবে পাইছে, এয়া ভালো লক্ষণ না।

—থুইয়া দেও হের কথা। নতুন কোনো জিনিস করতে গেলে একদল মানুষ চাইর দিক দিয়া এরহম বাধা দেয়ই।

স্ত্রী তবু বলিল : না হয় বোঝলাম দশের উপগারের কাম। তউ ওয়া কী আমাগো করা সাজে, যগো খাইয়া পড়ইয়াও বাড়তি আছে হেরা করুক গিয়া। রাস্তা আমাগো অইলেই বা কী, না অইলেই বা কী।

গহুরালি কহিল : মাইয়া মানুষের বুদ্ধি তো! যে জিনিস নাই, হের লাইগ্যা তারই তো বেশি আহইট। যাগো আছে তাগো গরজ কী! সকলের মঙ্গল মাইনেই তো আমাগোও মঙ্গল।

পরে সে হাজেরাকে ক্ষেতের যে উঁচু-পাড়ে তাহাদের বাড়ি, তাহারই কিনারে ডাকিয়া লইয়া গেল। জোনাবালির নিকটে রাস্তার বর্ণনা সে যেমন যেমন শুনিয়াছে ঠিক সেইভাবেই তাহার নিকট বর্ণনা করিয়া গেল। আঙুল দিয়া দেখাইল শাদা মেঘের ভেলা ভাসানো নীল আকাশের নিচের রৌদ্র-ঝিলমিল দিগন্ত। সবুজ বনানীর সীমারেখায়, কাশবনের উদ্দাম ইশারায় সে দিগন্ত যেন কোন সুদূর স্বপ্ন-রাজ্যে হারাইয়া গিয়াছে।—আর মুখে সে আবৃত্তি করিল জোনাবালির সেই কথা কয়টি : এ কী কেবল সড়ক! একটা নতুন জীবনেরো রাস্তা। সুখের আর সমৃদ্ধির—

হাজেরা আর সে সেই সড়ককে কল্পনায় দূর হইতে দূর বিছাইয়া চলিল। পৃথিবী যতোখানি তাহাদের ধারণায় কুলায়, যেন তাহার শেষ সীমানা অবধি। এতোকাল আচরিত জীবনের প্রতি মনে মনে তখন বিদ্রোহ উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে ; উন্নততর জীবনের জন্য মনের গতি তখন বাধাবন্ধহারা। এই সড়ক তাহাদের সে কামনাকে পরিপূর্ণ করিতে পারিবে কিনা, তাহা বিচারের সাধ্য তাহাদের ছিল না, শুধু বিশ্বাসেই তাহারা উজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। গহুরালি

অপরূপ বর্ণনায় ভবিষ্যৎ জীবনের যে চিত্র হাজেরার সম্মুখে তুলিয়া ধরিল, সরলা গ্রাম্য তরুণী হাজেরা অর্ধবিশ্বাস অর্ধঅবিশ্বাসে তাহা দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। গহুরালির হাত স্পর্শ করিয়া বারংবার সে জিজ্ঞাসা করিল: সত্য? হাচইও?

—দেখবাই ভবিষ্যতে।

কিন্তু ভবিষ্যৎ কথাটির ব্যাপ্তি বড়ো বেশি। সময় সময় তার অন্ত প্রত্যক্ষ করিতেছি বলিয়া মনে হইলেও, কার্যকালে তাহার অন্ত খুঁজিয়া পাওয়া মুশকিল। গহুরালিও তাহার পরিমাপ করিতে পারিল না।

অবশেষে সমস্ত বাধাবিপত্তি ও প্রতিকূলতা কাটাইয়া সড়ক নির্মাণ শেষ হইল। জোনাবালি দুই দুইটা গোরু জবেহ করিয়া শ্রমিকদের আপ্যায়িত করিল। সে মেজবানে গ্রামেরও অধিকাংশ লোক শরিক হইল। রাত্রে বসিল পালাগানের আসর। এমন উৎসব এখানকার নিস্তরঙ্গ জীবন বড়ো বহুবার করে নাই।

পুরুষেরা একে একে প্রায় সকলেই একবার করিয়া শহর ঘুরিয়া আসিল। এবং সকলেই আসিল কিছু না কিছু সেই সভ্যজগতের চিহ্ন লইয়া। প্রথম উন্মাদনাটুকু কাটাইয়া লোকে অবশেষে সড়কের উপর গোরু বাঁধিত; ক্ষেতে কাজ করিতে করিতে তাহারই পাশে বসিয়া গল্প করিত; হুঁকা টানিত—আর তাহারই ফাঁকে ফাঁকে গ্রামের চার পাঁচটি যুবক ভাগ্যান্বেষণে বাহির হইয়া গেল।

গহুরালিও একদিন যে কয়টা পিরহান ছিল একে একে সব কয়টা পরিয়া মাথায় মুখে ভালো করিয়া তেল মাখিয়া প্রসাধন করিয়া একখানা তেল-চকচকে বাঁধানো লাঠি হাতে করিয়া তিনদিন ধরিয়া শহর বন্দর ঘুরিয়া দেখিয়া আসিল। জোনাবালির কথার চাক্ষুষ প্রমাণ মিলিল এবার। সত্যই তো, এখানকার মানুষেরা সত্যই অভিনব। সুখে ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ আরেক জাতের মানুষের সেখানে বাস। তাহাদের প্রতিটি চাল-চলন, কথা-বার্তা, জীবন-রীতি গহুরালির নিকট পরম লোভনীয় বলিয়া মনে হইল। কিন্তু তবু সব দেখিয়া শুনিয়া একটি দুঃখ বরাবরই তাহার মনে খচখচ করিয়া বিঁধিতে লাগিল—উহাদের যেন ধরা ছোঁয়া কিংবা নাগাল পাওয়া যাইতেছিল না। তাহার মতো দীন দরিদ্রের প্রতি কেহই লক্ষ্য দেয় না, দুইদণ্ড থামিয়া এখানে কেহই তো তাহার কুশলও জিজ্ঞাসা করে না। তাহাদের মাউলতলাতে অপরিচিতকেও সম্ভাষণের যে রীতি, তাহা এখানে নাই। এমন কী কেহ চোখ তুলিয়া তাকায়ও না, যদিও বা কেহ কখনো তাকাইয়াছে, গহুরালি বড়ো অস্বস্তি বোধ করিয়াছে সে দৃষ্টির সম্মুখে। সে দৃষ্টিতে মায়া নয়, মমতা নয়, আত্মীয়তার শুভ ইঙ্গিতও নয়, শুধু তাচ্ছিল্যমাখা বলিয়াই

বোধ হইয়াছে তাহার। কেবল রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল সে সন্ধ্যাকালে বাজারের পথ দিয়া যাইবার সময়, দুইধারে সারি সারি মেয়েরা—কেহ বিলোল চোখে তাহার দিকে তাকাইয়া ছিল, কেহ বা আহ্বানও করিয়াছিল হাতছানিতে, তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই একটি মেয়ের কী কথায় সকলে যখন হাসিয়া উঠিল। গহুরালি ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া আসিয়াছিল। ব্যাপারটা কী বুঝিতে পারে নাই। তবু একটি মেয়ের চোখের চাওয়াটুকু বড়ো ভালো লাগিয়াছিল।

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যাকালে সে আবার সেই পথে গেল। সেই মেয়েটি তখনো সেখানে দাঁড়াইয়া। গহুরালি তাহার নিকট দিয়া যাইবার সময় সে একটু মধুর করিয়া হাসিল। গহুরালির মাথার মধ্যে কেমন গোলমাল হইয়া গেল; হাঁ করিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত অর্ধচেতনের মত সে সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

মেয়েটি হাতছানি দিয়া তাহাকে কাছে ডাকিল: আয়েন।

গহুরালি সম্মোহিতের মতো তাহাকে অনুসরণ করিল।

মেয়েটি তাহাকে লইয়া গেল হোগলাপাতা আর চাঁচের বেড়া দিয়া বুনানো ছোট একটি ঘরে। একপাশে একটা বিছানা, অন্যদিকে ছোট একটা হ্যারিকেন। মেয়েটি আলোটা উস্কাইয়া দিয়া তাহার কাছে আসিয়া বসিল: নতুন আইছো গ্রাম থেইক্যা, না?

গহুরালি মাথা দোলাইল।

বেশ! তা, ট্যাঁক ভারি আছে তো? দশ টাকার কম কাম অইবোনা, কইলাম। দেহি কতো আছে,—বলিয়া মেয়েটি তাহার কোমরে হাত দিল। গহুরালি যেমন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, তেমনি ভয়ও পাইল। বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াও তাহার ছলনায় শেষ পর্যন্ত সে ভুলিয়া গেল।

পাঁচমিনিট পরেই গহুরালির প্রায় সবি আদায় করিয়া মেয়েটি তাহাকে উঠাইয়া দিল: আরো রইলে টাকা আরো দেওয়া লাগবে; এহোন যাও মিয়া।

প্রতিদানে গহুরালি কী পাইল, তাহা সে-ই জানে। তবু এই অনাত্মীয় দেশে আত্মীয়তা বলিয়া, সহৃদয়তা বলিয়া সে যাহা ভাবিয়াছিল, তাহা একেবারে চুরমার হইয়া ভাঙিয়া গেল।

মনে মনে গভীরভাবে সে উপলব্ধি করিল এখানে পয়সার মূল্যে সব জিনিসেরই যাচাই হয়। পয়সাই এখানকার জীবন নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। প্রাণের কোনো মূল্য ইহারা দেয় না। বড়ো একাকী আর নিঃসঙ্গ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল তাহার। তৃতীয় দিন সকালে একটা বিরূপ বিরস মন লইয়া সে গ্রামের পথ ধরিল।

তবু সারাপথ ভাবিয়া চিন্তিয়া সে এই পয়সার ভিত্তিতেই ভবিষ্যৎ জীবনকে গড়িয়া তুলিবার সংকল্প করিল। এবং পয়সা উপায়ের পথ খুঁজিতেই তখন হইতে তাহার ব্যস্ততা শুরু হইল। হতাশ হইয়া এপথে কিছু করা গেলনা বলিয়া অন্য চেষ্টার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ার মতো মুখ তো তাহার আর নাই। মনে মনে একটু দমিয়া পড়িলেও স্ত্রীর নিকট যে বাহাদুরী করিয়াছে একদিন—তাহারই জন্য সে হাল ছাড়িল না।

শুধু সে একাই নয়, আরো পাঁচজন মিলিয়া তরিতরকারী, মাছ যে যাহা জোটাইতে পারে, তাহা লইয়াই সে পথে আসা-যাওয়া করিতে লাগিল। এমন যে থানকুনি পাতা—যাহা এখানে বনেবাদাড়ে অজস্র জন্মায়, কেহ ফিরিয়াও দেখেনা, শহরে তাহাতেও পয়সা। এমনি করিয়া ধীরে ধীরে গ্রামের প্রতিটি বস্তু শহরের পথে নীত হইতে লাগিল। হাজেরা একদিন পরিহাস করিয়া কহিল: যা আরম্ভ করলা, শেষকালে আমাগোও না বাজারে লইয়া যাও!

গহুরালি তখন বেশ দুপয়সা উপার্জন করিতেছে। দেখিতে দেখিতে বছর তিনেকের মধ্যে খোড়োঘরের চাল ফেলিয়া সে টিনই তুলিয়া ফেলিল। যাহারা জোনাবালির কথায় সংশয় প্রকাশ করিয়াছিল, এবার তাহাদেরও চোখ খুলিল।

কিন্তু এইপথে শহরের ফৌজদারী দেওয়ানীতেও ছুটাছুটি শুরু হইল ধীমে ধীরে। শাদামাটা সকল জীবনে আসিতে লাগিল কূটবুদ্ধি আর কৌশলের দড়িজাল। এই সড়কের চারিদিকে প্রচুর গলি ঘুঁজিরও সৃষ্টি হইল। অনেক বাঁক অনেক মোড়। মাউলতলা জটিল হইয়া উঠিল। বুঝিবা তাহার প্রভাব পড়িল এখানকার লোকের মনেরও উপর।

এমন কী একদিন এই সড়কের উপরেই গোরুতে ধান খাওয়ার সামান্য বিষয় লইয়া দুইদলে লড়াই এবং একটা খুন পর্যন্ত হইয়া গেল।

জোনাবালি খবর পাইয়া ছুটিতে ছুটিতে যখন আসিয়া পৌছিল তখন খুন তো একটা হইয়া গিয়াছেই, আর তাহার এতো সাধের সড়কের একটা অংশও টিল তৈরির কাজে উড়িয়া গিয়াছে।

সকলকে ডাকিয়া কহিল: সড়ক কী এয়ার লাইগ্যা বানাইছেলাম আমরা? আকাটমূর্খ জানোয়ারের দল! জোনাবালির ভর্ৎসনায় কাহারও মুখে কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। থানা, মামলা-আদালত লইয়াই তখন তাহাদের চিন্তা।

ইতিমধ্যে যুদ্ধ লাগিল।

তাহার ঢেউ এ পথ বাহিয়া এবার আসিল এখানেও। এ দেশের ইতিহাসে তাহা এই প্রথম; রাজ্য-স্বার্থ লইয়া ভাঙাগড়ায় এইসব গ্রামের কোন পরিবর্তন

ঘটে নাই কোনো দিন, কিন্তু অতীতের শত শত বৎসরে যাহা ঘটে নাই, দুই শত বৎসরের ইংরেজ-শাসনের ফলে এবার এখানে তাহাই আত্মপ্রকাশ করিল।

চাল-ডালের দাম বাড়িল। দাম চড়িল সব জিনিসের, কমিল কেবল জীবনের। ধীরে ধীরে এই সড়ক বাহিয়াই আসিল মন্বন্তর। আসিল রোগ-ব্যাধি, চোরাবাজার আর দুর্নীতির উত্তাল জোয়ার। তাহার সম্মুখে যতোটুকু নিরুদ্বিগ্নতা ছিল, কোথায় ভাসিয়া গেল।

সুশাসনে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারী আসে এই পথ বাহিয়া, আবার ঘুষ পকেটে লইয়া ফিরিয়া যায়। শহরের সাহেবের বাবুর্চিখানায় কাজ করে যে লুৎফর, তাহার সহিত আসগরউল্লার সোমত্ত কন্যা কুলসুম উধাও হইয়া যায়। লড়াই ফেরত ইউসুফের স্ত্রী কঠিন স্ত্রীরোগে হাত-পা-মুখে ঘা লইয়া শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে। আর আসে তরী-তরকারী, কাঠ, মুরগী—হানোত্যানো নানা জিনিস কিনিতে মিলিটারীর দালাল।

ঘটনাচক্রে তাহাদের একজনের সহিত গহুরালির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গেল। তখন মন্বন্তরের কাল। গহুরালির নিদারুণ কষ্ট। ভাবিল, তাহাকে ধরিয়া যদি তাহার কোনো একটা উপায় মিলিয়া যায়!

কিন্তু উপায় হইল না কিছুই; কেবল একদিন সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া গহুরালি হাজেরাকে খুঁজিয়া পাইল না।

আর সে দালালেরও আর দেখা মিলিল না। খুঁজিতে খুঁজিতে প্রায় মাইল সাতেক দূরে একজন চাষীর কাছে সংবাদ পাওয়া গেল, হ্যাঁ, খুব বিহানবেলা এই পথ বাহিয়াই একটি মেয়েমানুষকে একজন পুরুষের সঙ্গে সে যাইতে দেখিয়াছে বটে।

মন্বন্তরে গহুরালি নিঃস্ব হইয়াছিল বাহিরে, এবারে হইল অন্তরে। নিঃঝুম হইয়া দুটি দিন সে বাড়িতে পড়িয়া রহিল। মনের আবেগ, ক্ষোভ, দুঃখ, অনুতাপ কিংবা রাগ কোনো ভাষা পাইল না, রূপ পাইল না; কেবল এক সময় ক্ষিপ্তের মতো একখানা কোদাল হাতে লইয়া সে নিজের যে-জমিখানার উপর দিয়া সড়কটা গিয়াছে, সেদিকে ছুটিয়া গেল। গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গেল স্ত্রীর শোকে গহুরালি পাগল হইয়া গিয়াছে। শুনিয়া সকলে তাহাকে দেখিতে আসিল।

গহুরালি তখন উন্মাদের মতো অবিশ্রান্তভাবে সড়কটাকে কোপাইতেছে। তাহার সব দুর্দশার মূল যেন ঐ সড়ক, এই ভাবেই সে তাহাকে ভাঙিয়া মাটিতে মিশাইয়া ফেলিবার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। একার চেষ্টাতে সে পারিবে কী না তাহা একবারও তাহার মনে হইল না।

সকলে প্রশ্ন করিল : আহাহা, এ করো কী গহুরালি ?

—ভাঙতে আছি। হাত না থামাইয়াই, চোখ তুলিয়া না চাহিয়াই গহুরালি জবাব দিল।

—ক্যান ?

—ভুল, ভুল, অইছিলো এ রাস্তা বানাইন্যার। আমরা যে রাস্তা চাইছেলাম হেয়া এ না ;—ঠিক অয় নাই। কোদাল চালাইবার ফাঁকে ফাঁকে গহুরালি যেন আত্মগতভাবেই কথাগুলি বলিয়া গেল।

সকলের ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে ঠিক হইত কী হইলে, কিন্তু গহুরালি দূরের কথা, তাহারা নিজেরাও কী তাহা জানিত! অন্য কোনো নয়া সড়কের স্বপ্ন তো তাহাদের মনে কেহ জাগায় নাই!

নেতা

আবু জাফর শামসুদ্দীন

যে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল তাহার ছিল বক্তার দৈন্য। কাজেই দুই চারিটা বক্তৃতা দিতেই আমি একটি ক্ষুদে নেতা বনিয়া গেলাম।

কি যে বক্তৃতা দিয়াছিলাম বা দিতাম তাহা আজ আর মনে নাই ; কিন্তু এ-কথা বেশ ভালো করিয়াই মনে আছে যে, বক্তৃতা শেষে যখন মঞ্চ হইতে নামিতাম তখন চারিদিক হইতে স্ত্রী-পুরুষের ঘন-করতালি-ধ্বনি আমার কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিত এবং সেখানে সুধা বর্ষণ করিত। আমার ক্ষমতায় আমিই চমৎকৃত হইয়া যাইতাম।

প্রথম জীবনেই কেন যে এ-শক্তির পরীক্ষা দিতে বাহির হই নাই, সেজন্য আফশোস হইত। নিজেকে ধিক্কারও দিতাম, লোক-চক্ষুর অন্তরালে লুকাইয়া থাকিয়া একমাত্র উদরের ক্ষুধা নিবৃত্তির কাজে যদি এতদিন মশ্‌গুল না থাকিতাম তবে আমার নামও যে বহু পূর্বেই নিখিল ভারতীয় নেতাদের নামের সঙ্গে ছাপার হরফে মুদ্রিত হইত সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। বিশেষ করিয়া যদি পুরাতন কোন রাজনৈতিক দলে যোগ দিতাম তবে ত আর কথাই ছিল না। চাই কি উজীব-নাজীরও হইয়া যাইতে পারিতাম।

পার্টি সিটিংএ যখন বক্তৃতা করিতাম তখন স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকটি সভ্য টুঁ শব্দটি না করিয়া শুনিত।

লক্ষ্য করিয়া দেখিতাম আমাদের বন্ধু দেবকীর ভগ্নী শ্রীমতী তারা আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত। সে চাহনিতে কি ভাষা ছিল তাহা আমি বক্তা, কবি নই, কি করিয়া বুঝিব! তবে এ পর্যন্ত বুঝিতাম যে, সে চাহনিতে অর্থ একটা ছিল নিশ্চয়ই। সে চাহনিতে শ্রদ্ধা, ভক্তি, এমন কি প্রেমও থাকিতে পারে এরূপ সন্দেহও আমার মাঝে মাঝে হইত।

জীবনে আর কখনও নারীর প্রেম পাই নাই। সে যে কি সুধা দেহে বর্ষণ করে সে অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। কিন্তু জীব-জগতে স্বাভাবিক কারণে নারীজাতি সম্বন্ধে আগ্রহ ও ঔৎসুক্য ছিল প্রচুর।

লোভও যে না ছিল তাহা নয়।

শ্রীমতী তারার দিকে, কাজেই, ঝুঁকিয়া পড়িলাম। ছুতা-নাতায় তাহার সহিত কথা কহিতে ভালোবাসিতাম।

সে কিন্তু আমাকে বেশ একটু সমীহ করিয়াই কথা কহিত। সবে মাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছিল সে; কাজেই আমার মতো একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সঙ্গে মেলা-মেশা করিবার সময় সমীহ করিয়া চলিবে বইকি!

কিন্তু তবু কি করিয়া যেন একটা অন্তরঙ্গতা আমাদের মধ্যে স্থাপিত হইতে লাগিল। ইহাকে উপলক্ষ করিয়া দেবকীর সহিত আমি পূর্বের চাইতেও বেশি করিয়া মিশিতে লাগিলাম।

দেবকী ছিল একজন নামজাদা রাজনৈতিক কর্মী। সে-যুগের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সঙ্গে নাকি তাহার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। সমগ্র বাংলা দেশে তাহার নামের খ্যাতি ছিল।

আমার সঙ্গে যখন তাহার আলাপ হয় তখন সে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ও নীতির প্রতি আস্থা সম্পূর্ণ হারাইয়াছে। সর্বসাধারণের সহযোগিতা, সমর্থন ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ ব্যতিরেকে যে আদর্শ-স্থলে পৌছা অসম্ভব এই সত্য সে ঠেকিয়া শিখিয়াছিল।

এই সত্য উপলব্ধি করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে গ্রামে গ্রামে পার্টির জন্য জন-সমর্থন সৃষ্টি করিয়া বেড়াইতেছিল। পায়ে হাঁটিয়া প্রতিদিন সে মাইলের পর মাইল গ্রামের ধূলিকীর্ণ ও কর্দমাক্ত পথ অতিক্রম করিয়া চলিত।

পঞ্চাশের মন্বন্তর তখন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

সে সময়ে রাজনীতির কথা, ফ্যাসীবাদী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে জনগণের এক হইয়া লড়িবার কথা পরিহাসের মতো শুনাইত। তবু দেবকীর বিশ্রাম ছিল না।

জীর্ণ-শীর্ণ দেহ গ্রাম্য জনসাধারণের কাছে সে রাজনীতির কথা বলিয়া বেড়াইত এবং মাঝে মাঝে বাজারে বন্দরে সভা-সমিতিও করিত।

এমনি এক সভায় বক্তৃতা দিবার জন্য সে আমায় আমন্ত্রণ জানাইল। বলিল: তারাও যাবে। তারও রাজনীতির প্রতি বেশ ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। সে-ও নাকি বক্তৃতা দেবে। তোমারও যেতে হবে ভাই।

তারা যাবে শুনে আমার অন্তর খুশিতে বাগবাগ হইয়া উঠিল। সুদূর গ্রামে সভা হইবে; সেদিন আর শহরে ফিরিতে পারিব না, কাজেই তারার সঙ্গে বহুক্ষণ অবাধে মিশিবার সুযোগ অবশ্যই যে পাইব তাহাতে কোন সন্দেহ ছিল না। এরূপ সুবর্ণ সুযোগ ত্যাগ করিলে আর পাওয়া না যাইবারই কথা।

কাজেই যাইব যে তাহা বলার সঙ্গে সঙ্গেই স্থির করিয়া ফেলিলাম।

কিন্তু তবু একটু দর বৃদ্ধি করা দরকার। কাজেই ধরা দিবার পূর্বে একটু ছলনা করিতে মনস্থ করিলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম: সে কতদূর?

—তা' বেশ দূর ভাই। 'বাসে' যেতে হবে। প্রায় মাইল তিরিশেক হবে।

—রাত্রে থাকবো কোথা?

—সেজন্যে তোমার ভাবতে হবে না। বেশ সম্পন্ন একটি জেলে পরিবার আছে। ওদের বাড়িতেই থাকবো, সে কথা বলে এসেছি।

—লোক-টোক হবেত? না কি দু'একশ লোকের সামনে বক্তৃতাবাজি করে গলা ফাটাতে হবে?

—আশা ত করছি খুব লোক হবে। হাটে বাজারে ঢোল-শহরত দিয়ে সভার কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তা' ছাড়া খাদ্য-সমস্যার কথা আলোচনা করা হবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কি না, কাজেই লোক না হয়ে পারে না।

একে তারাকে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার জন্য সঙ্গে পাইবার নিশ্চয়তা, তার উপর আবার বড় জমায়েত হওয়া সম্বন্ধে দেবকীর আশ্বাস—কাজেই আমার আগ্রহ কেবলই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

বলিলাম: এত ক'রে যখন বল্‌ছ না হয় যাওয়া যাবে।

—যেতেই হবে কিন্তু। বলিয়া দেবকী সেদিনের মতো বিদায় গ্রহণ করিল।

পরদিন সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সারিয়া বেলা এগারোটায় গড়িয়াহাটা রোডের মোড়ে উপস্থিত হইলাম।

সেখানে গিয়া দেখিলাম দেবকীর ডান-পাশে তারাও দাঁড়াইয়া আছে। শাদাসিদে পোশাকে তারাকে বেশ মানাইতেছিল।

আমাকে দেখিতেই দেবকী প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। বলিল: এসো ভাই এসো—বাস্ ছাড়বার আর মোটে পাঁচ মিনিট বাকি।

আমি কিছু না বলিয়া তারার ডান পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম: সামাজিক বিধি-নিষেধের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ভাঙিয়া কোনদিন কি তারাকে সর্বদার সঙ্গিনী হিসাবে পাইব?

একটু পরেই 'বাস্' আমাদের লইয়া দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল।

* * *

পশ্চিম বাঙলার গণ্ডগ্রামের হাট। যেমন জীর্ণ তার চেহারা তেমনি শীর্ণ তার অবয়ব। গুটিকয়েক ক্ষুদ্রাকৃতির দোচালা ঘর আভরণহীন বিধবা রমণীদের

মতো মাঝখানে দাঁড়াইয়া ছিল। বেড়ার বালাই কোন ঘরেই ছিল না। গোলদার দোকানের মধ্যে একটিমাত্র মুদীখানা ছিল।

আঁকা-বাঁকা ক্ষেতের আইল পথে বাস-স্টেশন হইতে প্রায় তিন মাইল হাঁটিয়া আমরা যখন সেখানে উপস্থিত হইলাম তখন প্রায় পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। সভায় লোক সমাগম শুরু হইয়া গিয়াছিল।

* * *

বক্তৃতা করিতে উঠিয়াছি। দেশী বিদেশী রাজনীতি সম্বন্ধে জোর গলায় বলিতেছি আর যখন-তখন ফ্যাসীবাদী শক্তি-সমূহের মুণ্ডুপাত করিতেছি। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের জুলুমের সম্বন্ধেও অবশ্য বলিতে হইতেছে। মাঝে মাঝে করতালিও যে না পাইতেছি এমন নয়।

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। সূর্য ডুবিতেছে। একটু একটু করিয়া অন্ধকার হইয়া আসিতেছে।

এমন সময় আমার দৃষ্টি-পথে এক অদ্ভুত দৃশ্য রেখাপাত করিল। মঞ্চের উপর হইতে বক্তৃতা করিতেছিলাম বলিয়া দৃষ্টি বহুদূরেও যাইতেছিল।

দেখিলাম প্রায় অর্ধ মাইল দূরে দীর্ঘ এক সারি মানুষ দেখা যাইতেছে। আর একটু অগ্রসর হইতেই পরিষ্কার বুঝা গেল উহারা স্ত্রীলোক এবং এদিকেই আসিতেছে। ক্রমে সেই কাফেলা আরও নিকটবর্তী হইতে লাগিল। মনুষ্য-দেহগুলি ক্রমেই স্পষ্ট হইতে লাগিল।

ধূলিমলিন শতছিন্ন চীরে আবৃত জীর্ণ-শীর্ণ দেহগুলি সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া অগ্রসর হইতেছিল। বাতাস উল্টাদিকে বহিতেছিল। সে বাতাসের বেগ তাহারা সামলাইতে পারিতেছিল না। কাজেই দেহ কুব্জ হইতে কুব্জতর হইতেছিল। কাহারও কাহারও মস্তক যেন সম্মুখে মাটির সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছিল। দীর্ঘদিনের তৈলবিবর্জিত ধূলি-বালি মিশ্রিত কেশে জটা লাগিয়া গিয়াছিল। বিলম্বিত সেই কেশের উপরে কাপড় ছিল না। প্রবল হাওয়া গুচ্ছ গুচ্ছ সেই কেশ ছিন্নপত্রের মতো এদিকে-ওদিকে উড়াইতেছিল। জীর্ণ-বাসের আঁচল দেহের একদিকে উড়িতেছিল। কালো তাম্রবর্ণ দেহগুলিতে হাড় ছাড়া আর কিছুই দেখা যাইতেছিল না। উদর পিঠের সঙ্গে মিলাইয়া গিয়াছিল। সুধার আঁধার স্তন্যদ্বয় শুকাইয়া চামচিকের মতো হইয়া হইয়া জামার ছেঁড়া পকেটের মতো তাহাদের বুকে ঝুলিতেছিল। কাহারও বক্ষে, কোলে বা কাঁধে শিশুও দেখা যাইতেছিল।

তাহারা তবু অগ্রসর হইতেছিল। মনে হইতেছিল যেন একদল সরীসৃপ

আঁকা বাঁকা হইয়া হামাগুড়ি দিয়া অগ্রসর হইতেছিল। চোখে মুখে তাহাদের হিংস্র ক্ষুধা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। যেন বৈশাখের মেঘ উত্তরের দেশ হইতে কালবৈশাখীর রূপে পৃথিবীকে গ্রাস করিবার জন্য বিপুলবেগে অগ্রসর হইতেছিল। যেন ছোট, বড়, মাঝারী, সকল প্রকার হিংস্র কালো, বিকট কালো, তামাটে কালো, শাদা শাদা কালো, ধূমকেতুর রঙে রঞ্জিত, ভিন্ন জগতের সূর্যালোকে ঈষৎ আভাপ্রাপ্ত ভীতি-জনক কালো মেঘরাজি টুকরা টুকরা হইয়া বা সারি বাঁধিয়া সমগ্র জগতকে গ্রাস করিয়া সারা বৎসরের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিল।

তাহারা অগ্রসর হইতেছিল। মনে হইল যেন তাহাদের দীর্ঘ বাহুগুলি দেহের অবশিষ্টাংশ হইতে আলগা কেবলমাত্র সামান্য একটা উপলক্ষের উপর ঝুলিতেছিল। মহা-মহীরুহের শাখা কাটিয়া দিলে কেবলমাত্র বাকলটা যেমন ঝুলিতে থাকে তেমনি ঝুলিতেছিল। মিউজিয়ামে মানুষের কঙ্কালের বাহু যেমন ঝুলিয়া থাকে তেমনি ঝুলিতেছিল। আঙুলগুলিকে দীর্ঘ এক একটা পেরেকের মতো মনে হইতেছিল। চক্ষুদ্বয় কোটর প্রবিষ্ট হইয়া ভীষণাকৃতি কোন সরীসৃপের রক্ত-চক্ষুর বর্ণ ধারণ করিয়াছিল। কুম্ভীরের দন্তরাজির মতো তাঁহাদের দন্তরাজিও চোয়াল ছেদিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল।

মনে হইতেছিল এ যেন ইয়াজুজ-মাজুজের কাফেলা, পাহাড়-পর্বত তাহাদের ধারাল জিহ্বায় চাটিয়া খাইয়াও ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে পারে নাই, কাজেই আজ খোলা বিশ্বে বাহির হইয়া পড়িয়াছে: বৃক্ষ-লতা-পাতা, পশুপক্ষী, মানুষ, সাগর-জল, এক কথায় স্থল-জল-অন্তরীক্ষের যাবতীয় পদার্থ ভক্ষণ করিয়া তবে ইহাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবে। ক্ষুব্ধ সাগর হইতে উত্থিত বন্যা যেমন সম্মুখের সব কিছু উদরস্থ করিয়া কেবলই অগ্রসর হয়, ইহারাও তেমনি পথে যাহা কিছু পড়ে সবই উদরস্থ করিতে করিতে অগ্রসর হইবে, দয়া থাকিবে না, মায়া থাকিবে না, হিংসা থাকিবে না, দ্বেষ থাকিবে না, চিন্তাশক্তি থাকিবে না, মনুষ্যত্বের কিছুই থাকিবে না, ক্ষুধার তাণ্ডব নৃত্যে মাতিয়া উঠিয়া ইহারা সমগ্র জগতকে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে হিমরক্ত পশুর নির্বিকার ঔদাস্যে উদরস্থ করিবে,—দেওয়ালের টিকটিকি যেমন মক্ষিকাগুলিকে নির্বিকারভাবে উদরস্থ করে, ঠিক তেমনি নির্ভাবনায় উদরস্থ করিবে। এই বিপুল উদগ্র ক্ষুধার হাত হইতে তোমার, আমার, কাহারও নিস্তার নাই।

বক্তৃতা কখন যে আপনি থামিয়া গিয়াছিল তাহা বলিতে পারিব না; তবু মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া সম্মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিলাম। শরীরের প্রত্যেকটি

লোম কাঁটা দিয়া খাড়া হইয়া উঠিয়াছিল। যেন একটা শক্তিশালী চুম্বক আমাকে মঞ্চের উপর আটক করিয়া রাখিয়াছিল।

সর্প-বিশেষের দৃষ্টির সম্মুখে তাহার শিকার যেমন নিশ্চল হইয়া থাকে এবং ধীরে ধীরে আপনি ভক্ষকের উদরে প্রবেশ করে, আমিও ঠিক তেমনি দ্রুত আগমনশীল ঐ মনুষ্যরূপ সরীসৃপ বাহিনীর উদরে প্রবিষ্ট হইবার জন্ম যেন অপেক্ষা করিতেছিলাম।

তাহারা আরও নিকটবর্তী হইল। ক্রমে তাহারা সভার একান্ত নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। কতকগুলি নরকঙ্কালের মাংসহীন বাহু যেন আপনি সম্মুখে প্রসারিত হইল। ঐ প্রসারিত বাহুর সম্মুখে যাহা পাইবে তাহাই মুষ্টিবদ্ধ করিতে চাহিতেছিল,—যেন বিপুলাকার গলদাচিংড়ি তাহার দীর্ঘ হাতের নখর ফাঁক করিয়া শিকার ধরিয়া মুখে দিতে উদ্যত। মনে হইল কোন জাদুশক্তিবলে যেন কতকগুলি নরকঙ্কাল জীবন পাইয়াছে এবং মনুষ্যসভ্যতাকে গ্রাস করিবার জন্ম এইখানে সমবেত হইয়াছে।

হঠাৎ এই দানোয় পাওয়া নরকঙ্কালগুলি একযোগে "খারাক" করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল: অন্ন চাই! চাল চাই! ধান চাই! মনে হইল যেন একটা প্রকাণ্ড বাঁশের ঝাড়ের সবগুলি বাঁশ একযোগে একটা বিকট "খারাক" শব্দ করিয়া চিরিতে আরম্ভ করিয়াছে।

এই বিকট শব্দে আমার চুম্বকের মোহ টুটিয়া গেল। এক বিকট চিৎকার করিয়া সভামঞ্চ হইতে লাফাইয়া পড়িলাম এবং ঊর্ধ্বশ্বাসে জেলাবোর্ডের লাল কাঁকর দেওয়া রাস্তা ধরিয়া ছুটিতে লাগিলাম। মনে হইল এই দৌড়ের কৃতকার্যতার উপরই আমার জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে, পিছু ফিরিয়া চাহিতেও সাহস হইল না, কেবল যেন শুনিতে লাগিলাম: অন্ন চাই, চাল চাই, ধানের গোলা চাই, ধান চাই। সে শব্দ কানের পর্দা ভেদ করিয়া আমার বুকে যেন হাতুড়ি পিটিতে লাগিল।

আরও আরও ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিলাম। আর আর লোকের কথা তখন ভুলিয়া গেলাম, নিজের প্রাণ কি করিয়া বাঁচানো যায় কেবল সেই কথাই ভাবিতে ভাবিতে ছুটিলাম। আমি নেতা, আমি বক্তা, আমাকে ইহারা গ্রাস করিবেই। মনে হইল কঙ্কালগুলি যেন তাহাদের সেই বিকট শব্দ করিতে করিতে আমাকে ধাওয়া করিয়াছে।

আরও আরও ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিলাম। আমি নেতা, আমাকে বাঁচিতেই হইবে। আমার ভবিষ্যৎ আছে। দানোয় পাওয়া কঙ্কালসার দেহগুলি অত্যল্পকাল মধ্যেই

মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইবে। তাহার পরেই আবার আমার সুদিন আসিবে। কাজেই আমাকে আজিকার মতো ইহাদের আক্রমণ হইতে বাঁচিতেই হইবে। বাঁচিতেই হইবে—প্রতিজ্ঞা করিয়া কেবলই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে লাগিলাম।

কিন্তু দুর্ভাগ্য এই, আজ পর্যন্ত সেই ছুটার নিবৃত্তি হইল না॥

মামলা

সরদার জয়েনউদ্দীন

এ বছর যেমন ফসলের আগাম সমারোহ দেখা যাচ্ছে তাতে আর কাঁচি ধুয়ে ডাঙায় উঠতে হবে না। ক্ষেতের আলের ধারে দাঁড়িয়ে থকথকে সবুজ কচি ধানগাছগুলোর দিকে তাকিয়ে এ কথাই মনে হলো বশারতের। আর তাও যদি হয়, গেলো দুই বছরের মত যদি রাক্ষুষে বান-বর্ষা এসে সব ডুবিয়ে দেয়, তাহলেও তো একখানা নৌকার দরকার। এ তল্লাট ডোবা দেশ। বর্ষার পানি ঢোকার সাথে সাথে নৌকা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। গামছা পরে মাথায় বোঝা নিয়ে গলা-বুক পানি ভেঙে হাট-বাজার করতে হয়, নয়তো পরের নৌকার কাছে গিয়ে দু-ঠ্যাং ভেঙে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। দু'টো ভালো মন্দ শোন, তবে নৌকায় চড়। আর এমন তেমন হলো তো পায়েই লগি লাগাও। তাই বশারত ভাবলো, এবার যে করেই হোক একখানা নাও তার কিনতেই হবে। কিন্তু টাকা! কমসে কম ষাট সত্তুর না হলে বারো-তেরো হাত একখানা আকাঠের নাও-ও পাওয়া যায় না। টাকার প্রশ্ন আসতেই চোখ এদিক ওদিক থেকে ঘুরে এসে যেখানে গিয়ে থামলো, সেখানে একটি শ্যামলা রঙের দামড়া বাছুর চপচপ ক'রে দূর্বা ঘাস কামড়ে খাচ্ছিল। এখনো কামাই দিতে আরো পুরো এক-দেড়টি বছর। তা'ছাড়া বর্ষা গেলোবারের মত বন্যা হয়ে এলে ওকে বাঁচানোও কঠিন। দু-হাতে গোছর দেওয়া দড়ির খুঁটি টেনে তুলতে তুলতে বশারত ভাবলো, এই গরুটাকেই ছাড়িয়ে দেবে সে, আর ঐ টাকা দিয়েই একখানা নাও কিনে আনবে। বর্ষা যদি তেমন হয়, তাহলে এক বর্ষা নাও চালিয়ে খেয়ে পরেও অমনধারা একটা গরু সে কিনতেই পারবে।

(কথা কাউকে কিছু বললে, তার দাম থাকে না। নানা মুখে নানা রঙ্গ নেয়। নানান জনে অহেতু নানা পরামর্শ দিয়ে নিজের বুদ্ধিই গুলিয়ে দেয়।) সব ভেবে বশারত মনের কথা কয়েকদিন চেপে রাখলো, তারপর একদিন সকালে উঠে বউকে বললো: ছাদুর মা, দু'টো ডালে চালে মিশিয়ে খিচুড়ি ক'রে দেও, আমি কাশিনাথপুরের হাটে যাব।

ছানুর মা জানে এক গরু কেনা-বেচা ছাড়া সেই একদিনের পথ কাশিনাথপুরের হাটে কেউ যায় না। তাই সে চমকে উঠে বশারতের মনের উদ্দেশ্যটা জানতে চাইলো: কাশিনাথপুর? সে হাটে ক্যান?

বশারত বলতে চেয়েছিল, মেয়েমানুষের এত খবর নিয়ে দরকার কি। অন্য ব্যাপার হলে হয়তো তাই-ই বলতো! কিন্তু এই গরুটা বিক্রীর ব্যাপারে সে এত কঠোর হতে পারলো না। কেননা গরুটা পালন করতে যত্ন-আত্তি করতে ছানুর মায়ের গতরটাও কম খাটেনি। তাই সে ধীরস্বরে নির্বিবাদে বললো: গরুটা বেচে দেব।

: ক্যান, তোমার ঘাড়ের 'পর রইচে নাকি, তুমি ওর ঘাস-পানি দিচ্ছ, যে বেচতে চাও? বলতে বলতে ছানুর মা কাঠা হাতে চাউল মাপতে এগিয়ে গেল।

বশারত বললো: বর্ষায় চলা-ফেরা যায় না; তাই একখানা নাও কিনতি চাই। নাও কিনতি যে টাকার দরকার তা কহান থে পাব। এটা ছাড়া আর উপেয় নাই।

ছানুর মা একটু অভিমানের স্বরে বললো: না আমি চাই না, আমার বাছুর তুমি বেচতি পারবা না। যে কষ্টের বাছুর আমার! নাও দিয়ে আমি কি করবো, নায়ারে যাব নাকি যে বান-বর্ষায় নাও লাগবি আমার?

মুখের কথা শেষ না হতেই বশারত ধমক দিয়ে উঠলো: মেয়েমানুষ তুই, কাজের ধারা বুঝিস্ কি? যা অত প্যান প্যান করিস্ না।

সত্যিই তো সংসারে অনেক কাজ আছে যা মেয়েমানুষ অত ভালো বোঝে না। এ কথা ভেবে ছানুর মা চুপ করে রইলো। কিন্তু এই গরুটা আছে, যাকে ছেলে-পেলের মত কত যত্ন-আত্তি ক'রে ছানুর মা পালন করে, সেটা আর আজ থেকে থাকবে না! ঐ জায়গাটা শূন্য পড়ে থাকবে, বেদনায় খাঁ খাঁ করবে ছানুর মার পরাণটা। একথা ভেবে মনটা কেবল তড়পাচ্ছিল। তবুও থালায় খিচুড়ি বেড়ে দিয়ে ছানুর ঝিনুকে ক'রে একটু তেল নিয়ে গরুটার শিং দু'টোতে বেশ করে মাখিয়ে দিয়ে এলো। তেল মাখিয়ে ফিরবার সময় গরুটার চোখ-মুখের দিকে এক নজর চেয়েছিল ছানুর মা। আহা. এত যত্নের গরুটা, এতটুকু ভাবতেই তার চোখ বেয়ে পানি এলো। ছানুর মা আর ওখানে দাঁড়াতে পারলো না, এক মত ছুটে চলে যাবার মত ক'রেই পালিয়ে গেল। তারপর বশারত যখন গরুটার দড়ি খুলে টেনে নিয়ে গেল, ছানুর মা ওদিকে গেলই না। কিন্তু পারবে কেন? কিছুক্ষণ পর ছানুর মা

বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে দেখলো, বশারত মাঠের পথ দিয়ে গরুটাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে দ্রুত চলার তাগিদে লেজ মুচড়িয়ে দিচ্ছে, কিন্তু গরুটার চলায় যেন কত আপত্তি। যতক্ষণ না বশারত গরুটাকে নিয়ে মাঠ পেরিয়ে ওপাশের গাঁয়ের বেত-বনের পথে হারিয়ে গেল, ততক্ষণ ছানুর মা সেখানে দাঁড়িয়ে এক ধেয়ানে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো। তারপর এক সময় একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আল্লার নাম নিল।

আবাদ প্রায় সব জায়গায়ই এ সময় শেষ হয়ে গেছে। তাই বাজারে গরুর আর তেমন চড়া দাম নেই। লাঙলে জোত না থাকলে কেউ জিজ্ঞাসাই করে না। বশারত বলছিল, এই মাত্তর দেড় বছর বয়স, এখনো দাঁত শেষ হয় নাই, বড় হলে গলাতক উঁচু হবে। পশ্চিমা ষাঁড়ের জাত—বোগ্‌দা ষাঁড় ছয় মাসেই জোংলানো যাবে। আসছে বছরে লাঙলে জুত্‌লে দু'টো দামড়ার কাম দেবে।

গরুটাকে দেখে লোভ তো হয়ই। কেমন খলখলে শরীর, আর উঁচু লম্বাও বেশ। তাই অনেকে দু'চোয়াল ফাঁক ক'রে কয় দাঁতের তা দেখে নিচ্ছিল; আর লেজে হাত দিয়ে বলছিল, চোটের আছে বটে। অনেক দামা-দামির পর রফা হলো পঞ্চান্ন টাকায়। বশারতের ইচ্ছে ছিল, আরও কিছু বেশি। কমসেকম ষাট টাকা না হলে বেচবে না। কিন্তু নানা লোকের নানা কথায় সে আর মনটাকে স্থির রাখতে পারলো না, ঐ পঞ্চান্ন টাকাতেই রাজি হয়ে গেল।

এখন জ্যৈষ্ঠ মাস! আর কয়েকদিন না গেলে, পানি না ভাসলে নৌকা পাওয়া যাবে না! তাই বশারত টাকা কোমরে খুব ক'রে কষে বেঁধে বাড়ির পথে পা বাড়ালো। এদিকে আম খুব সস্তা। একবার ইচ্ছে হয়েছিল, কয়েক হালি আম কিনে বাড়ি নিয়ে যায়, কিন্তু কি ভেবে তা আর সে কিনলো না। এমনকি ক্ষুধা লাগা সত্ত্বেও দু'চার পয়সার মুড়ি-মুড়কি পর্যন্ত খেল না। এ টাকা সে ভাঙাতে পারবে না। একখানা পছন্দসই নাওয়ের কি দাম হয় তার ঠিক কি?

অনেক রাতে বাড়ি এলো বশারত, পানি নিয়ে হাত মুখ ধুলো, খেতে বসলো, কিন্তু এ পর্যন্ত ছানুর মা তাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করলো না। তার পর শোবার আগে বশারত যখন গাঁট খুলে টাকা রাখতে গেল, তখন ছানুর মা বললো: কততে বেচলে?

: দুই কুড়ি পনর।

: তিন কুড়িও হলো না? এমন সোনার বাছুরটা।

: মুখ দেখে তো আর দাম হয় না, কাম দেখে দাম। লাঙলে জোংলানো থাকলে ওর চেয়ে অনেক বেশি হতো!

ঐ পর্যন্তই। গরুটাকে নিয়ে আর কোন কথাবার্তা হয়নি। যক্ষ যেমন পাহারা দেয়, পানি না আসা তক বশারত তেমনি ক'রে টাকাগুলো পাহারা দিল, এক পয়সা এদিক-ওদিক করলো না, শেষে যদি সামান্তর জন্তে ঠেকে নাও কেনা না হয়।

আষাঢ় মাসে নালা ডোবায় পানি আসতেই গাঁয়ের ছলিমকে সাথে নিয়ে বশারত বাদাই হাটে গেল নৌকা কিনতে। ওখানে হাটের ভাঙনে দূর-দূরান্তর থেকে নানা ঢংয়ের নানা মাপের তৈরী নৌকা মিস্ত্রীরা নিয়ে আসে বিক্রীর জন্তে। টাকা হলেই পছন্দসই নৌকা পাওয়া যায়। সারাদিন ধরে নৌকা পছন্দ আর দামাদামি হলো। কিন্তু কি যে কাণ্ড, পছন্দ হলে দামে কুলায় না, আবার দামের মধ্যে এলে মোটেই পছন্দ হয় না। দুই-তিন সাল পুরানো, নয়তো আকাঠের তৈরী, ছাদও ঢিলা-ঢালা। বশারত মনে মনে খুব ঘাবড়ে গেল। শেষে বুঝি নৌকা না কিনে খালি হাতেই বাড়ি ফিরে যেতে হয়। অবশেষে কে একজন দূরে ডেকে নিয়ে কানে কানে বললো, আসেন পছন্দসই নাও দিচ্ছি। সত্যই পছন্দ মাফিক। গড়ন ভাল, কাঠও আকাঠা নয়, জাত কাঠ, তাও একেবারে সারে তৈরী। একসাল মাত্র পানি পেয়েছে। দামাদামিও বেশি করতে হলো না। বশারত বুঝলো, লোকটার খুব গরজ। চল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ, শেষে পঞ্চাশে কিনে ফেললো বশারত। মনে মনে ভাবল, কমসেকম বিশ-পঁচিশ জিতেছি।

নৌকা ঘাটে এনে বাঁধতে রাত হলো প্রায় এক প্রহর। তবুও ছামুর মা খবর পেয়ে ঝিনুকে ক'রে তেল এনে নৌকার গলুইতে মাখিয়ে নৌকা বরণ করলো। মনে মনে আল্লার নিকট মোনাজাত জানালো—আয় আল্লা, এ নায় যেন বরকত হয়।

নৌকা কিনে আনবার পর থেকে আজ কয়েকদিন বশারত প্রায় বাড়িতে আসে না। শুধু নৌকা বেয়ে বেয়ে এখানে-ওখানে মনের আনন্দে বেড়িয়ে বেড়ায়। যতটুকু সময় বা বসে, তাও দেখ, ঐ নৌকা ঘাস জাবা দিয়ে ঘষে মেজে সাফ-সাফাই করছে। ছোট বেলা থেকেই একখানা নৌকার জবর শখ ছিল বশারতের। কতজনের নৌকা চাইতে গিয়ে কত গালি মন্দ শুনেছে। কারো একখানা ভালো নৌকা দেখলেই লোভাতুর নয়নে তাকিয়ে থেকেছে।

আহা, এমন একখানা নৌকা যদি তার হতো। গামছা পরে গলা-বুক-পানি ভেঙে পায়ের লগি ঠেলতে ঠেলতে কত দূরের পথ সোনাতলির হাট করেছে, বাহির মাঠ থেকে জল ডোবা ধান কেটে মাথায় বয়ে এনেছে, আর একখানা নৌকার জন্যে মনে মনে কত আহাজারী করেছে। আজ তার নিজস্ব একখানা নৌকা হয়েছে তাই মনে মনে তার কত গর্ব। বর্ষার কষ্ট জীবনে আর পোহাতে হবে না। এ সব কথা ভাবে আর লগি দিয়ে নৌকা বেয়ে কল কল ক'রে এগিয়ে যায় বশারত।

সেদিনও অমনি যাচ্ছিল, হঠাৎ গাঁয়ের চৌকিদার তোফেল ডাক দিল: ও বশারত, বলি শোন।

প্রথম দুই-তিন ডাক শুনতেই পায়নি। তারপর তোফেল যখন চিৎকার করে ডাকল: বশারত—ও বশারত, শুনতে পাচ্ছ না—নাকি কথা কানে যায় না? নাও ভেড়াও এখানে।

বশারত ডাক শুনে ঘাড় ফিরিয়ে এক নজর দেখলো, তোফেল চৌকিদার সাথে একজন সিপাই, আর একজন যেন কে। মনে মনে ভাবলো, এইরে সেরেছে, এবার হয়তো ব্যাটাদের কোথায় কোন পাড়ে নামিয়ে দিয়ে আসতে হবে। নাওখানা পায়ের কাদায় একদম নষ্ট ক'রে রেখে যাবে। এ ভেবে বশারত নৌকা বাইতে বাইতেই জবাব দিল: সময় নাই ভাই, হাটের বেলা হয়া আ'লো, হাটে যাতি হবি।

তখন সিপাইজী হেঁকে উঠলেন: থাম ব্যাটা। বলি লাট সাহেব হইছিস যে, কথা শুনবি না।

এরপর আর না থেমে উপায় থাকে না। বশারত দুই ঠোঁট মুহূ নেড়ে বিড় বিড় ক'রে কি বলতে বলতে নৌকা এনে ডাঙায় লাগিয়ে দিলো।

তৃতীয় ব্যক্তিটি চেঁচিয়ে উঠলো: এই নাও-ই আমার হুজুর।

সিপাইজী বললেন: তোফেল বাঁধো ব্যাটাকে। ব্যাটা চোর কাহেকার, এই গরীব মানুষটার নাও চুরি করেছ শালা। যাও এখন, শ্বশুর বাড়ি থেকে ঘুরে এস ছয় মাস—বছর।

বশারত কিছু বুঝতে না পেরে হতভম্ব হয়ে সিপাইজীর মুখের দিকে চেয়ে রইল কতক্ষণ। তারপর বললো: সেকি হুজুর, নাও কিনে আনছি, বাদাই হাট থে, এক থোকে দুই কুড়ি দশ টাকা গুণে দিছি হুজুর। সাক্ষী আছে ছলিম। আমার চৌদ্দ গুষ্টিতে কেউ চোর নাই, এমন মিছে চুরির বদনাম দিলি জহর খায়া জান দিব হুজুর।

: নাও কিনেছিস, লেখাপড়া করা রশিদ আছে ?

: হ্যাঁ, চিটও আছে হুজুর। চলেন বাড়ির পর দেখাচ্ছি। সত্যিই এক রত্তি তেলচিটে কাগজে লেখা আছে—"নজিমদ্দি শেখ, বাপের নাম বেরামদ্দী শেখ সাকিন মামুদপুর। দুই কুড়ি দশ টাকা বুঝিয়া পাইয়া খুশী খোসালীতে এই নাও বিক্রী করিল।"

নৌকাওয়ালা দানেজ মণ্ডল বললো: কার নাও, কে বেচে! তা'ছাড়া মামুদপুর সাকিনে নজিমদ্দিন শেখ বলে লোকই নাই। আপনি তদন্ত ক'রে দেখতে পারেন, এ চিট জাল।

ছলিম পুলিশের খবর পেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়েছে। অতসব হুজ্জুত হাঙ্গামের মধ্যে নেই। ওর নাম পুলিশরে বাবা, বশারতের সাথে যোগ আছে বলে চালান ক'রে দিতে কতক্ষণ! তাই সাক্ষী পাওয়া গেল না। বশারত নৌকাসহ থানায় চালান হয়ে গেল।

দানেজ মণ্ডল কাকুতি মিনতি জানালো: নাওখান দিয়ে দেন হুজুর।

থানার দারোগা বাবু বললেন: তা হয় না। যতদিন কেস ফয়সালা না হয়, ততদিন নৌকা থানার হেফাজতে থাকবে।

বশারতকে সদর হাজতে পাঠিয়ে দারোগা সাহেব মামুদপুরের নজিমদ্দি শেখকে ধরার হুকুম দিলেন। কোথায় কে নজিমদ্দি শেখ! মামুদপুরে কেন, আশপাশ আর দশ গাঁয়েও এমন লোকের হদিস মিলছে না, কেসেরও কোনো হালা-গোছা হচ্ছে না, বশারত হাজতে পচে মরছে। যে নৌকা নিয়ে এত, সে নৌকা থানা-ঘরের সামনে রোদে শুকাচ্ছে। ছেলেমেয়েরা নৌকার মধ্যে খেলার ঘর তৈরী ক'রে ধুলোবালি ভাঙা বাসন-পত্র—রাজ্যের সব কত কিছু জমা ক'রে খেলার-আসর জমায়! কোনো কোনো রাতে হয়তো কোনো বিরহী সিপাইজী নৌকার গলুয়ের উপরে ব'সে তার প্রেমিকাকে স্মরণ করে গান গায়।

মামলার যখন দিন পড়ে দানেজ মণ্ডল এই পথে সদরে যায়। আসবার-যাবার পথে প্রথমে রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপলক নয়নে নাওখানার দিকে তাকায়। তার দুরবস্থা লক্ষ্য করে। দু'খানা মাথা-কাঠ দু'দিকে ঝুঁকে গেছে, আগা নাওয়ের গলুইটা নিচের দিকে বেঁকে ঝুলে আছে। ধুলো-বালিতে সে চকচকে কাঠ আর চকচকে নেই। কত বছরের পুরানো মনে হয়। কি মনে ক'রে সে একবার বেলার দিকে তাকায়। তারপর ত্রস্তপায়ে নেমে এসে কাঁধের গামছাখানা দিয়ে ধুলো-বালিটা ঝেড়ে-ঝুড়ে সাফ-সাফাই করে দেয়। লক্ষ্য করে, রোদে রোদে তক্তাগুলো চড় চড় ক'রে ফাটছে। তাপরর জঙ্গলের

ধার থেকে ছইয়ের একটা পুরান ভাঙা পাতিল কুড়িয়ে নিয়ে পাশের খাল থেকে পানি এনে নৌকার উপর ছড়িয়ে দেয় আর বলে: তোর গাও-গতরটা একেবারে গেলরে। কিন্তু আমি কি করতি পারি, আমার যে ক্ষমতার বাইরে। গাছের একখানা মরা ডাল ভেঙে এনে গলুইটাকে টেনে সোজা করে প্যালা দেয়, তারপর বেলার দিকে তাকিয়ে দেখেই হন হন ক'রে সদর মুখে হাঁটতে থাকে। এখনো সামনে দশ বারো মাইল পথ।

বর্ষা গিয়ে শুকনা কালও যায় যায় প্রায়। মোকদ্দমা শুধু দিন পড়ে পড়ে পিছায়। এবারে দানেজ মণ্ডল গিয়ে আগেই নিজের মোক্তারকে ধরলো: হুজুর, দয়া করে মামলাটার একটা ফয়সালা ক'রে দিন। যে নাওয়ের জন্যি মামলা সে নাও তো পরায় শেষ হয়ে গেছে।

মোক্তারবাবু বলেন: আরে বল কি মোকদ্দমার ফয়সালা কি আমার হাতে নাকি? তা'হলে তো কবেই হয়ে যেত। যা হোক, আর দেরি নাই দুই-একটা তারিখের মধ্যেই রায় হয়ে যাবে। মোকদ্দমা তুমি পাবে। ও ব্যাটা নির্ঘাত জেলে যাবে।

দানেজ বলে: আরও দুই একটা তারিখ? মামলা পাইয়া আমার দরকার নাই হুজুর, মামলা আপনি ওকেই দিয়ে দেন, তবু শিগ্‌গির ফয়সালা হোক, নাওখানা তা হ'লে হয়তো বাঁচতো। আমার বড় শখের নাও হুজুর— একেবারে মিছমার হইয়া গেল।

মোক্তারবাবু বলেন: আচ্ছা না-বুঝ পাগল তো। মোকদ্দমা ওকে দিবে তো তুমি হাজির হও কেন, গরহাজির থাক, আপনিই ও পেয়ে যাবে।

দানেজ এ কথার পর অনেক কিছু ভাবলো, তারপর এক সময় যে পথ দিয়ে এসেছিলো সে পথ ধরে নীরবে ফিরে গেলো।

নির্দিষ্ট সময়ে ডাক পড়লো—দানেজ মণ্ডল হাজীর। কোথায় দানেজ মণ্ডল? কোন পাত্তা নেই: বাদীই নেই, তার আবার মোকদ্দমা কিসের? হাকিমের কলমের এক খোঁচায় মকদ্দমা ডিসমিস।

বশারত কিছু বুঝতেই পারলো না, মোকদ্দমার কি হলো। সে যে খালাস পেয়ে গেলো সেইটেই বড় কথা, অত বুঝে দরকার কি? ছয়মাস হাজত খেটে সে বশারত আর বশারত নেই! চেনাই যায় না এখন। পাগলের মত চেহারা।

থানার কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় বিকেল হয়ে এলো। থানা-বাড়ির নিকটে এসে কেবল ভাবছে নাওখানার একটু খোঁজ নিয়ে যাবে নাকি, ভাবতেই

মাথা তুলে সামনে তাকিয়ে দেখলো, কে একজন লোক একখানা নাও ঘষে মেজে সাফ-সাফাই করছে! বশারত এগিয়ে গেল। এই তো সেই লোক, সেই দানেজ মণ্ডল, কোর্টে কতবার সাক্ষাৎ।

দানেজ চমকে উঠে বশারতের দিকে ঘাড় উঁচিয়ে চাইলো, তারপর বললো: নাওখান সাফ সাফাই ক'রে দিয়ে গেলাম ভাই, রোদে রোদে তক্তাগুলো ফা'টে ফা'টে বিচ্ছিরি হ'য়া গেছে, গলুইটা ভাঙে গেছে। মিস্তিরি দিয়ে সারিয়ে গাব-গোবর দিয়ে নিও। তাইলি দশ-পানিতো চলবি। এর মধ্যি ওজর আপত্তির কথা বলবি না। জাত কাঠের নাও, তাও আবার সারাল, আকাঠের কিছুই নাই।

বশারত হাঁ ক'রে তাকিয়ে যেন দানেজ মণ্ডলের কথাগুলো গিললো প্রথমে। তারপর নৌকার দিকে এক ধেয়ানে তাকিয়ে রইলো। নৌকার অবস্থা দেখে দানেজ মণ্ডলের যত্ন-আত্তি দেখে চোখ বেয়ে তার পানি এলো। সে বললো: মামলা আমি পাইছি ভাই, কিন্তু নাও যখন তোমার হক্কের, তখন এ নাও তুমিই নেও, আমি চললাম। এ বলে সে ফিরে যেতে লাগলো।

দানেজ মণ্ডল লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর বশারতকে ফেরাতে দ্রুত পায়ে এগিয়ে যেতে যেতে বললো: না, না, ভাই না, তা হয় না।

বৃষ্টি

আলাউদ্দিন আল আজাদ

(বৃষ্টি নামবে। ঈষৎ শিশির ছোঁয়া বসন্ত রাত্রে দক্ষিণ থেকে বইবে যে হাওয়া, তাতে থাকবে সমুদ্রের আর্দ্রতা, ফাটল ধরা শুকনো মাঠ আর পাতা-ঝরা গাছের শাখায় শিহরণ জাগিয়ে দিয়ে সেই অতিদূরে পাহাড়ের চূড়ায় ঘনীভূত হবে, এর পর গর্জনে বজ্রে বিদ্যুতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে সারাটা আসমান, মঙ্গলসুধার মতো অজস্র ধারায় নামবে বৃষ্টি। গাছের শুকিয়ে যাওয়া ডালাপালাগুলি কচি পাতায় ভরে উঠবে, সারা খামার ছেয়ে যাবে সবুজে সবুজে। দুপুরের রোদে পাট খেতের চারা বাছতে গিয়ে শরীর থেকে হয়তো দরদর করে ঘাম ঝরবে, কিন্তু তাতে আসবে না একটুকু ক্লান্তি। কেননা, নতুন ফসলের খোয়াব প্লাবনের মতো মিশে থাকবে রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে।)

(কিন্তু সে বছর এসব কিছুই হল না। ফাল্গুন চলে গেল, উত্তর দিকটা কিঞ্চিৎ কালোও হল না; চৈত্র শেষ হতে চললো, আকাশে দু'একদিন গুরু গুরু আওয়াজ হল, গুমোট হয়ে রইল সারাটা প্রকৃতি, কিন্তু এর বেশি কিছুই নয়।)

(এর পর এলো বৈশাখ। আর এখনও সূর্য আগুনের ফুলকি উড়িয়ে তীব্র তেজে জ্বলতেই লাগল, মাটির বুক চিরে মাথা উঁচিয়ে-ওঠা পাটের চারাগুলি আস্তে আস্তে কুঁকড়ে গেল। ওপরে খাঁ-খাঁ শূন্য, নীচে আদিগন্ত মুক্ত সুদূর, তারও নীচে বাঘবন্দী নকশার মতো জমিগুলি রোদে-পোড়া, বিবর্ণ। দুপুর বেলা খেতের আলের ওপর গিয়ে দাঁড়ালে কলজেটা সহসা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। ঝলসানো তামাটে জিহ্বা বার করে সারা মাঠটা ডাইনীর মতো হাঁ করে আছে। অনন্ত ক্ষুধা নিয়ে সে নিজে বুকের শিশু-শস্যকে গ্রাস করেছে, আগামী বছর যে গজব নেমে আসবে তাতে সন্দেহ নেই।)

কিন্তু কেন? এর পিছনে নিশ্চয় কোনো গুরুতর কারণ আছে। সেদিন জুম্মা নামাজের পর আলোচনা উঠল। মিম্বরের কাছে দাঁড়িয়ে মৌলানা মহীউদ্দিন বলতে লাগলেন,—বেরাদরানে-ইসলাম! আমি অধম বান্দা, আপনাদের খেদমতে কি বয়ান করব, আপনারা সব বিষয়েই ওয়াকিফহাল।

কিভাবে আছে খোদার গজব নামে তখনি, যখন দুনিয়া গুণাগারিতে ভরে যায়। আমরা এখন কি দেখছি? না, ছেলে বাপের কথা শোনে না, জেনানা বে-পর্দা, চুরি-ডাকাতি বদমায়েশিতে দুনিয়া পূর্ণ হয়েছে। এদিকে নামাজ নেই, রোজা নেই, হজ্ নেই, জাকাত নেই। আজ চলুন, আমরা তাঁর দরবারে জার-জার হয়ে কাঁদি। মাঠে গিয়ে সবাই হাত তুলে মোনাজাত করি, তিনি রহমানুর রহিম, ইচ্ছা করলে একটু দয়া করতেও পারেন।

মৌলানা সাহেবের কণ্ঠস্বরের গুরু গম্ভীর ধ্বনি তরংগে পাকা মসজিদের ভিতরটা গমগম করতে লাগল। মুসল্লিদের মধ্য থেকে উঠে দাঁড়ালেন হাজি কলিমুল্লাহ। থুতনিতে একগুচ্ছ শাদা দাড়ি, মাথায় কিস্তি টুপি, নামাজ পড়তে পড়তে কপালের মাঝখানটায় দাগ পড়েছে। তিনি প্রথমে গলা খাকরানি দিলেন, পরে আবেগকম্পিত গলায় বলতে লাগলেন, মৌলানা সাহেব যা বলবেন, তা অবশ্যই আমরা পালন করব। কিন্তু এই সঙ্গে একটি কথা সকলের মনে রাখতে হবে, কু-কর্মের বিচার চাই। এই অনাবৃষ্টি কেন হল, আপনারা ভেবেছেন কি? খোলাখুলি বলতে গেলে, নিশ্চয় কোনো মেয়ে অবৈধভাবে গর্ভবতী হয়েছে, তৌবা আস্তাকফেরোল্লা। এই অঞ্চলে, আশে পাশের কোনো গ্রামে অথবা আমাদের গ্রামেও হতে পারে। এদের তালাস করে বার করতেই হবে, নইলে এই আজাবের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া যাবে না। এদের দুর্রা মেরে ঠাণ্ডা করতে হবে।

ডান হাতের আঙুলগুলি দাড়িতে একবার চালিয়ে গরমে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন হাজি কলিমুল্লাহ্. তাঁর মগজের কোষে কোষে সত্যিকারের অপরাধকে খুঁজে পাওয়ার ভাবনা।

দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে ফুটবল খেলার ময়দানে যেদিন 'মেঘের নামাজ' হওয়ার কথা, তার একদিন আগেই অসুখে পড়লেন সুফী মৌলানা মহিউদ্দিন।

জামাতে ইমামতি করবার জন্য হাজি সাহেবকে গাঁয়ের তরফ থেকে অনুরোধ করা হল। প্রথমে বিনয় করলেও, সকলের খেদমতে পরে রাজি হলেন।

সেদিন নামাজ শেষ হওয়ার পরে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে মুখ করে দাঁড়ালেন হাজি কলিমুল্লা, বহুদূর চাউনি বুলিয়ে দেখলেন দুনিয়াটা এখনো জিন্দেগীর অযোগ্য হয়ে ওঠেনি, এখনো ডাক দিলে আলেমুল গায়েবের দরবারে হাজিরা দিতে হাজার লোককে পাওয়া যায়। তিনি চেয়ে রইলেন, আর

দেখলেন অগণিত টুপির শোভা, হোক না সেগুলি তেল চিটচিটে অথবা ছেঁড়াখোঁড়া। খোলা প্রান্তরে গালভাঙা তামাটে মানুষগুলি বসে আছে অসহায়ের মতো, সবারই মনে একটুখানি রহমের প্রার্থনা। হাজি কলিমুল্লা দু'হাত তুলে দরাজ গলায় উচ্চারণ করতে লাগলেন, 'ইয়া আল্লাহ্, ইয়া বারে খোদা, তুই চোখ তুলে চা, একটু দয়া কর তোর বান্দাদের। তুই আসমান-জমিন, চান-সুরুজের মালিক, তোর আঙুলি হেলনে সাগর দোলে, হাওয়া ছুটে চলে, নহর বয়, তোর একটুখানি ইচ্ছায় এই দুনিয়া ফুলে-ফসলে ভরে উঠতে পারে। মেঘ দে, পানি দে, ছায়া দে, শান্তি দে, তুই!'

'আল্লাহুম্মা আমিন! আল্লাহুম্মা আমিন!' সারা জামাত জোড়া একই কাতর আওয়াজ। হাজি কলিমুল্লার শাদা দাড়ি চোখের পানিতে ভিজে গেল। কেঁদে জার-জার হয়ে তিনি দোয়া খতম করলেন, 'সোবহানাকা রাব্বিকা রাব্বিল রাব্বিল ইজ্জাতে আম্মাইয়াসসেফুন, আস্সালামু আলাল মুরসালিনা, আলহামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামিন!'

এইভাবে একদিন, দুদিন, তিনদিন ময়দানে গিয়ে জামাতে শামিল হল ছেলে-বুড়ো-জোয়ানেরা, তাদের এক চোখ আকাশের দিকে আরেক চোখ ফসল কুঁকড়ে যাওয়া খামারের দিকে। ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরা এক মায়ের এক পুত্রের গায়ে চুন কালি মাখিয়ে, তার মাথার কুলোয় কোলা ব্যাঙ আর বিষকাঁটালির গাছ রেখে রাতের পরে রাত মেঘখেলা খেলল, নদীর ধারে সিন্নি রেঁধে কলাপাতায় ফকির-ফাকারকে খাওয়াল। তাদের ঘাড়ে ব্যথা হয়ে গেল ওপরের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে; কিন্তু সেই রোদ চুয়ানো কাক-চক্ষু নীল, এক খণ্ড মেঘের আভাষও দেখা গেল না।

মগরেবের নামাজের পর পাটিতে বসে তসবিহ জপতে জপতে এসব কথাই ভাবছিলেন হাজি কলিমুল্লা, তাঁর চোখের পুতুলিতে অবসাদের ছায়া। গভীর ভাবনার কারণ আছে বইকি! সুতোর চোরাকারবার থেকে যে কয়েক হাজার টাকা পেয়েছিলেন তার অর্ধেক দিয়ে একটা গুদাম কিনেছেন মেঘনার বন্দরে, বাকি অর্ধেক দিয়ে কিনেছেন দুন দেড়েক জমি। নিজে পাট কিনে মজুদ করতে না পারলে গুদাম কেনার ফায়দা নেই। মাসিক দেড়শো টাকা ভাড়ায় আর কী হয়। অথচ এ বছরও গুদামটাকে নিজে ব্যবহার করতে পারবেন বলে মনে হচ্ছে না। এদিকে সবগুলি জমি নিজে চাষ করেছেন। এখানটায়ই হয়েছে চরম বোকামি। যদি পত্তনি দিতেন, তাহলে হাজার

দেড়েক টাকা নগদ পাওয়া যেত; কিন্তু মুনি-মজুর ও জমির তদারক করতে বেরিয়ে যাচ্ছে। বীজ বোনা থেকে এক-নিড়ি পর্যন্ত পয়সা-কড়ি কম খরচ হয় নি, ভবিষ্যতে আরো হবে, অথচ এদিকে আকাশের যা হাল, তাতে ফসল পাওয়ার বিশেষ আশা নেই।

সুতোর কারবার ছেড়ে দিয়েও ভালো কাজ করেন নি। গত বছর হাওয়া-গাড়িতে চড়ে গিয়ে হজ করে এসেছেন; ভেবেছিলেন, অতঃপর সংসারের ঝামেলাতে নিজেকে এতটা জড়াবেন না, গুদামটা ছেলেদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজে জমি-জমা নিয়েই থাকবেন। কিন্তু টাকার অভাবে সব ভেস্তে গেল। আসলে ব্যবসা ব্যবসাই, এতে সৎ-অসৎএর প্রশ্ন নেই, নিয়ৎ ভালো থাকলে দান-খয়রাত করলেই হল।

জানালার বাইরে থেকে আমের বোলের তীব্র গন্ধ ভেসে আসছিল, বাঁশঝাড়ে শালিকের কিচির-মিচির অনেকটা মন্দীভূত। তসবিহর গুটিগুলি চঞ্চল হয়ে ঘুরছে হাজি কলিমুল্লার আঙুলে আঙুলে, এই সঙ্গে তাঁর মনটা ক্রমেই আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে।

জৈগুন ঘরে বাতি দিতে এসে যেন চমকে উঠল। বলল,—'মিয়া সা'ব এখানে? মসজিদে যান নি?'

'না শরীরটা খুব ভালো নয়।' হাজি সাহেব ওর মুখের দিকে চেয়ে বললেন,—'তা' ছাড়া তোর গিন্নি মা বোধ হয় একখুনি এসে পড়বেন।'

দিন পনেরো হল নতুন গিন্নি বাপের বাড়ি গিয়েছিল নাইওর করতে, আজকে তাকে আনবার তারিখ। হাজি নিজে যেতে পারেন নি, প্রথম তরফের তৃতীয় ছেলে খালেদকে পাঠিয়েছিলেন সকাল বেলায়। আসলে বৌকে বাপের বাড়িতে বেশিদিন থাকতে দিতে তিনি সব সময়ই নারাজ। প্রথম স্ত্রীকে দশদিন থাকতে দিয়েছিলেন, তাও একেবারে নতুন অবস্থায়। দ্বিতীয় স্ত্রীর বেলায় দিনের সংখ্যা আরো কিছুটা বেড়েছিল। তবে এখন পড়তি বয়েস. সব ব্যাপারে কড়াকড়ি চলে না। দু'বছর আগে দ্বিতীয় স্ত্রী মারা যাওয়ার পর সংসার থেকে তার মন একেবারে উঠেই গিয়েছিল। কিন্তু খোদার কুদরত, কার সাধ্য তার কিনারা করে? তিনি কপালে যা লিখে রেখেছেন. তা' একদিন ফলবেই। গতবার যখন হজে যাচ্ছিলেন, তার মাসখানেক আগে সবাই ধরে বসলো, এমন সোনার সংসার, একজন গৃহিণী না থাকলে কোনো কিছুই ঠিক থাকবে না।

কিন্তু পাত্রী? বয়সে বাট পুরো হতে চলল, এখন হাতে ধরে কে নিজের মেয়ে দিতে যাবে?

'হাসালেন হাজি সাহেব, হাসালেন। আপনার কিনা পাত্রীর অভাব?' মজু প্রধান দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন,—'আপনি ক'ন যে বিয়ে করবেন, আমি পাত্রী ঠিক করে দিচ্ছি! তাও যেমন তেমন নয়, এমন কন্যা দেব, চোখে পলক পড়বে না।'

হাজি কলিমুল্লার চোখের তারা দুটো খুশিতে চক্‌চক্ করে উঠল। একটা অজানা অনুভূতিতে তার হৃৎপিণ্ডটা ধুকধুক করছিল; কিন্তু বাইরে, আগাগোড়া ম্লান হয়েই রইলেন, আগেকার সহধর্মিনীদের স্মৃতি এতো শিগগির ভুলে যাওয়া উচিত নয়। তিনি একটা ঢোক গিলে বললেন,—'দেখুন, তিনকাল গিয়ে এককালে পড়েছি, এখন আমোদ-আহ্লাদ করার সময় নয়। ঘরের তদারক আর—আর আমার ফাই ফরমাইশটা করতে পারলেই হল।'

'তাতো বুঝলাম।' মজু প্রধান যুক্তি দেখালেন,—'ভাঙা-নাওয়েও কাজ চলে, আবার নতুন নাওয়েও চলে। কিন্তু কোন্‌টা আমরা চাই! কোন্‌টা দিয়ে গাঙ পাড়ি দিতে সুখ?'

এরপর সাতকানি জমি সাফ-কাওলা করে দিয়ে যে পাত্রী ঠিক হয়েছিল, সে মজু প্রধানেরই মেয়ে-ঘরের নাতনী। বয়েস একুশ-বাইশ বছর হবে। এ-দেশের মেয়েরা কুড়িতেই বুড়ি হয় সে-হিসেবে হাজি সাহেবের সঙ্গে সম্বন্ধটা মোটেই বেমানান হয়নি!

রান্নাঘরের হাঁড়ি পাতিল গুছিয়ে জৈগুন এল। অর্থপূর্ণ গাম্ভীর্যের সঙ্গে একটা পিঁড়ি টেনে নিয়ে বসলো। হাজি সাহেবের ওজিফা তখনো শেষ হয়নি। মুখের বিড়বিড় খানিকক্ষণের জন্য থামিয়ে তিনি জিগগেস করলেন, —'কিরে কিছু খবর আছে?'

জৈগুন বলল,—'আছে।'

'কি শুনি!' তসবিহর মালায় আঙুল থেমে গেল হাজি কলিমুল্লার, তিনি উৎসুক দৃষ্টিতে চাইলেন। কাজ-কর্মের ফাঁকে ফাঁকে গোপন খবর সংগ্রহের জন্য তিনি জৈগুনকে নিযুক্ত করেছিলেন, আর সেজন্যই এই আগ্রহ।

'আমি আজ গিয়াছিলাম বাতাসীর কাছে। গিয়ে দেখি, সে তার খাসিটার জন্য আমপাতা পাড়ছে। আমাকে দেখেই সে নানান কথা বলতে

লাগল, কিন্তু আমি চেয়ে রইলাম ওর শরিলের দিকে।' দরজায় একবার চেয়ে নিয়ে জৈগুন বলল,—'ওর তলপেটটা বেশ ফোলা মনে হল।'

হাজি চিন্তিতভাবে জিগগেস করলেন,—'ওর জামাই না কবে মারা গেছে?'

'তা সাত-আট মাস তো হবেই!' জৈগুন বিশেষ করে বলল, 'কিন্তু ওর পেট মনে হল চার-পাঁচ মাসের।'

'তাই নাকি? তাহলে তো বেশ অনেক দিনের ফাঁক?' হাজি কলিমুল্লা যেন সত্যদর্শন করেছেন, তাঁর চোখে আশার আলো ফুটে উঠল। নিচু গলায় জিগগেস করলেন,—'আচ্ছা বাতাসীর ঘরে যে লোকটা থাকে তাকে দেখলি?'

'হাঁ, দেখলাম। অসুখ এখনো সারে নি, তবে আগের চেয়ে একটু ভালো। আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখি সে ঘরের ভিতরে বিছানায় শুয়ে আছে।'

'তা' হোক, তা' হোক।' হাজি অসহিষ্ণুর মতো বললেন,—'শুয়ে থাকলে কি হবে? শুয়ে থাকলে কি আর এসব কাজ করা যায় না? নিশ্চয় যায়। তুই কি বলিস?'

'হাঁ, আপনি ঠিকই কইছেন। তা ছাড়া বাতাসীর চলাফেরা আমার ভালো মনে হয় না। রজবালি বেঁচে থাকতেই এর সম্বন্ধে কত লোক কত কথা বলেছে। নামা-পাড়ার ছমু যে ওর দরজা খুলেছিল, তা কি কেউ শোনে নি। রজবালি টের পেয়েছিল বলেই না দোষটা ছমুর ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। না-হলে মেয়েমানুষের চোখঠারানি ছাড়া কি অমন কাজ কেউ করতে সাহস পায়?'

'যদি এই ঠিক হয়, তাহলে তো আর কোনো কথাই নেই। আমার বিশ্বাস, বাতাসীই এ-কাম করেছে! না হলে বৃষ্টি হবে না কেন?' হাজি আবার তস্‌বিহ জপতে লাগলেন, খানিকক্ষণ চুপ থাকার পর বললেন,—'তবু রাখ, আমি নিজে একটু পরখ করে নিই, এরপর একটা কিছু করা যাবে।'

জৈগুন চলে গেলে আবার গভীর চিন্তামগ্ন হলেন হাজি কলিমুল্লা। তার কপালের বলিরেখা আরো কুঁচকে গেলো। তসবিহর গুটিতে ঘন ঘন আঙুল চলতে লাগল। বাতাসী, বাতাসী, বাতাসী। বাতাসী ছাড়া এ-কাজ আর কারো নয়। (অল্পবয়সে স্বামী মারা যাওয়ার এই দোষ! কেননা স্বামীর সঙ্গ একবার যে পেয়েছে, সে সেই স্বাদ কি সহজে ভুলতে পারে? এ হচ্ছে আফিমের মতো, ভাত ছাড়া যায়, তবু ছাড়া যায় না এর নেশা) তা ছাড়া ওর এখন পুরো জোয়ানী। যেমন তেমন দু'একজন পুরুষ ওর

কাছে কিছু নয়, এক চোখের বাঁকা চাউনিতেই কাত করে ফেলতে পারবে। অথচ কথা বলার কি কায়দা। মামাতো ভাই, দিনমজুরী করত, কালাজ্বরের কবলে পড়ে বিপদ হয়েছে, কেউ নেই, না দেখলে চলে না। এসব কথা দিয়ে আর চিড়ে ভিজে না। আসলে লোকটাকে এনেছে এক বিছানায় রাত কাটাবার জন্য—এ বুঝতে বাকি নেই।

কিন্তু এর শাস্তি হবে কী? কিতাবের হুকুম মানলে, গলা-ইস্তক মাটিতে পুঁতে এর মাথায় পাথর মারতে হবে, যতক্ষণ না প্রাণটা বেরিয়ে যায়। কিন্তু এ যুগে কি তা' সম্ভব? থানা আর পুলিশ রয়েছে যে! তা'হলে উপায়? জুতো মারা? একঘরে করে রাখা? গ্রাম থেকে বের করে দেওয়া?

হাজি কলিমুল্লা যখন এসব ভাবনায় তন্ময় হয়ে ছিলেন, তখন খালেদ তার নতুন মাকে নিয়ে মরা-গাঙের পানির কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

পূর্ণিমা চাঁদ দেখা দিয়েছিল বাড়ি থেকে রওয়ানা দেয়ার অনেক আগেই, এইবার তা' বাঁশঝাড়ের মাথা ছাড়িয়ে উঠে ঝলমল করছে। চারদিক নিঝুম, গাছ-পালায় বাতাসের নড়াচড়ার গরজ নেই।

মরা-গাঙে এখন হাঁটু পানি। দুই পাশে কাদা ঠেলে ডাঙার সঙ্গে যে সরু পথটার মিল হয়েছে, তার পরিষ্কার বালুর ওপর দিয়ে ঝিরঝির করে কেটে চলেছে ফোয়ারার স্রোত। পানির ভিতর থেকে গজিয়ে ওঠা বোরো খেতগুলিতে কচি ধানপাতার জড়াজড়ি।

নীচু হয়ে জুতো-জোড়াটা ডানহাত দিয়ে খুলে ফেলল জোহরা। তার কাঁধে ছোট ছেলেটা। তার অসুবিধে হচ্ছে দেখে পিছন থেকে খালেদ পাশে এসে বলল,—'সাজুকে আমার কাছে দিন।'

ওরা দু'জনে প্রায় সমবয়সী। প্রথম 'আপনি' বলতে লজ্জা করত খালেদের, কিন্তু এখন আর সে ভাবটা নেই।

জোছনায় আলোকিত বড়ো ছেলের মুখের দিকে চাইল জোহরা, টানা ভুরুর নীচে ওর সুন্দর চোখ দু'টো আরো সুন্দর মনে হল তার, একটা অব্যক্ত অনুভূতির ছলছলানিতে বনের অন্ধকারে শিহরিত নদীর মতো দুলে উঠল বুকের ভিতরটা। আচ্ছন্ন স্বরে জিগগেস করল,—'তোমার কষ্ট হবে না তো?'

খালেদ হাসলো। বলল,—'না এ আবার কষ্ট কি?'

সাজুকে পাঁচ বছরের রেখে ওর আম্মা এন্তেকাল করেছেন দু'বছর আগে, আদর যত্ন না পাওয়ায় ওকে কান্নারোগে ধরেছিল। কিন্তু বর্তমানে তা নেই। নতুন মাকে তার এমনি ভালো লেগেছে যে, সে এক মুহূর্তের জন্যও তার

কাছ-ছাড়া হয় না। জোহরা যখন নাইওর করতে যায়, তখন ও তার কোলে উঠে চলে গিয়েছিল।

[অন্য কাঁধের ওপর থেকে অঘোরে ঘুমিয়ে থাকা ছোটো ভাইটিকে নিজের কাঁধে নিতে গিয়ে খালেদের মনে হল, কপোতের বুকের মতো উষ্ণ, প্রবালের মতো কোমল কিসের মধ্যে যেন তার বাঁ হাতের আঙুলগুলি ক্ষণিকের জন্য হঠাৎ হাওয়ায় চাঁপার কলির মতো কাঁপুনি খেয়ে গেল। নিমেষে তার সমস্ত শরীরটা শির্ শির্ করে উঠল ভরামেঘে বিদ্যুৎ সঞ্চারের মতো। পলকের জন্য তার চোখে পড়ল, সহসা কেমন রাঙা হয়ে উঠল মেয়েটির মুখ, তার সারা চেহারায় রক্তের প্রবাহ বহির মতো ছড়িয়ে গেল। খালেদ আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না; আরেক জন্মের কোনো নিবিড় স্মৃতি অস্পষ্ট মনে পড়ার মতো কী এক অজানা বেদনায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঝিরঝিরে পানির উপর দিয়ে সুমুখে হাঁটতে লাগল।]

কিন্তু জোহরা দাঁড়িয়েই রইল। কাপড়টা ঠিক করে নিয়ে চাঁদের দিকে মুখ উঁচিয়ে চাইল একবার, আবার চাইল সামনে চলমান মূর্তিটার দিকে। এরপর সে চঞ্চল হয়ে উঠল। সেই রুপালি বালুর ওপরে ফোয়ারার স্রোতে বয়ে চলা রাস্তাটায় ত্রস্ত হরিণীর মতো পা ফেলে হাঁটু পানির কাছে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে পিছন থেকে শাড়িটা কুঁচকে এনে ডান হাতে হাঁটুর কাছে ধরা, জোছনা-উছল কালো পানির দিকে মুখ নিচু করে জোহরা দেখল, তার মূর্তিটা ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে, এই সঙ্গে ছোটো ছোটো ঢেউয়ে ভেঙে যাচ্ছে চাঁদের চেহারাও। হঠাৎ মুখ তুলে সে ডাকল,—'খালেদ!'

'কি!'—কিছুদূর থেকে খালেদ সাড়া দিল।

'আমাকে ফেলেই চলে যাচ্ছ।'—স্বপ্নের স্বরে যেন জোহরা বলল,—'আমি চলতে পারছি না। দেখ, দেখ। পানিটা কি সুন্দর!'

খালেদ ফিরে এল। বলল,—'আপনার কি হয়েছে বলুন তো, চলুন তাড়াতাড়ি। অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে।'

'ও তাইতো। অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে!' পানি ঠেলে কিছুদূর এগিয়ে আবার থমকে দাঁড়াল জোহরা। ঝিলিমিলি ঢেউয়ের দিকে চেয়ে বলল,—'দেখছ, কি সুন্দর পানি! এমন পানিতে মরতেও সুখ।'

কোনো জবাব দিল না খালেদ, মুখ নীচু করে চুপচাপ এগুতে লাগল।

ওপারে কোথায় একটা পাখি ডেকে ডেকে যাচ্ছে—'বৌ কথা কও!'

নদী পেরিয়ে এসে চপ্‌চপ্‌ পানি থেকে পা দুটো ঝাড়া দিয়ে দিয়ে নতুন জুতো জোড়াটা পরার সময় জোহরার মনে হল তার বুকের ভিতরে কিছু নেই, বিবাগী হাওয়ার মতো কিসের এক রিক্ত হাহাকার গুমরে গুমরে মরছে। নিজের কথা ভাবতেই সে আঁতকে উঠল, তার শরীরটা ঝিম ধরে অবশ হয়ে এল।

খালেদ আস্তে আস্তে হাঁটছিল। পিছন থেকে সে একটা কাতর-স্বর শুনতে পেল,—'একটু দাঁড়াও!'

'আবার কি হল আপনার!'

'কি জানি কিছু বুঝতে পারছি না! আমার চোখ দিয়ে এমন পানি পড়ছে কেন?' জোহরা ব্যাকুলভাবে এগিয়ে গিয়ে খালেদের চোখের সামনে নিজের দুটো চোখ বিস্ফারিত করে দাঁড়াল, চাঁদের আলোয় দেখা গেল, তার টলটলে দু'টো চোখ দিয়ে মুক্তোর মতো অশ্রুবিন্দু গড়িয়ে পড়ছে।

খালেদ আবার উচ্চারণ করল,—'কি হল আপনার?'

'তুমি কিচ্ছু জান না, কিচ্ছু বুঝ না?' কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ দুটো মুছে জোহরা অপ্রকৃতিস্থের মতো বলল,—'সাজুক দাও আমার কাছে। চল শিগগির। লোকজন নেই, আমার বড্ড ভয় করছে।'

ওরা যখন মুখোমুখি হয়েছিল, তার কিছু আগে থেকেই কিঞ্চিৎ হাওয়া বইতে শুরু করেছিল, আর যখন চুপচাপ চলতে শুরু করল, তখন এক খণ্ড ঈষৎ কালো মেঘ দক্ষিণ থেকে ধীরে ধীরে ভেসে আসতে লাগল।

খড়ম পায়ে উঠানে পায়চারি করছিলেন হাজি কলিমুল্লা, আকাশের দিকে চেয়ে তিনি চমকে উঠলেন। তাহলে তার আন্দাজই ঠিক?

'জৈগুন! ও জৈগুন!' তিনি থমকে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন,—'দেখে যা, আমরা যা ভাবচি তাই ঠিক। আসমানে সাজ দেখা দিয়েছে।'

জৈগুন চৌকাটের কাছে এসে মুখ বাড়িয়ে বললে,—'তবু তো আপনি বলছেন, আরো পরখ করতে। আমার মনের কোণে সুবা-সন্দে নাই। বাতাসী যা ছিনাল।'

আকাশে চলমান মেঘটার দিকে চেয়ে আবার পায়চারি করতে লাগলেন হাজি কলিমুল্লা, এর বিচারটা কি হবে তিনি তার কিনারা করতে পারছেন না।

আধ ঘণ্টা পরে জোহরা যখন এল, শুয়ে শুয়ে তার সঙ্গে আলাপ করতেও বার বার তাল কেটে যেতে লাগল, অনেক রাত পর্যন্ত চোখে ঘুম এল না!

মনস্থির করে পরদিন সকালে তিনি গিয়ে উঠলেন বাতাসীর বাড়িতে পুব পাড়ার আমবাগানের ওধারে। বাঁশের চালার নীচটায় পাকালের ধারে বসে ও খুদের জাউ রাঁধছিল, হাজি সাহেবের সাড়া পেয়ে একটা চৌকি হাতে উঠানে এল। এমন গণ্যমান্য লোক, সাত জন্মে একবার এসেছেন ওর এখানে, কি দিয়ে মেহমানদারি করবে, সে ঠাহর করতে পারল না।

মাথায় কাপড় টেনে ও কি বলছিল সেদিকে হাজির মোটেই নজর ছিল না, তিনি গোপন আড় চোখে হরিদ্রাভ লাবণ্য স্নিগ্ধ ওর দেহটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন!

এদিকে বাড়ির নাশতা-পর্বের তদারক শেষ হওয়ার পর জোহরা গুম হয়ে বসেছিল তার শোবার ঘরে চৌকির কিনারায়।

বিয়ে হওয়ার পর থেকে কিসের যেন এক আশ্চর্য মায়ায় বিনা কাজের সময়টুকু সে এখানটায় বসেই কাটিয়ে দেয়। এ কিসের জাদু? কিসের মন্ত্রণা? জোহরা তা বুঝতে পারে না। বাড়ির চেহারা বোধ হয় অনেক দিক থেকেই অদল-বদল হয়েছে, কিন্তু এ কামরাটায় কোন পরিবর্তন নেই, দিনে দিনে নতুন জিনিস যোগ হয়েছে মাত্র। আগেকার দিনিদের হাতের ছাপ অনেক কিছুতেই এখনও টাটকা হয়েই আছে, অন্ধকারে বসে থাকলে তাদের ঠোঁটের ফিস্‌ফিস্ আলাপ যেন সে শুনতে পায়। তখুনি ওর মনে হয়, এঘরে ঢোকবার কোনো অধিকার নেই, এখানকার সব দখল করে সে ডাকাতের কাজ করল।

'কিন্তু আমার কি দোষ? আমি তো রাজি হতে চাইনি? নানা বলল, বোন কাঁদিস্‌নে দু'একটা বছর সবুর কর, বুড়োটা মরল বলে। তখন বেশ জোয়ান দেখে একটা বর জুটিয়ে দেব। এখন সম্পত্তিটা হাত করে নে।' জোহরা আপন মনে আওড়াল,—'ছাই সম্পত্তি।'

দগদগে ঘা'র ওপর দিয়ে গরম বাতাস বইতে থাকলে যেমন করে জ্বলে, তার বুকের ভিতরটা তেমনি করে জ্বলতে লাগল। দম যেন ক্রমেই বন্ধ হয়ে আসছে, এক সময় সে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। ওর চোখের দুটো তারায় ঝলসঝল করতে লাগল একটা দুর্বিনীত বন্যতা।

মগজটা ঝিস্‌ঝিস্ করছিল, এলোচুলে ঝাঁকড়া মাথাটা একবার ঝাড়া দিয়ে জোহরা বাইরে চলে এল। চোখ তুলে চাইতেই ওর দৃষ্টি পড়ল কুয়ার ধারে

মেহেদি গাছটার দিকে, ভিজে মাটির রসে তাতে ঘন হয়ে কচিপাতা দেখা দিয়েছে।

ক'দিন সংকল্প করেও সে এই মেহেদি গাছটা কাটতে পারেনি। কিন্তু আজকে ডান হাতটা শির্ শির্ করতে লাগল। ত্রস্ত পায়ে সে চলে গেল রান্নাঘরের ভিতরে। সেখান থেকে ধারাল বঁটিটা এনে একেক কোপে একেকটি ডাল কেটে ফেলতে লাগল।

'আহা হা, করেন কি গিন্নিমা' জৈগুন দৌড়ে এল। বলল,—'গাছটা অনেক দিনের, মানুষের কত কাজে লাগে। কর্তা শুনলে ভীষণ রাগ করবেন।'

'তুই এখান থেকে যা তো। কে রাগ করবেন, না করবেন, তোর চাইতে আমি ভালো বুঝি। আমার ইচ্ছা হয়েছে আমি কাটবোই।'

'আমি কাম করে খাই, আমার কি? আপনার ভালোর জন্যই বলছিলাম।'

'আশ্চর্য!' জোহরা মুখ তুলে চাইল। বলল,—'আমার ভালো মন্দের চিন্তা তোকে করতে হবে? দুনিয়াতে আর লোক নেই!'

কর্তার প্রিয় গিন্নিকে ঘাঁটাতে সাহস করল না জৈগুন, মুখ কালো করে সে নিজের কাজে চলে গেল।

কেমন করে দুপুর হল, কেমন করে এল বিকেল, আর কেমন করেই বা রাত্রি এসে পৃথিবীর মুখ ঢেকে দিল, জোহরা কিছুই বলতে পারবে না। তার হৃদয়ের একটা অংশ কে যেন ঝকঝকে ধারাল ছুরি দিয়ে কেটে নিয়ে গেছে, প্রতিদিনের উচ্ছল ঢেউ সেখানে লাগে না, সেখানে তুষের আগুনের মতো শুধু একটি জ্বালা।

এশার নামাজের পর বিছানায় শুয়ে হাজি কলিমুল্লা বললেন,—'যা ভেবেছিলাম, বাতাসীই কুকাম করছে।'

'কেমন করে জানলেন?'—জোহরা শুধাল।

'এ সব জানতে কি আর খুব বুদ্ধি লাগে? তারে ঠিকমত ঘা দিলাম আর তা' বেজে উঠল। ব্যাস্, আর ভাবনা নেই। বিচারটা করতে পারলে বিষ্টি হবেই।' হাজি একটুখানি নীরব থেকে বললেন,—'আগামী শুক্রবারে রাত বারোটার পর বিচার বসাব। দেখা যাক কী হয়।'

জোহরা চুপচাপ শুয়ে বাইরের দিকে কান পেতে রইল। আমের বোলের গন্ধ এমন মাতাল কেন? রাত কেন এমন কালো, অন্ধকার? সূর্য যদি আর না উঠত, তাহলেই ছিল ভালো, সবার চোখের আড়ালে চিরদিনের জন্য সে হারিয়ে যেত, যেখানে কেউ থাকবে না।

কপালে কোমল হাতের ছোঁয়া পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই নাক ডাকাতে শুরু করলেন হাজি কলিমুল্লা। ওই শব্দটুকু বাদ দিলে, জোহরার মনে হল, তার পাশে শুয়ে আছে একটা মৃতলোক, বুক থেকে পা পর্যন্ত শাদা কাপড়ে ঢাকা। সে কোমল হাতটা ছাড়িয়ে কিছুক্ষণ চুপ হয়ে রইল। এরপর আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল। অতি সন্তর্পণে খিলটা খুলে উঠোনের একপাশে আমগাছতলায় এল।

'সারাদিন কোথায় ছিলে তুমি?' খালেদ চুপি চুপি বাড়ির ভিতরে ঢুকতেই সাঁ করে তার সামনে গেল জোহরা, চাপা-গলায় বলল,—'না খেয়ে থাকতে খুব ভাল লাগে, না?'

কথা বলার চেষ্টাও না করে খালেদ থ' হয়ে রইল। হঠাৎ ডান হাতটা তুলে ওর গালে একটা চড় মেরে ক্ষিপ্তের মতো জোহরা বলল,—'আমি আর এত কষ্ট সইতে পারব না। বাড়ি থেকে চলে যাও তুমি!'

কাপড় দিয়ে মুখটা ঢেকে ও প্রায় দৌড়ে উঠে গেল বারান্দায়, ঘরের ভিতরে গিয়ে খিল এঁটে দিল।

খালেদ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল। তার দুই চোখ থেকে ঝর্‌ঝর্ করে পানি পড়ছে, কণ্ঠরোধ হয়ে আসছে। ভোর বেলায় অন্যেরা ঘুম থেকে ওঠার আগেই সে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল, নদীর ধারে ধারে জমির আলের ওপর দিয়ে মিছিমিছি সে হেঁটে বেড়াল, এর পর চলে গেল বন্দরে, তার বড় দুই ভাই সেখানে কাজ করেন, সেই গদিতে; কিন্তু কোথাও মন টিকলো না। শেষ পর্যন্ত কী যেন এক অজানা আকর্ষণে বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়েছিল।

শুক্রবারে রাত বারোটা বেজে গেলে একে একে সবাই গিয়ে হাজির হল মৌলানা মহীউদ্দিনের বৈঠকখানায়। এর আগেই কানাঘুষার মারফতে ব্যাপারটা সারাগ্রামে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সবার তো আর বিচারের ক্ষমতা নেই? আজকের মজলিস শুধু গ্রামের আলেম মণ্ডলী ও মাতব্বরদের নিয়ে। দরজা-জানালা বন্ধ করার পর আসামীদের মাঝখানটায় বসিয়ে তাঁরা আলোচনা শুরু করলেন।

তিনদিন তিনরাত্রি হাদিস-কিতাব ঘেঁটে একটা ফতোয়া তৈরী করেছিলেন হাজি কলিমুল্লা। মৌলানার অনুমতি নিয়ে তিনি তা পড়ে শোনালেন।

বাতাসী অনেক আগে থেকেই বিনিয়ে বিনিয়ে ওনওন করছিল, এবারে ডুকরে

কেঁদে উঠল। বিলাপ করে বলতে লাগল, 'ও মা গো, এ-ও আমার কপালে ছিল গো! আঁতুড়ঘরে কেন মুখে নুন দিয়ে মেরে ফেললে না গো!'

'এই বেটি, কান্না থামা!' হাজি ধমক দিয়ে উঠলেন। বললেন,—'সে সময় বুঝি খুব ফুর্তি লেগেছিল?'

মৌলানা মহীউদ্দিনকে বেশ চিন্তিত মনে হল। তাঁর সৌম্য মুখমণ্ডলে বেদনাতুর গাম্ভীর্যের কান্তি। ধীরে ধীরে মুখ তুলে তিনি শান্ত গলায় জিগগেস করলেন,—'কিগো, তোমার কিছু কওয়ার আছে?'

'কি কইব বাবা, আপনারা তো গরিবের কথা বিশ্বাস করেন না। আমরা তো মানুষই নই, কুকুর বেড়াল! আমাদের আবার ইজ্জত কি!' বাতাসী চোখ মুছে বলল,—'না হলে এমন বদনাম আপনারা আমার উপর ফেলতে পারতেন!'

'কিন্তু এসব কথা তো আর আসমান থেকে পড়ে না!' হাজি কলিমুল্লা বললেন,—'অন্য কারো নামে তো ওঠেনি?'

'সে আমার কপালের দোষ। না হলে, ও বেঁচে থাকতেই আমি কতবার বমি করেছি, প্রতিরোজ পোড়ামাটি আর তেঁতুল না খেয়ে থাকতে পারিনি—এসব জিনিস কারো চোখে পড়ল না!'

একটা ময়লা কাঁথা গায়ে জড়িয়ে বসে বসে কোঁকাচ্ছিল বাতাসীর মামাতো ভাই রহিমদ্দি। তাকে সওয়াল করলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল শুধু।

বিচারের আলোচনা যখন এগিয়ে চলছিল, তখন দক্ষিণ দিক থেকে পালে পালে কালো মেঘ এসে সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলছিল। চাঁদ বারে বারে আড়ালে পড়ছে, গাছপালা ও খামারে নদীতে আলো-ছায়ার লুকোচুরি।

এক সময় বাতাস বন্ধ হয়ে গেল, অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল সারাটা প্রকৃতি। ঘরবাড়ি কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে মাঝে মাঝে গুরু গুরু আওয়াজ উঠল, সঙ্গে সঙ্গে চমকাল বিদ্যুৎ। ঘরের ভিতর সবাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল।

ঠিক এমনি সময় হাজি সাহেবের বাড়ির পিছনটায় আমগাছের নীচে দাঁড়িয়ে ছিল একটি মানুষের ছায়ামূর্তি। পা টিপে টিপে খোলা জানালার কাছে এসে অনেকক্ষণ সন্ধানী দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। ঘরের ভিতরে আলো নেই; নাম না জানা অরণ্যের ভিতর কোনো প্রেতপুরীর মতো সমস্ত বাড়িটা রুদ্ধ-নিশ্বাসে ঝিম ধরে আছে।

জানালা থেকে সরে এসে মূর্তিটা ভিটির ধার ঘেঁষে চলতে শুরু করল,

রান্নাঘরের পাশ দিয়ে ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। একেকবার বিজলি চমকায়, আর সে যেন শিউরে উঠে গভীর আতংকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বাতাস বইতে শুরু করল, মেঘে মেঘে সংঘাতে গর্জনে চারদিক তোলপাড় হতে লাগল। দরজাটা হয়তো ভেজানো ছিল, আচমকা দমকা হাওয়ায় তা' সশব্দে খুলে গেল। মানুষটা ত্রস্ত পদে এসে উঠল বারান্দায়। এদিক-ওদিক খানিক চেয়ে এক সময় মরিয়া হয়েই যেন ঘরে ঢুকে পড়ল। ওপরে নীচে কেবল শব্দ. শব্দ আর শব্দ। জোর বাতাসের তোড়ে একেবারে মোচড় খেয়ে ওঠে করগেটের চালগুলি, কাঠের বেড়ায় অবিরত ধুপধাপ আওয়াজ।

খাটের কাছে এসে ইতস্তত করতে লাগল মানুষটা, কি করবে যেন ঠিক করে উঠতে পারছি না। শরীরে রোমগুলি কাঁটা দিয়ে উঠেছে, ঢিবঢিব করছে হৃৎপিণ্ড, চিন্‌চিন্ করে মস্তিষ্কে রক্ত উঠে চোখ দু'টো ঝাপসা করে দিচ্ছে। তার ভাবনা, কোথায় এল সে। একি জন্ম, না মৃত্যু? একি সব হারানোর হাহাকার, না মিলনের উন্মত্ত সংরাগ? কান পেতে সে যেন শুনল, চুড়ির রিনিঠিনি, এক গভীর শান্ত নিশ্বাস, কাপড়ের মৃদু খস্‌খস্! ঘ্রাণ আস্‌ছে। একি আমের বোলের, না চুলের গন্ধ? না, না এখানে নয় এতো সে চায় না, চাইতে পারে না।

এক পা দু'পা করে সে পিছিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় অনুভব করল, একটা সুপুষ্ট নগ্ন মসৃণ হাত অন্ধকার থেকে উঠে এসে গানের কলির মতো পরম আশ্বাসে তার হাতকে আকর্ষণ করল।

তখন সমস্ত আকাশে মেঘেদের হুড়োহুড়ি লুটোপুটি লেগে গেছে, মন্দ্রগর্জনে একেবারে কেঁপে কেঁপে উঠছে সারা পৃথিবী। একটানা ঝড়ের তীব্র বেগে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে গাছপালা; মত্ত হয়ে কে যেন লেগেছে লুণ্ঠনের উচ্ছৃঙ্খল তৎপরতায়। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল মন্থন করে যেন মহাপ্রলয়ের উচ্চকিত শব্দের ভয়ংকার-সুন্দর রাগিনী!

এইভাবে কতক্ষণ ঝড় চলল হয়তো কেউ বলতে পারবে না। বাতাস যখন কমতে লাগল, তখন অযুত মুক্তাবিন্দুর মতো নামল বৃষ্টি।

ধোরাল হাওয়ার সঙ্গে প্রথম যখন বৃষ্টি নামল, তখন তাতে রইল শুধু নবজাতকের বিক্ষোভ, ঘর-বাড়ির ওপর দিয়ে শুধু ঝর ঝর ঝাপটা দিয়ে গেল। কিন্তু বেশিক্ষণ এ রইল না। ধ্রুপদ সংগীতের বিলম্বিত লয়ের মতো বাতাস যতই কমতে লাগল, বর্ষণে ততই এল নিবিড়তা। এর পর শুধু ঝম্‌ঝম্ শব্দ।

এইভাবে কতক্ষণ কেটে গেল জানা নেই। এক সময় খোলা দরজা পার হওয়ার পরে উঠানে নেমে বৃষ্টির মধ্যে দিয়েই টলতে টলতে উত্তর ভিটির ঘরের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল মানুষটা। তার পিছনে পিছনে এসে জোহরা এলোমেলো কাপড়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল। তার শরীর ভিজে যেতে লাগল বৃষ্টির ছাটে।

খানিকক্ষণ পরে একটা ছাতা মাথায় ঘাড় নীচু করে ধুঁকতে-ধুঁকতে বাড়িতে ঢুকলেন হাজি কলিমুল্লা। হঠাৎ তাকে দেখতে পেয়ে জোহরা বলে উঠল,—'অত দেরি যে! আর এদিকে আমার বড্ড ডর লাগছে।'

'কি আর করি বল, আপদ চুকিয়ে এলাম!' ছাতাটা বেড়ায় ঠেস দিয়ে রেখে হাজি বললেন,—'সে একটা পাঁড়-হারামজাদী, শেষ পর্যন্ত কিছুতেই দোষ স্বীকার করল না। কিন্তু বাতাসীর মতো মেয়েলোকের ফা-ফুই বুঝি আমি ধরতে পারি না? দু'টোকে দিলাম পঞ্চাশ জুতো করে, তার ওপর কালকে গাঁ ছেড়ে চলে যাবে। দেখলে আল্লার রহমৎ? সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি নামল।'

'হ্যাঁ তাইতো বড় তাজ্জব ব্যাপার!' কথাটা শেষ করে ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টির মধ্যে বারান্দা থেকে উঠানে নেমে গেল জোহরা, তার অঙ্গভঙ্গি রহস্যময়।

হাজি হৈ হৈ করে উঠলেন,—'আরে, আরে করছি কি? তুমি পাগল হলে না-কি? এত রাত্রে ভিজছ সর্দি করবে যে।'

'না, সর্দি আমার কোনো কালেই করে না।' জোহরা বারান্দার কাছে এল। চোখের উপর থেকে একরাশ চুল ডান হাতে সরিয়ে ফোটা-ফুলের মতো উচ্ছল মুখটা তুলে মধুর হাসি-ওপচানো-ঠোঁটে বললো,—'আপনি জানেন না? বছরের পয়লা বিষ্টি, ভিজলে খুব ভালো। এতে যে ফসল হবে।'

পুঁইশাক

আতোয়ার রহমান

ইস্কুল নিয়ে এতো কাণ্ড। অথচ সবাই নির্বিকার।

বাঘবন্দী খেলাটা জমে উঠেছে টুনু আর সানির মধ্যে। চারপাশে গোল হয়ে বসেছে আর-আর ছেলেমেয়েরা। সানি হারছিলো বাঘ নিয়ে। দুখো খাচ্ছে এখন, ছোঃ, ও আবার একটা বাঘ নাকি? মরা কেঁদো। ছাগলের গুঁতোতেই ত্রিভুবন পার।

এরই মধ্যে একবার পেছনের দিকে চেয়ে নিয়ে হঠাৎ রাণু বলে উঠলো, ত্রিভুবন পার করাচ্ছে, দাঁড়াও! ছাগল-খেকো শাক আসছে!

চক্ষের নিমেষে ভেল্‌কি খেলে গেল। বাঘ-ছাগল এক সাথে ছিটকে দলের সবচেয়ে হ্যাংলা ছেলে রাশু ছেঁড়া 'বর্ণ পরিচয়' প্রথম ভাগ খুলে সুর ধরে দিলো, হ্রস্ব-ই ট ই-ট, হ্রস্ব-উ ট উ-ট।

ফ্রকের কোণটা মুখের ভেতর গুঁজে দিয়ে মিটমিটিয়ে রাণু বললো, দিই বলে? পুঁইশাক আজ চিবিয়ে খাক তোদেরই।

সবকটি চোখ একবার ওঠা-নামা করলো। না, পুঁচকে ছুঁড়িটাকে আর জব্দ করবার সময় নেই। পুঁইশাক এখন আঙিনার মধ্যে।

পুঁইশাক অর্থাৎ জমীর পণ্ডিত এসে পড়লেন। মাঝারি গোছের আধমোটা, গৌরবর্ণ মানুষটি। মুখে একরাশ শাদা দাড়ি। বড়ো বড়ো চোখ দুটি শুকতারার মতো দপ্‌ দপ্‌ করে। সাধারণত সবাই ডাকে 'পণ্ডিত সাহেব' বলে। চাষী ঘরের ছেলেমেয়েরা সংক্ষেপে বলে 'পন সাব'। এর থেকে কবে যেন ঠিক মনে পড়ে না এখন আর, কোন দুষ্টু ছেলে শ্লেটের আড়ালে মুখ লুকিয়ে উপনামটা প্রথম উচ্চারণ করেছিলো, পন সাব না, পুঁইশাক।

জমীর পণ্ডিতকে দেখে পড়তে পড়তেই উঠে দাঁড়ালো সবাই। চোখ তুলে চাইলো একবার। ভাঁজ-ভাঙা পুরোনো কোট, ক্ষারে-কাচা শাদা লুঙ্গি। কাঁচা চামড়ার পানাইয়ের বদলে পায়ে আজ মোটর-টায়ারের স্যাণ্ডাল। চোখ আর নামতে চায়না কারো।

একবার এদিক-ওদিক চেয়ে নিয়ে ধমকে উঠলেন জমীর পণ্ডিত, পিট্ পিট্ করে দেখছিস কি, উদ্‌বেড়ালের দল? দরজা খোল্। সেকেণ্ড পণ্ডিত আসেনি এখনো?

ভয়ে ভয়ে হাত বাড়িয়ে রাণ্ড সবিনয়ে বললো, চাবি, প'ন সা'ব।

চাবি দিতে গিয়ে একেবারে আঁতকে উঠলেন জমীর পণ্ডিত, অ্যাঁ, করেছিস কি, গাধার দল? সাকুল্যে মোটে তেরোজন? বলি, আমি কি শেয়াল-পণ্ডিত যে ইন্‌স্‌পেক্টর-কুমীরকে তিরাশিজন দেখিয়ে দেব? বেরো, হতভাগারা। বেরো এখান থেকে।

বেরুলো না কেউ। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো। শেয়াল-কুমীরের গল্পের প্রসঙ্গে হাসি আসছিল ওদের। ধমক শুনে সেটাও চেপে যেতে হল।

পণ্ডিত 'হায় হায়' করেই চলেছেন, সব গেল, স-ব। নিজেও ম'লো, আমাকেও মারলো। ঘুন লাগুক এমন ইস্কুলে।

রাণ্ডই উঠে দাঁড়ালো সাহস করে, প'ন সা'ব, যাই না বাড়ি বাড়ি থেকে ধরে আনিগে। টুনুও যাক আমার সাথে।

এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন পণ্ডিত। তারপর আবেগের সাথে জড়িয়ে ধরলেন রাণ্ডকে। হাত বুলিয়ে আদরে আদরে ভরে দিলেন মাথাটা, আহা-হা বেঁচে থাক বাবা, বেঁচে থাক। আমার চুল-দাড়ির মতো পরমায়ু দিক তোকে আল্লা। বড়ো ভালো বুদ্ধি বার করেছিস। শিগগির যা। আঁটকুড়ের বেটা খাবার বেলা একটার মধ্যেই এসে পড়তে পারে। আর, দেখবি তো, সেকেণ্ড পণ্ডিতের কি হল?

রাণ্ড-টুনু বেরিয়ে গেল এক দৌড়ে।

পণ্ডিত উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ডাক দিলেন, রাণু, শিগগির বাক্‌স খোল্। নামের খাতা বার করিসনি এতক্ষণও?

রাণুর দোষ নেই। চাবি পায়নি। কিন্তু জমীর পণ্ডিতের আজ আর তর সইছে না। না সইবারই কথা। চল্লিশ বছরের ইস্কুল। এর প্রতিটি দিনের স্মৃতিতে স্বাক্ষর রয়েছে জমীর পণ্ডিতের। মা যেমন শিশুকে মানুষ করে তোলে, তিনিও তেমনি তৈরী করে তুলেছেন এই ইস্কুলকে। একে কি ছাড়া যায়, না, ভোলা যায়? অথচ ষড়যন্ত্র চলেছে তারই।

আইন হয়েছে নতুন, জমীর পণ্ডিত শুনতে পান,—সক্রোধে বিদ্রূপ করে বলেন, আইন্ নয়, পাগলা বাইন মাছ ছাড়া পেয়েছে, আঁচড়ে বেড়াচ্ছে,—ঘন ঘন পাঠশালা রাখা চলবে না কোনো এলাকায়, যদি না ট্রেনিং-পাওয়া

শিক্ষক থাকে। সাহায্য করা দুঃসাধ্য, ব্যবস্থাও অনিয়ন্ত্রণীয়। সুতরাং দু'টো চারটে এবার উঠিয়ে দিতেই হবে।

বাজারে গুজব,—রটিয়েছে ওই নতুন পাড়ার ছোঁড়াগুলো, যারা হুজুগ করে একটা পাঠশালা খাড়া করেছে এই সেদিন, যতো রাজ্যের বোকাগুলোকে ধরে এনে বিনে পয়সার মাস্টার বানিয়েছে,—হ্যাঁ, বাজারে গুজব, জমীর পণ্ডিতের ইস্কুল এবার উঠেই যাবে। কারণ, পণ্ডিতের মতো ইস্কুলও এখন জীর্ণ। চৈত্রের পদ্মায় পাড়ির নীচে হাওয়া লেগে ঝুর ঝুর করে বালি ঝরে পড়ে, গাঙশালিকগুলো বেগতিক দেখে গর্ত ছেড়ে উড়ে পালায়। ওই উপমাটাই লোকে ইস্কুলের উপর প্রয়োগ করে। দেয়ালের বালি ঝরছে তো ঝরছেই হাওয়ায়, হয়তো বা পণ্ডিতের বিশ্বাসেও। ছেলেমেয়েরা সরে পড়ছে একে একে। পণ্ডিত সাহেব,—গ্রামীণ সংক্ষিপ্ত রূপ প'ন সা'ব,—এবার আপনিও সরে পড়ুন,—আড়াল-আবডাল থেকে দুষ্টুলোকের কথা শোনা যায়, বাতের ব্যথাটা আর বাড়াবেন না এই বয়সে ইস্কুলে বসে থেকে। এদের নাকি ষড়যন্ত্র,—ইন্‌স্‌পেক্টর পাঠিয়ে তদন্তের নামে একটা শাক-দিয়ে মাছ-ঢাকা কাণ্ড করা। কিন্তু দেখে নেবেন জমীর পণ্ডিতও, কার পেটে কটা 'ক'। অমন অনেক ইন্‌স্‌পেক্টর তাঁর দেখা আছে। অনেক ঘুঘু দেখেছেন তিনি। আজকালকার এরা আবার জানেই বা কি?

চিন্তায় থম্‌থম্ করে পণ্ডিতের মুখখানা। রাশু-টুনুকে আদর করতে দেখে ছেলেমেয়েরা সাহস পেয়েছিলো একটু। আবার ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে পড়ে। পড়াশোনায় অবধি ভুল হয়। কিন্তু জমীর পণ্ডিত সামান্য ধমকটিও দেন না।

ইস্কুলের সামনে দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ। ফসল নেই এখন, চষা-মাটির বুকে ছড়িয়ে রয়েছে শুধু ছোটো-বড়ো মাঝারি ঢেলা। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় বেলে পাথরের চাঁই পড়ে রয়েছে বুঝিবা। মাঝে মাঝে বাবলা আর শিমুল গাছ। দূরে, বেশ খানিকটা দূরে পদ্মার ধু-ধু চর। আশে-পাশের গাঁয়ের মানুষের আশাপীঠ ওই মাঠ আর চর। চাষ করে ছেড়ে দিয়ে গেছে। কি ফসল ফলাবে, কে জানে।

ইস্কুল ঘরের দিকে তাকিয়ে জমীর পণ্ডিতের মনে হয়, এটাও যেন একটা মাঠ। কতদিন থেকে জ্ঞানের চাষ করে আসছেন তিনি এখানে। আশা করেছেন মানুষের 'ফলন' আনবেন। মাঠ এতদিন ফসল দিয়েছে, ইস্কুলও। কিন্তু এবার কি হবে? ইস্কুল সম্বন্ধে এবার এ-চিন্তা তাঁর মাথায় ঢুকেছে বিশেষ করে ইন্‌স্‌পেক্টর আসার পর থেকে।

: পণ্ডিত সাহেব, কি করছেন ?

চিন্তায় বাধা পড়লো জমীর পণ্ডিতের। চকিতভাবে পেছন ফিরে দেখলেন, জানলার পাশ থেকে উঁকি দিয়ে কথা বলছে ওপাড়ার হাশিম। নতুন পাঠশালার এক নম্বর পাণ্ডা। প্রশ্নটা বিদ্রূপের মতো মনে হল তাঁর কাছে। বললেন, গরু চরাচ্ছি। ইস্কুলে আর কি করে লোকে ?

হাশিম একটু অপ্রস্তুত হল ; কিন্তু সামলে নিল পরমুহূর্তেই, তওবা, তওবা, কি যে বলেন আপনি। ছেলেমেয়ে কাউকে দেখছিনে কিনা। তাই, ভাবছিলাম—

একটু থেকে আবার প্রশ্ন করলো, তা আজকাল আর বুঝি কেউ আসে না ? সেকেণ্ড পণ্ডিত সাহেবকেও দেখছিনে।

ইন্‌স্‌পেক্টর আসার পর থেকে একটু সকাল-সকালই আসেন জমীর পণ্ডিত। আশা নেই, বেশি করে খেটে ইস্কুলটাকে ভালো করে তুলবেন। কিন্তু অবস্থা খারাপ দেখে সেকেণ্ড পণ্ডিত প্রায়ই ছুটি নিয়ে বাড়িতে বসে থাকেন আজকাল। আর, ছেলেমেয়েরা আসে সেই আগের মতোই দেরি করে। পাড়াগাঁয়ের ছেলেমেয়ে, বাড়ির কাজ-কর্ম যথাসম্ভব সেরে তবে আসে। ধমক দিয়ে লাভ হয় না, দেওয়া উচিতও নয়। সংসারের অভাব-অনটন উপেক্ষা করে, কাজের চাপ লাঘব করে ওরা যে ইস্কুলে আসতে পারে শেষ পর্যন্ত, এই-ই তো অনেক। কিন্তু এসব কথা রাগ দেখিয়ে শোনানো চলে না হাশিমকে। বললেন, আসেনি এখনো, আসবে। সময় হলে তবে আসবে। ইস্কুল চালাচ্ছো হৈ রৈ করে, আর এটুকুও জানো না।

হাশিম এবার মুখ-চোখ করুণ করে বললে সহানুভূতিতে, পণ্ডিত সাহেব, ভুল বুঝছেন কেন আমায় ? আপনার চেয়ে বেশি বুঝি, এমন কথা বলে বেয়াদপি করতে চাইনে। এই ইস্কুলটা উঠে যাক, একি আমরা কামনা করতে পারি ? হাজার হলেও একই গ্রামের ইস্কুল তো! ইস্কুল যতো বেশি হবে, লেখাপড়াও ততো বেশি শিখবে গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা। গাঁয়েরই উন্নতি হবে।

জমীর পণ্ডিত তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করলেন, ইন্‌স্‌পেক্টর তোমাদের ওখানে গিয়েছিলো, না ?

: হ্যাঁ, আপনার এখানে কি বলে গেলো ?

: বলবে আর কি ? একি আর কানে কানে বলবার কথা ? যা বলবে, সবাই জানতে পারবে।

জওয়াব দিয়ে জমীর পণ্ডিত ভাবলেন, এ মন্দ হল না, জওয়াব দেওয়াও হল, এড়িয়ে যাওয়াও হল। ইন্‌স্‌পেক্টর যে কি বলবে, তা এখনো জানা যায়নি। ভালো কিছু যে রিপোর্ট দেবে না, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত না হলেও খারাপ কিছু যে বলবে না, এমন আশা তিনি করতে পারেন। তার কারণ, ইন্‌স্‌পেক্টরটিকে অত্যন্ত ভদ্র বলে মনে হয়েছে তাঁর। কাজও জানে। যতোক্ষণ ইস্কুলে ছিলো, রীতিমতো সশ্রদ্ধ এবং সহানুভূতিময় ব্যবহার করেছে তাঁর সঙ্গে। পাকিস্তানী আমলের হঠাৎ প্রমোশন পাওয়া ইন্‌স্‌পেক্টরদের মধ্যে এতোগুণ তিনি এর আগে আর দেখেন নি।

অবিশ্যি, একটা বিষয়ে খটকা রয়েছে তাঁর মনে। ইন্‌স্‌পেক্টররা এসেই চা-নাশতা চেয়ে বসে এখন। সে জন্যে এবার আগে থাকতেই চা আনিয়ে রেখেছিলেন রাণুদের বাড়ি থেকে। ইন্‌স্‌পেক্টর খাতাপত্র দেখবার সময় জমীর পণ্ডিতের ইঙ্গিত মতো রাণু এগিয়ে দিয়েছিলো মিষ্টি, ফলমূল আর ফ্লাস্কের চা। কাপে মুখ লাগিয়ে অন্যমনস্কভাবে ইন্‌স্‌পেক্টর বলেছিলো, বেলের শরবত গরম কেন?

রাণু মেয়েটি মুখরা। স্মিতমুখে চট করে বলে উঠেছিলো, না, সার এখো গুড়ে পানা।

এক মুহূর্ত রাণুর মুখের দিকে চেয়ে থেকে ইন্‌স্‌পেক্টর হেসে বলেছিলো, তা'হলে তো ছোবড়া বেছে খেতে হবে। আখ মাড়াইয়ের কলটা বোধহয় ভালো ছিলো না। তুমি দেখোতো এবার, একটা ছাঁকনি পাও কি না।

বলেই সে কাজে মন দিয়েছিলো।

কাপের মধ্যে সত্যি সত্যিই চায়ের একটা পাতা ভাসছিলো। রাণু সেটা উঠিয়ে নিয়েছিলো অতি সাবধানে, সন্তর্পণে।

শুধু এই ঘটনাটির জন্যেই ইন্‌স্‌পেক্টরের মন-মেজাজের নিশ্চিন্ত ব্যাখ্যা করে উঠতে পারেন নি আজও জমীর পণ্ডিত।

হাশিম আবার সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে বললো, ওপরে একটু খোঁজ-খবর নিলে হত না?

জমীর পণ্ডিত কি উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, থেমে গেলেন। রাণু এবং আরও কয়েকটি ছেলেমেয়ে এসে ঢুকলো ঘরে। এই ওদের স্বভাব,—নানান ছলে আসা। একা আসতে পারে না। ভালো লাগে না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে বন্ধু-বান্ধব একে-ওকে ডাকাডাকি করে দল বানিয়ে তবে আসে।

দেরি করে আসায় লজ্জিত বা অপ্রতিভ হল না। ছেলেমেয়েরা চুপচাপ

বসে গেল নিজের জায়গায়। শ্লেট বার করে হাতের লেখা লিখতে শুরু করলো। হাতের লেখা না দেখানো পর্যন্ত পড়া নেয়া হয় না কারো।

পেছন থেকে হাশিম বললো, আচ্ছা, আসি এখন, পণ্ডিত সাহেব। আপনি পড়ান।

জওয়াব দিলেন না জমীর পণ্ডিত, ঘুরে দেখলেন যদিও। অপসৃয়মাণ মানুষটির পিঠ থেকে তুলে নিঃসাড় দৃষ্টিটা পেতে দিলেন ঢেলা-ভরা দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠের ওপর।

ভেতরে বাইরে মাঠ। এবার কি ফসল ফলবে, কে জানে।

গুজব রটেছে গাঁয়ে, পুরনো ইস্কুলটাই উঠে যাবে, থাকবে নতুন পাড়ারটা।

জমীর পণ্ডিত পাকড়াও করেন গিয়ে চৌধুরী সাহেবকে, এর একটা বিহিত করতে হবে। এতোদিনের পুরোনো ইস্কুল, গাঁয়ের যতো শিক্ষিত ছেলে সব বেরিয়েছে এখান থেকে। পুঁচকে ছোঁড়াদের জ্বালায় এখন উঠে যাবে নাকি আপনারা থাকতেই?

চৌধুরী বেশির ভাগ সময়ই শহরে পড়ে থাকেন মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে। গাঁয়ের দিকে তাকানোর অবসর কম। বললেন, কি করতে বলেন?

বলবেন আর কি? করতে যা ইচ্ছে হয় জমীর পণ্ডিতই জানেন। দোর্দণ্ড প্রতাপে ইস্কুল চালিয়েছেন প্রায় সারা জীবন। নতুন ইস্কুলের পাল্লায় পড়ে এখন তাঁর ইস্কুলে ভাঙন ধরেছে। তারই সুযোগ নিয়ে বাড়ি বয়ে গিয়ে অপমান করে আসে হাশিমের মতো মানুষ। চাপা রাগে গর্জে উঠলেন জমীর পণ্ডিত, ছ্যাঁচড়াদের ধরে 'চৌদ্দো-পো' করে দাঁড় করিয়ে রাখুন সত্তর দিন, ইস্কুল বাঁচাবার ব্যবস্থা করুন। আমার ছেলেমেয়ে পড়ে না ওখানে, পড়ে আপনাদেরই ছেলেমেয়ে।

চৌধুরী ভয়ে ভয়ে বললেন, কিন্তু ইন্‌স্‌পেক্টরের রিপোর্ট—

: রিপোর্ট বেরোয়নি এখনো, কবে বেরুবে খোদাই জানে। আপনি টাউনে খোঁজ নিন। দরকার হ'লে আমি গাঁয়ের লোককে দিয়ে দরখাস্ত করাবো।

ওই এক ভরসা আছে জমীর পণ্ডিতের। গাঁয়ের অনেক লোকই এখনো তাঁর পক্ষে। এমন কি, ইস্কুল দু'টিকে কেন্দ্র করে রীতিমতো দুটি দল গড়ে উঠেছে। পথে-ঘাটে তাদের ঝগড়া শুনতে পান তিনি অহরহ। জিনিসটা তাঁর ভালো লাগে না। লেখাপড়া পবিত্র কাজ। তার জন্যে ঝগড়া হবে; এ তাঁর কাছে অসহ্য মনে হয়। আর ঝগড়া করবার আছেই বা কি? তিনি তো চান না যে, নতুন পাড়ার ইস্কুল উঠে যাক। ইস্কুল যত বাড়ে, ততোই ভালো।

নতুন পাড়ার লোকেরাও কি তা বোঝে না? বোঝে, তবু আলগা ফুটোনি করে তাঁকে ঠাট্টা করে এলো সেদিন হাশিম। সরকার শিক্ষক দিতে পারবে না? সাহায্য দিতে পারবে না অতো? বয়ে গেছে তাতে, এতো দিনই বা সরকার কি করেছিলো সাতটাকা করে সাহায্য দেওয়া ছাড়া? ছয় মাস, এক বছর পর পর সেই সাতটা টাকা পেয়েও যদি ইস্কুল চলতে পারে, তাহলে এমনিতেও চলবে। শিক্ষক যদি ওপরওয়ালারা দিতে পারে ভালোই। তিনি সানন্দে ছেড়ে দেবেন ইস্কুল। না দিতে পারে, দোষ নেই তাতেও। সে-রকম দুর্ঘটনা ঘটলে,—জমীর পণ্ডিত আজকাল প্রায়ই ভাবছেন,—নিজেই চালিয়ে যাবেন ইস্কুল, যতদিন বাঁচেন। আল্লার ইচ্ছে থাকলে খরচের জন্যে কাজ আটকে থাকবে না। ইস্কুলের ভবিষ্যত সম্বন্ধে যারা সন্দেহ প্রকাশ করেছে, তাদের তিনি জানিয়েও দিয়েছেন সে কথা। এসব কি বোঝে না হাশিম? বোঝে, গাঁয়ের লোকেও বোঝে। তবু ঝগড়া করে।

এসব ঝগড়া খারাপ লাগে জমীর পণ্ডিতের। কিন্তু আবার ভরসাও আসে এরই মধ্যে থেকে। গাঁয়ের লোকের মতামতটা একেবারে খেলো নয়। ট্রেনিং বা উচ্চশিক্ষা পাননি বলেই তাঁর এতোদিনের অভিজ্ঞতাও সরকারী মাপকাঠিতে রাতারাতি কুঁচিয়ে ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে না। ইস্কুলে যে ছেলেমেয়ে বেশি আসতে পারে না, সেও তো তাঁর দোষ নয়। ওটা একেবারে আলাদা জিনিস। ছেলেদের ইস্কুলে দেওয়ার মতো পেটের ভাত কয়জনের বাকি রয়েছে? ছাত্রের অভাব ঘটেছে বলে যারা ইস্কুল তুলে দিতে চায়, তারাই-বা কয়জন খোঁজ রাখে এসবের? আশ্চর্য,—জমীর পণ্ডিত মনে মনে বলেন,—আশ্চর্য এই মানুষগুলো!

চৌধুরী বললেন, আচ্ছা, আমার সাধ্যে যতদূর কুলোয়, তার ত্রুটি হবে না। আপনি ব্যস্ত হবেন না, পণ্ডিত সাহেব। চা খাবেন একটু? দাঁড়ান। রাণু, চা নিয়ে আয়তো মা, কাপ দুয়েক।

কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন জমীর পণ্ডিত, একটা গোলমাল শুনে থেমে গেলেন। বাড়ির পাশেই কোথায় যেন একদল ছেলে চেঁচামেচি করছে। কান পেতে শুনতেই স্পষ্ট হয়ে উঠলো ছড়া,—

পুরোন পাড়ার পাঠশালা,—
পুঁই-মাচানে আটচালা!
বেঞ্চিগুলো সরু সরু,
ছাত্রগুলো আদত গরু!

সঙ্গে সঙ্গে টিটকারী-সহ আরেক দলের উত্তর এল,—

নতুন পাড়ার পাঠশালা,—
চালে খালি বারজালা,
মাস্টারগুলো বকের ঠ্যাং
ছাত্র ডাকে ঘ্যাঙর ঘ্যাং।

খোঁচা-খাওয়া বাঘের মতো লাফিয়ে উঠলেন জমীর পণ্ডিত, কি! এতো দূর আস্পর্ধা! শিক্ষার নামে এতো নোংরামি শিখছে সব! এক্ষুনি দিচ্ছি ঠাণ্ডা করে।

চোখের পলকে উঠে দাঁড়ালেন হারেশ চৌধুরীও। তাঁর মোটা কোমরটা জড়িয়ে ধরে বললেন, পণ্ডিত সাহেব, কি করছেন?

: না, না, ছেড়ে দিন আপনি, শিগগির ছেড়ে দিন। এ নোংরামির শাস্তি দিতেই হবে।

বুড়ো মানুষের গায়ে অসীম শক্তি। দোর্দণ্ড প্রতাপ, চেহারা দেখেই বাড়ির লোক থেকে শুরু করে ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত তটস্থ হয়ে ওঠে, যা ফেটে আবার আকস্মিক ভাবে গড়িয়ে পড়ে স্নেহের ধারা,—অতএব যে চেহারা ভয়ঙ্কর ভাবে রহস্যময় সেই চেহারা থেকে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। দাড়ি-গোঁফ যেন সেই আগুনের শিখা। ভয় পেয়ে গেলেন হারেশ চৌধুরী নিজেও। এ-মানুষকে ছেড়ে দেওয়া চলে না কক্ষনো। প্রাণপণে কোমর টেনে ধরে বললেন, জোড় হাত করছি, পণ্ডিত সাহেব, দোহাই আপনার—

রাণু এসে পড়েছে ইতিমধ্যেই। কিছুই বুঝতে পারেনি সে। বাপের দেখাদেখি শুধু চেঁচাতে লাগলো, যাবেন না, পণ্ডিত সাহেব। নতুন পাড়ার ওদের ছড়া শুনেই তো এরা ছড়া বেঁধেছে। যাবেন না আপনি—

দোহাই শুনে থেমে গেলেন জমীর পণ্ডিত। বেগতিক বুঝে পক্ষ-বিপক্ষের সমস্ত ছেলেও ততক্ষণে সরে পড়েছে। চৌধুরীর দিকে ফিরে তিনি বললেন, কি জঘন্য বেয়াদব! আমি ওদের মুরুব্বী নই? ওদের বাপ চাচাকে পড়াইনি?

: কাজটা ওদের নিশ্চয়ই অন্যায় হয়েছে। কিন্তু ছেলেমানুষ সব। অতো জ্ঞানই যদি থাকবে, তা'হলে আর লেখাপড়ার কি প্রয়োজন ছিল? আপনি ব্যস্ত হবেন না। ইস্কুলেও তো বলে দিতে পারবেন কিংবা বাপ-মাকে—

: হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই করবো। বাপ-মাকে শুদ্ধ আমি আবার টেনে আনব ইস্কুলে। দেখে নেবেন আপনি।

পেছন ফিরে চৌধুরীর দিকে তাকাতে গিয়েই চোখে পড়ে গেল রাণু। তখনি প্রচণ্ড ধমক লাগালেন তাকে, কি দেখছিস, হতভাগী মেয়ে? যা পড়গে যা!

হন হন করে বেরিয়ে পড়লেন তারপরই। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উঠলেন বাড়িতে। পুত্রবধূ উঠোনে ধানে পা দিচ্ছিল আস্তে আস্তে। নেহাতই নতুন বউ, বিয়ের পর এই প্রথম এসেছে শ্বশুরবাড়ি। তাকেও ধমকে উঠলেন, খেলা করা হচ্ছে?

চমকে উঠে বেচারী পা চালিয়ে দিল অসংযত জোরে। উঠোনময় ধান ছড়িয়ে পড়লো।

পড়ানোর শেষে বহুদিন পর আজ গল্প বলছিলেন জমীর পণ্ডিত। সেকেণ্ড পণ্ডিত আগেই ছুটি নিয়ে চলে গেছেন। সমস্ত ছেলেমেয়ে জড়ো হয়ে এসে বসেছে। শুনছিল উৎসাহ ভরে। কিন্তু গল্প শেষ করবার আগে হঠাৎ চোখে পড়ে গেল পেছনের বেঞ্চির দিকে। দেখলেন, রাণু ঘুমিয়ে পড়েছে।

অনেকদিন আগে—তখন ইস্কুল নতুন খোলা হয়, সেই সময় তাঁর প্রথম অভ্যেস হয় পড়ানোর শেষে গল্প বলা, সহজ কথার ছলে কঠিন জিনিস বুঝিয়ে দেওয়া। মন তখন তাঁর স্বপ্নে বিভোর, আদর্শের উন্মাদনায় মাতাল! কান পেতে শুনতো সবাই, তাঁর স্বাভাবিক গাম্ভীর্য সত্ত্বেও। ইস্কুলের প্রতি, পণ্ডিতের প্রতি তাতে টান বেড়েছিলো ছেলেমেয়েদের। কিন্তু বেশিদিন সেই গল্প বলা চলেনি। একদা আকস্মিক পরিদর্শনে এসে কোনো ইন্‌স্‌পেক্টর তাঁকে দেখে ফেলেছিলেন গল্প বলতে। ইস্কুলের তখন জোর সুনাম। তাঁরই মেহনতের গুণে। সুতরাং কারো কিছুই হল না, হল গল্প বন্ধ।

আজ আর এক কারণে ধমক দেওয়ার প্রবৃত্তি হল না জমীর পণ্ডিতের। সবাই শত্রুতা করেছে তাঁর সঙ্গে। কিন্তু তাই বলে অধৈর্য হলে তো চলবে না। রাণুকে ইঙ্গিত করলেন শুধু।

রাণু চোখ রগড়ে সোজা হয়ে বসতেই বললেন, তোদের বড্ড কষ্ট হচ্ছে, না? আচ্ছা, এবার থেকে সপ্তাহে একদিন করে ছুটি দেব ডাংগুলি খেলার জন্য।

সত্যিই নিরেট মাথা রাণুর। বিদ্রূপটা বুঝলো না। পিট পিট করে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কাল ছুটি প'ন সা'ব?

হাল ছেড়ে দিলেন জমীর পণ্ডিত। ছুটি দেওয়ার শেষ আয়োজনে সারাদিনের জমানো নালিশ শুনতে চাইলেন এবার, থাক ও সব, কার কি নালিশ বল দেখি এখন।

নালিশ নিয়ে এল রাশুই প্রথম, প'ন সা'ব, কাল হাটে ফরিদ আমার আধসের শিম ভেঙে নষ্ট করে দিয়েছিলো!

নৈতিক দায়িত্বে ঘরে বাইরে সমস্ত বিচারের অধিকার নিয়েছেন জমীর পণ্ডিত। কিন্তু নালিশের ধারা দেখে শিউরে উঠলেন। ইস্কুল উঠে গেলে এদের কি হবে? সংক্ষেপে জিজ্ঞেস করলেন, কার শিম রে, ফরিদ?

উত্তরও দিল রাশুই, আমার সীম, প'ন সা'ব। বেচতে গিয়েছিলাম।

বাজার-দর যাচাই করে পণ্ডিত ভরিমানা করলেন ফরিদকে, দুটো পয়সা এনে দিবি কাল।

বিচার শেষ হতেই নজরে পড়লো, কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজার ওপাশে। মিটিমিটি হাসছেও বুঝিবা। গম্ভীর গলায় হাঁক দিলেন, কে?

এগিয়ে এলো ফরিদের বাপ। মাথা চুলকে বললো, একটা কথা ছিলো প'ন সা'ব। ফরিদের—

: কি হয়েছে ফরিদের?

: জী গেরস্ত ঘরের ছেলে,—কাজ-কর্ম বেড়ে গেছে এখন—

এক মুহূর্তে সব পরিষ্কার হয়ে গেল জমীর পণ্ডিতের কাছে। তিক্তকণ্ঠে বললেন, এ-গাঁয়ের আর কোনো গেরস্থর ছেলে লেখাপড়া শেখেনি?

ফরিদের বাপ আবার মাথা চুলকে শুধু বললো, জী—

নিজের কাজের কথায় এসে এবার জমীর পণ্ডিত পাল্টা আক্রমণ চালালেন। হায়েশ চৌধুরী তদবির করছে শহরে। গ্রাম থেকে এক লাখ দরখাস্তও লেখা হয়েছে। সেখানা সকালবেলা ফরিদের বাপের হাতেই দেওয়া হয়েছিলো সই নেবার জন্যে। তারই ফলাফল জানতে চাইলেন এখন, সই নেওয়া শেষ হয়েছে?

ফরিদের বাপ ভয়ে ভয়ে বললো, জী না। দিতে চায় না। বলে—

: দিতে চায় না! কি বলে?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন জমীর পণ্ডিত। ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো ফরিদের বাপ, ইতস্তত করে একবার ছেলেমেয়েদের দিকে তাকালো। তারপর মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে বলে যেতে লাগলো, বলে যে, উনি আর পড়াবেন কি করে? বুড়ো মানুষ, মাথার ঠিক নেই। তার উপর বাতের রোগী। নামাজ পড়ার সময় সেজদা দিয়ে উঠে সোজা হয়ে বসতেও পারেন না। হাঁটুতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। সারাজীবন ছাত্রদের 'নিল ডাইন' করিয়ে এসে এখন প্রায়শ্চিত্ত করছেন—

: কি—কি বললে ?

ধমক দিলেন বটে জমীর পণ্ডিত। কিন্তু পরেই একেবারে স্তম্ভিত হয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত।

ফরিদের বাপ কি যেন বলতে যাচ্ছিল আবার। কিন্তু বাধা দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন জমীর পণ্ডিত, থাক, থাক, আর বলতে হবে না। ভুল আমারই হয়েছে। হবে না ? খন্তার কাজ নরুন দিয়ে হয় কখনো ? কোথায় সে দরখাস্ত ? বার করো, বার করো শিগগির।

ফরিদের বাপ হাতের মুঠো থেকে একখানা মোচড়ানো কাগজ বার করে দিলো। হঠাৎ ইস্কুলের ছুটি দিয়ে জমীর পণ্ডিত বেরিয়ে পড়লেন।

ইস্কুলের সিমেণ্ট ওঠা বারান্দায় পায়চারি করছেন জমীর পণ্ডিত। পায়চারি করছেন বেলা নয়টা থেকে। এখন হয়তো বারোটা বাজে। ভাবছেন, এতো বেলা হল, তবু ছেলেমেয়েরা আসছে না কেন ? সময়-জ্ঞান আর এদের কোনোদিন হবে না দেখছি। না কি, বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধরে আনতে হবে সকলকে ?

ভাবতে ভাবতে চকিতে একটা সন্দেহ দেখা দিলো মনে। অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলেন তিনি। তবে কি—গাঁয়ে খবর রটে গেছে, এ ইস্কুল সত্যি সত্যিই উঠে যাবে। ইন্‌স্‌পেক্টরের অফিস থেকে খোলাখুলি কোন চিঠি অবশ্য এখনো আসেনি। হারেশ চৌধুরী চিঠি দিয়েছেন কয়েকদিন আগে। তিনিও পরিষ্কার করে কিছু জানাননি। কিন্তু যা আভাস দিয়েছেন, তাও ভরসাজনক নয়। এদিকে নতুন পাড়ার ইস্কুলে নাকি খবর এসে গেছে, তাদের ইস্কুল থাকবে। তার মানেই হল—

গাঁয়ের পথে বেরুনো এখন দায় হয়ে উঠেছে তাঁর পক্ষে। নতুন পাড়ার দল তো আছেই। তারপর, যারা এতোদিন ছিলো তাঁর পক্ষে, বোধ হয় বিফল হওয়ায় তারাও সরে পড়েছে। চক্ষুলজ্জায় সই দিয়েছিলো বোধহয় তখন। কেউ কেউ আবার নানান ছলে নতুন পাড়ার ইস্কুলে ছেলেমেয়ে পাঠাতে শুরু করেছে। যেমন ফরিদের বাপ। কেউ কেউ বা মুখের উপরই পষ্টাপষ্টি বলে দিয়েছে, তখনই তো বলেছিলাম, প'ন সা'ব, লাভ হবে না দরখাস্ত করে।

কিন্তু লাভ যে হবে না তাই বা কে জানে! সত্যি খবর তো কেউই জানে না এখনো। যদি জানবেই, তাহলে এদিকে আট দশদিন ধরে কেন কতকগুলো লোক ছেলেমেয়েকে আসতে দিচ্ছে তাঁর ইস্কুলে ? ইচ্ছে করে তো কেউ নিজের ছেলেমেয়ের মাথা খেতে চায় না।

তাহলে? তাহলে খবরটা সত্যি নয়। সিদ্ধান্তটায় পৌঁছতেই নতুন শক্তি পেলেন জমীর পণ্ডিত। নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো তাঁর মনটা। ঠিক হয়েছে, ইস্কুল তাঁকে চালাতেই হবে। যারা তুলে দিতে চায় ইস্কুল তাদের দেখিয়ে দেবেন, ইচ্ছে করলেই এ ইস্কুল তুলে দিতে পারে না কেউ। গোমূর্খ সব! স্বাধীন হলে কি হবে? শিক্ষার মর্ম এরা এখনো বোঝেনি। রসুলুল্লাহকে একবার কে যেন জিজ্ঞেস করছিলো, ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শেখাতে হবে কতো বছর বয়স থেকে? হজরত জওয়াব দিয়েছিলেন, তাদের জন্মের পঁচিশ বছর আগে থেকে। অর্থাৎ তাদের বাপ-মাকে আগে লেখাপড়া শেখাতে হবে। গোমূর্খরা কি আর কখনো এ হাদীসের মর্ম বুঝেছে? বোঝেনি। কিন্তু তিনি এবার বোঝাবেন।

অদ্ভুত একটা আত্মবিশ্বাস জাগলো পণ্ডিতের মনে। আনন্দে বুকখানা ভরে উঠলো। ভাবলেন, না, কোনো ভয় নেই। ছেলেমেয়েরা আজ দেরি করছে, তাতে কি হয়েছে? এমন দেরি তো ওরা বরাবরই করে। এই তো বছরখানেক আগে একদিন কেউই আসেনি মোটে। ছেলেমানুষ সব। হয়তো বা কোনো কাজে আটকেই পড়েছে। পড়া আর কাজের চাপে কতো পারে ওরা। আবার শুনতে পান, তাঁকে দেখে ওরা ভয়ও পায়। আহা, আসুক না আজ। আজ আর পড়াবেন না, গল্প শোনাবেন। আর, মৃদু হাসি ফুটে ওঠে পণ্ডিতের মুখে,—গোটাকতো ইটের কুচিও কুড়িয়ে রেখে দেওয়া যাক। ফাঁক পেলে একবার বাঘবন্দীও খেলে নেবে ওরা। প্রশ্রয়ের চোখে লুকিয়ে লুকিয়ে কোনো স্নেহভাজন শিশুর দুষ্টুমি দেখছেন যেন, এমনি ভাবে মুখ টিপে হাসতে হাসতে আলতো হাতে কুচি কুড়োতে থাকেন তিনি।

কুচি কুড়োনো শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় সহসা পেছন থেকে ডাক শোনা গেল, প'ন সা'ব।

পেছন ফিরে সলজ্জ চাপা আনন্দে প্রায় নেচে উঠলেন জমীর পণ্ডিত, রাশু? এসেছিস? এতো দেরি কেন রে?

রাশু বিষণ্ণ মুখে জওয়াব দিলো, আমার আসাতো নয় প'ন সা'ব। তাই, সময় করতে দেরি হয়ে গেল। কপালে নেই আমার লেখাপড়া। খোদা মাপায় কিছু দেয়নি। নিজের পড়াশোনা বন্ধ হলে দুঃখ নেই। কিন্তু বাপজান বলছিলো—

মড়ার মুখের মতো বিবর্ণ হয়ে গেল জমীর পণ্ডিতের মুখ। ধরা গলায় বললেন, কি বলছিল রে?

এক মুহূর্তে তাঁর মুখের দিকে চেয়েই মুখ নামিয়ে নিলো রাশু, ওদের ইস্কুলে খবর এসে গেছে, প'ন সা'ব। আমাদের শেষ দলের কয়েক জনও গিয়ে জুটেছে দেখলাম।

অর্থহীন চোখে চেয়ে পণ্ডিত শুধু বললেন, অ্যাঁ! কিন্তু রাণু, বিশু—

কথা আর শেষ করতে পারলেন না জমীর পণ্ডিত। রাশুও কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল।

অনেকক্ষণ পর পণ্ডিত অসমাপ্ত কথাটা শেষ করলেন, রাণু, বিশুরা কি আর পড়বে না।

: রাণু নাকি টাউনের ইস্কুলে পড়তে যাবে।

: কই আমাকে তো কিছু বলেনি। একবার বলেও গেল না—ইস্কুলটা—

রাশু একবার ইতস্তত করে বললো, রাণুকে ডেকে নিয়ে আসবো, প'ন সা'ব?

জমীর পণ্ডিত নীরবে ঘাড় নাড়িয়ে সম্মতি জানালেন।

বাড়ি কাছেই। অল্পক্ষণের মধ্যে রাণু এসে পড়লো। মুখখানা করুণ। বললো, কাল টাউনে চলে যাবো, পণ্ডিত সাহেব। আম্মা বলেছে, খালা-মাদের বাড়িতে থেকে পড়তে হবে এবার।

জমীর পণ্ডিত বহুক্ষণ সাড়া দিলেন না। তাঁর মন তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে আর এক দুনিয়ায়। ইস্কুলটা একবারে চোখের সামনে ভেসে উঠলো যেন। তিরিশ বছর আগের সেই চকচকে দেওয়ালটা। চাষীঘরের তাজা তাজা, ধুলোবালি মাখা ছেলেমেয়েগুলো দল বেঁধে আঙিনায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু—কিন্তু এরা যেন—এদের যেন পথ চলতে চলতে আজকেও দেখছেন, মনে হচ্ছে, আর,—আর, ইস্কুলের আঙিনাও যেন একটা নয়, দুটো, নাকি, আরো বেশি? হয়তো। উহুঁ, ঠিকই। সারা গাঁয়েই খেলা করে বেড়াচ্ছে ওরা, পণ্ডিত শুধু চেয়ে চেয়ে দেখছেন।

দলগুলো ছড়িয়ে পড়তে পড়তে এক সময় মিলিয়ে গেল। জমীর পণ্ডিত দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। শাদা দাড়ি গোঁফের ফাঁকে ভাঁজ-পড়া মুখের রেখাগুলি কঠিন হয়ে উঠলো দুই একবার। সংশয়ের দৃষ্টিতে ইস্কুল ঘরটার দিকে তাকালেন, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত মাত্র। ছবিটা আবার ফিরে আসতে লাগলো তারপর। আর ফিরে এলো—স্পষ্ট হয়ে আর একটি জিনিস, যেটা এতোদিন অস্পষ্টভাবে ঘোরাফেরা করছিলো তাঁর মনের মধ্যে। নিজেকে সংযত করে এবার স্বাভাবিক গলায় বললেন, তোরা কাল কখন যাবি মা?

বলতে বলতেই রাণুকে কোলের কাছে টেনে নিলেন তিনি।

: নটার গাড়িতে।

: চ, আমিও যাবো তোদের সাথে।

রাশু, রাণু দুজনেই বিস্মিত হয়ে বললো, আপনি কোথায় যাবেন?

জমীর পণ্ডিত হাসলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে উঠলেন, বেটারা ভেবেছে কি? পুঁইশাকের কতো ডগা কেটে খায় লোকে, তাই বলে কি গাছ মরে? এক খোঁচা খেয়েই আমি ইস্কুল তুলে দেব? দেখে আসি, দাঁড়া, একবার ইন্‌স্‌পেক্টরের অফিসটা। আর, না হয় তো নিজেই মাইনে দিয়ে একটা মাস্টার ধরে আনি কোথাও থেকে।

ঈষৎ উত্তেজিতভাবে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে একটুখানি থামলেন জমীর পণ্ডিত। তারপর আদেশের সুরে রাশুকে বললেন, শোন, তোর বাপের ওসব বাহানা। তুই পড়াশোনা নষ্ট করিসনে। নতুন ইস্কুলেই ভর্তি হয়ে যা। আর, রাণু, তুই টাউনে যা, হ্যাঁ টাউনেই—এখন বাড়ি যা—তোরা—

কিন্তু আদেশের সুর ক্রমে ভেঙে এলো, গলার মধ্যে কোথায় যেন একটা বিপর্যয় ঘটছে। রাণুর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে জমীর পণ্ডিত আবার বলতে চেষ্টা করলেন, হ্যাঁ মা,—যা,—তোরা—

হাতখানা এবার রাণুর মাথা থেকে নেমে কাঁধের পাশে ফ্রকটা চেপে ধরলো। পণ্ডিতের মনে হল, এদের যদি একেবারে বুকের সঙ্গে মিশিয়ে রাখা যেতো! নইলে যে শাদা গোঁফের তলায় ঠোঁট দুটিকে এতোক্ষণ পর আর বাগ মানানো যায় না!

একটি তুলসীগাছের কাহিনী

সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ্

ধনুকের মত বাঁকা ইট-সিমেণ্টের চওড়া পুলটির একশ গজ পরে বাড়িটা। দোতলা, মস্ত; রাস্তা থেকে খাড়া উঠে গেছে। এদেশে ফুটপাত নেই, তাই বাড়িটারও একটু জমি ছাড়বার ভদ্রতার বালাই নেই। তবে বাড়িটার পেছনে কিন্তু অনেক জায়গা। গোসলখানা—পাকঘর পায়খানার মধ্যেকার খোলামেলা পরিষ্কার স্থানটি ছাড়াও আরো ঢের জায়গা। সেখানে আম-জাম-কাঁঠালের দুর্ভেদ্যপ্রায় জঙ্গল, মোটা ঘাসে আবৃত স্যাঁতসেঁতে মাটিতে ভ্যাপসা গন্ধ, আর প্রখর সূর্যালোকেও সূর্যাস্তের ম্লান অন্ধকার।

অত জায়গা যখন, সামনে খানিকটা ছেড়ে একটা বাগানের মত করলে কি দোষ হতো?—সে কথাই এরা ভাবে। মতিন ভাবে, বাগান না থাক, সামনে একটু জমি পেলে ওরা নিজেরাই বাগান করে নিতো, যত্ন করে লাগাতো মরশুমী ফুল, গন্ধরাজ-বকুল-হাস্নাহানা, দু-চারটে গোলাপও। তারপর সন্ধ্যার দিকে আপিস থেকে ফিরে ওখানে বসতো। বসবার জন্য না হয় একটা হাল্কা বেতের চেয়ার নয় ক্যানভাসের আরাম কেদারা কিনে নিতো। গল্প করতো বসে-বসে। আমজাদের হুঁকোর অভ্যাস। সে না হয় বাগানের সম্মান বজায় রাখার মত মানানসই একটা নলওয়ালা সুদৃশ্য গুড়গুড়ি কিনে নিতো সন্ধ্যার বিশ্রামবিলাসের জন্য। গল্প-জমিয়ে কাদেরও ছিলো। ফুরফুরে খোলা হাওয়ায় তার গলাটা কাহিনীময়, হাস্নাহানার গন্ধের সঙ্গে মিশে মধুর হয়ে উঠতো। কিংবা, জ্যোৎস্নারাতে কোন গল্প না করলেই কী এসে যেতো? মুখ বরাবর আস্ত চাঁদটার পানে চেয়ে চুপচাপ কী বসে থাকা যেতো না?—আপিস থেকে শ্রান্ত হয়ে ফিরে প্রায় রাস্তা থেকে ওঠা দোতলায় যাবার সিঁড়ি ভাঙতে-ভাঙতে সে কথা আরো বার-বার মনে হয়।

এরা দখল করেছে বাড়িটা। অবশ্য দখল করবার সময় লড়াই করতে হয়নি, অথবা তাদের সামরিক শক্তি অনুমান করে কেউ এমনি হার মেনে নেয়নি। দেশ-ভঙ্গের হুজুগে এ শহরে আশা অবধি উদয়াস্ত তারা একটা যেমন-তেমন ডেরার সন্ধানে ঘুরছিলো। একদিন দেখলো ওই বাড়িটা, মস্ত

বড় বাড়ি জনমানবহীন অবস্থায় খাঁ খাঁ করছে। প্রথমে তারা বিস্মিত হয়েছিলো। পরে সদলবলে এসে দরজার তালা ভেঙে রৈ রৈ আওয়াজ তুলে বাড়িটায় প্রবেশ করে, বৈশাখের আমকুড়ানো ক্ষিপ্র উন্মাদনায় এমন মত্ত হয়ে উঠলো যে, ব্যাপারটা তাদের কাছে দিনদুপুরে ডাকাতির মত মোটেই মনে হলো না। মনে কোন অপরাধের চেতনা যদি বা ভার হয়ে নাববার প্রয়াস পেতো সে-ভার তুলোধুনো হয়ে উড়ে যেতো তীক্ষ্ণ সে-হাসির ঝলকে।

বিকেলের দিকে যখন খবরটা ছড়িয়ে গেলো তখন অবাঞ্ছিতদের আগমন শুরু হলো। মাথার উপর একটা ছাতের আশায় তারা দলে দলে আসতে লাগলো। এরা কিন্তু রুখে দাঁড়ালো। ডাকাতি নাকি? যথাসম্ভব মেজাজ ঠাণ্ডা রেখে বললে; জায়গা কোথায়, সব ঘর ভর্তি। বললে, দেখুন সাহেব, এই ছোট অন্ধকার ঘরেও চার-চারটে বিছানা পড়েছে। এখন তো বিছানা পড়ে ছ ফুট বাই তিন ফুটের চারটে চৌকি, খান ছয়েক চেয়ার বা টেবিল এলে ঘরে জায়গা বলে কোন বস্তু থাকবে না। কেউ সমবেদনা করে বললো, আপনাদের তকলিফ বুঝতে পারছি। আমরা কী এ কদিন কম কষ্ট করেছি? তা ভাই আপনার কপাল মন্দ। যদি চার ঘণ্টা আগে আসতেন। চার ঘণ্টা কেন, ঘণ্টা দুয়েক আগেও তো নীচে কোণের ঘরটা অ্যাকাউন্টস অফিসের মোটা মত একটা লোক এসে দখল করলো। রাস্তার উপর ঘর, তবু মন্দ কী। জানালার কাছেই সরকারী আলো, কোনদিন যদি আলো নিবে যায় রাস্তার ওই আলোতেই তোফা চলে যাবে।

দেশময় একটা ঘোর পরিবর্তনের আলোড়ন হয়েছে বটে তবু কোন প্রান্তে সঠিক মগের মুল্লুক বসে নি। কাজেই পরে এ বে-আইনী কাজের তদারক করতে পুলিস এসেছিলো।

পলাতক গৃহকর্তা যে বাড়ির উদ্ধারের জন্য সরকারের কাছে ধর্না দিয়েছিলেন তা' নয়। দখলের কথা জানলে দিতেনও কিনা সন্দেহ। যিনি প্রাণের ভয়ে এতবড় একটা পরিবার দু'দিনের জন্য স্রেফ দেশ থেকে উধাও করে দিতে পারেন, তাঁর সম্পর্কে সেটা আশা করা বাড়াবাড়ি! পুলিসে খবর দিয়েছিলো ওরাই যারা শহরের অন্য কোন প্রান্তে তখন ডাকাতির ফিকিরে ছিলো বলে এখানে চারঘণ্টা আগে বা দু'ঘণ্টা আগেও এসে পৌঁছুতে পারেনি। নেহাত কপালের কথা হচ্ছে, এদের কপালেও মন্দ হবে না কেন। ভাগ্যের ফলে নিরীহ লোকেরাও আবার রীতিমত লেঠেল হয়ে উঠতে পারে। সত্যি সত্যি

লাঠালাঠি না করলেও তার জন্ত তৈরী হয়ে থেকে এরা সমগ্র ব্যাপারটা পুলিসকে এমনভাবে বুঝিয়ে দিলো যে সাব-ইন্‌স্‌পেক্টর দ্বিরুক্তি না করে সদলবলে ফিরে গেলো। রিপোর্ট দেবার কথা। তা এমন ঘোরালো করে রিপোর্ট দিলে যে মর্মার্থ উদ্ধারের ভয়ে তার ওপরতলার কাছে সে রিপোর্ট চাপা দিয়ে রাখাই শ্রেয় মনে হলো। তাছাড়া তাড়াতাড়িই বা কী। যারা পালিয়ে গেছে তাদের প্রতি সমবেদনার কোন কথা ওঠে না এবং বাড়ির নিরুদ্দিষ্ট মালিক যদি এসে কিছু না করে তবে কেন অনর্থক মাথা ব্যথা করা। তাছাড়া, এরা কেরানী হলেও ভদ্রলোকের ছেলে, দখল করে আছে বলে জানলা দরজা ভেঙে ফেলছে বা ছাতের আস্ত আস্ত বীম সরিয়ে সোজা চোরাবাজারে চালান করে দিচ্ছে তা' নয়।

রাতারাতি সরগরম হয়ে উঠলো বাড়িটা। এদের অনেককেই কলকাতায় ব্লকম্যান লেন, খালাসী পট্টিতে, বৈঠকখানায় দপ্তরীদের পাড়ায়, সৈয়দ সালেহ লেনে তামাক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অথবা কমরু খানসামা লেনের অকথ্য দুর্গন্ধ নোংরার মধ্যে দিন কাটাতে হয়েছে। এ বাড়ির বড় বড় কামরা, নীলকুঠি দালানের ফ্যাশানে দেওয়ালে মস্ত মস্ত জানলা, পেছনে খোলামেলা উঠোন, আরো পেছনে বনজঙ্গলের মত আম জাম কাঁঠালের বাগান এদের কী যে ভালো লেগেছে বলবার নয়। একেকজন বেলাটের মত এক-একখানা ঘর দখল করে নেই সত্যি তবু ঘরে নির্ঝঞ্ঝাট হাওয়া চলাচল, এবং আলোর ছড়াছড়ি দেখে অত্যন্ত খুশি। এবার মনে হয় বাঁচল, ফরাগত মত থেকে আলোবাতাস খেয়ে জীবনে এবার সতেজ সবুজ রক্ত ধরবে, হাজার দু' হাজার-ওয়ালাদের মত মুখে জৌলুস আসবে, ম্যালেরিয়া কালাজ্বরের জীবাণু থেকে মুক্ত হবে।

যেমন ইউনুস থাকতো ম্যাকলিওড স্ট্রীটে। সাহেবী নাম হলে কী হবে, গলিটার এক এক অংশ যেন সকালবেলাকার আবর্জনা-ভরা আস্ত ডাস্টবিন। সে গলিতেই নড়বড়ে ধরনের কাঠের দোতলায় কচ্ছ দেশীয় চামড়া ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সে থাকতো। কে কবে বলেছিলো চামড়ার গন্ধ নাকি ভালো, যক্ষ্মার জীবাণু ধ্বংস করে। তাছাড়া সে উৎকট গন্ধ ড্রেনের পচা ভোসকা গন্ধও বেমালুম ডুবিয়ে দিত। ঘরের কোণে দশ দিন ধরে ইঁদুর কিংবা বিড়াল মরে পচে থাকলেও নাকে টের পাবার জো ছিল না। ইউনুস ভাবতো মন্দ কী। অন্ততপক্ষে যক্ষ্মার জীবাণু ধ্বংস হবার কথাটা মনে বড় ধরেছিলো। শরীরটা তার ভালো নয় তেমন ; রোগাপটকা দুর্বল মানুষ। এখানে দোতলার দক্ষিণ

দিকের বড় ঘরটায় জানলার পাশে শুয়ে সূর্যালোকের সোনালী ছলকানি ম্যাকলিওড স্ট্রীটের আস্তানার কথা মনে করে শিউরে ওঠে। ভাবে, এতদিনে কী হয়ে গেছে কে জানে! টাকা থাকলে বুকটা একবার দেখিয়ে আসতো ডাক্তারকে। সাবধানের মার নেই।

ভেতরে রান্নাঘরের বাঁ ধারে একটা চৌকোনো আধ হাত উঁচু ইটের মঞ্চের ওপর একটি তুলসীগাছ। একদিন সকালবেলায় নিমের ডাল দিয়ে মেছোয়াক করতে করতে মোদাব্বের উঠোনে পায়চারি করছে হঠাৎ তার নজরে পড়লো তুলসীগাছটি। মোদাব্বের হুজুগে মানুষ, একটু কিছু হলেই প্রাণ শীতল করা রৈ রৈ আওয়াজ উঠিয়ে দেয়। এরা সব উঠে এলো। যতটা আওয়াজ ততটা গুরুতর না হলেও কিছু তো অন্তত ঘটেছে।

এই তুলসীগাছটা। এটাকে উপড়ে ফেলতে হবে। আমরা যখন এসেছি বাড়িতে কোন হিন্দুয়ানীর চিহ্ন থাকবে না।

সবাই তাকালো সেদিকে। খয়েরি রঙের আভায় গাঢ় সবুজ পাতাগুলো কেমন ম্লান হয়ে আছে। নীচে ক'দিনের অযত্নে ঘাস গজিয়ে উঠেছে। আশ্চর্য, এটা এতদিন চোখেই পড়েনি, কেমন যেন লুকিয়ে ছিলো।

ওরা কিন্তু হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল! যে বাড়ি এত শূন্য মনে হয়েছে, সিঁড়ির ঘরের দেওয়ালে কাঁচা হাতে লেখা কটা নাম থাকলেও এমন বে-ওয়ারিশ ঠেকেছে যে, বাড়ির চেহারা হঠাৎ বদলে গেলো। তুলসীগাছটা আচমকা ধরা পড়ে গিয়ে অনেক কথা যেন বলে উঠলো।

এদের স্তব্ধতা দেখে মোদাব্বের আরেকটা হুঙ্কার ছাড়লো। ভাবছো কী? কথা নেই, উপড়ে ফেলো।

হিন্দু রীতিনীতি এদের ভালো জানা নেই। তবু কোথায় শুনেছে হিন্দু বাড়িতে প্রতি দিনান্তে গৃহকর্ত্রী তুলসীগাছের তলে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালায়, গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করে। ঘাস গজিয়ে ওঠা পরিত্যক্ত চেহারার এ-তুলসীগাছের তলেও প্রতি সন্ধ্যায় কেউ প্রদীপ দিতো। আকাশে যখন সন্ধ্যাতারাটি বলিষ্ঠ একাকীত্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠতো, ঠিক সেই সময় ঘনায়মান ছায়ার মধ্যে আনত সিঁদুরের নীরব রক্তাক্ত স্পর্শে একটি শান্ত ধীর প্রদীপ জ্বলে উঠতো প্রতিদিন, হয়তো বছরের পর বছর এমনি জ্বলেছে। ঘরে দুর্দিনের ঝড় এসেছে, হয়তো কারো জীবন-প্রদীপ নিবে গেছে, তবু হয়তো এ প্রদীপ দেওয়া অনুষ্ঠান একদিনের জন্যও বন্ধ থাকে নি।

যে গৃহকর্ত্রী বছরের পর বছর এ তুলসীতলে প্রদীপ দিয়েছে সে আজ

কোথায়? কেন চলে গেছে? মতিন এক সময় রেলওয়েতে আজ কোরতো। সে ভাবে, হয়তো কলকাতায়, নয় আসানসোল, নয়তো বৈদ্যবাটি, হাওড়ার কোন আত্মীয়ের আস্তানায়। লিলুয়াও বা নয় কেন। বিশাল রেলইয়ার্ডের পাশে মসৃণ একটি কালো চওড়া পাড়ের শাড়িটা ঝুলছে হয়তো। সেটা এ গৃহকর্ত্রীরই। কিন্তু যেখানেই থাকুন, আকাশে যখন দিনান্তের ছায়া ঘনিয়ে ওঠে তখন হয়তো প্রতি সন্ধ্যায় এ তুলসীতলার কথা মনে করে গৃহকর্ত্রীর চোখ ছলছল করে।

গতকাল থেকে ইউনুসের সর্দি-সর্দি ভাব। সে কথা বললে,—থাক না ওটা। আমরা তো আর পূজা করতে যাচ্ছি না। বরঞ্চ ঘরে একটা তুলসীগাছ থাকলে ভালোই। সর্দি কফে তার পাতার রস উপকারী।

মোদাব্বের এধার ওধার চাইলো। সবার যেন তাই মত। ওদের মধ্যে এনায়েত মৌলভী ধরনের মানুষ। মুখে দাড়ি, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আছে, সকালে নাকি কোরাণ তালাওয়াতও করে। সে পর্যন্ত চুপ। প্রতি সন্ধ্যায় ছলছল করে ওঠা গৃহকর্ত্রীর চোখের কথা কী ওর মনে হলো? অক্ষত দেহে তুলসীগাছটা বিরাজ করতে থাকলো। বাড়িটার আবহাওয়া ভালো। কলকাতায় ঝিমিয়ে আসা নিস্তেজ ভাবটা যেন কেটে গেছে। আড্ডাও তাই জমে ভালো, দেখতে না দেখতে মুখে ফেনা-ওঠা তর্ক-বিতর্ক লেগে যায়। সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক সবরকম আলোচনা। সাম্প্রদায়িকতার কথাও ওঠে মাঝে মাঝে।

—ওরাই তো মূল, মোদাব্বের বলে।

বলে, হিন্দুদের নীচতা ও গোঁড়ামির জন্যই তো আজ দেশটা এমন ভাগ হয়ে গেল।

তারপর তাদের অবিচার-অত্যাচারের ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত দেয়। রক্ত গরম হয়ে ওঠে সবার। দলের ভেতর বামপন্থী নামে চালু মকসুদ মিঞা কখনো কখনো প্রতিবাদ করে। বলে অতটা নয়। এতটা হলেও আমরা কম কী। মোদাব্বের দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে। দেখে তথাকথিত বামপন্থীর কাঁটা নড়ে। সে হাল ছেড়ে দিয়ে ভাবে, কে জানে বাবা আমরাও হলপ করে বলতে পারি দোষটা ওদের, ওরাও শালা তেমনি হলপ করে বলতে পারে দোষটা আমাদের। ব্যাপারটা বড় ঘোরালো, বোঝা মুশকিল। ভাবে, হয়তো, আমরাই ঠিক। আমাদের ভুল হবে কেন? আমরা কি জানিনা আমাদের?

কাঁটা সংশয়ে দুলে দুলে হঠাৎ ডানে হেলে গিয়ে স্থির হয়ে গেলো, কাঁটাটি কখনো কখনো না বুঝে বাঁয়ে হেলে আসে বলেই ওর বামপন্থীর অপবাদ।

পায়খানার দিকে যেতে যেতে রান্নাঘরের পাশে তুলসীগাছটি চোখে পড়ে। কে আগাছা সাফ করে দিয়েছে। পাতাগুলো শুকিয়ে উঠে খয়েরী রং ধরেছিল, আবার যেন গাঢ় রঙের মধ্যে কেমন সতেজ হয়ে উঠেছে। কে তার গোড়ায় পানি দিচ্ছে। অবশ্য খোলাখুলি ভাবে, লোক দেখিয়ে দিচ্ছে না। সমাজে চক্ষুলজ্জা বলে একটা কথা তো আছে।

ইউনুস ভেবেছিলো ম্যাক্লিয়ড স্ট্রীটের চামড়া-ব্যবসায়ীদের নোংরা আস্তানায় আর কখনো ফিরে যেতে হবে না—এখানে আলোবাতাসের মাঝে জীবনের জন্য সে বেঁচে গেলো। কিন্তু সে ভুল ভেবেছিল। শুধু ইউনুস কেন, সবাই—যারা ভেবেছিল এ-মন্দার দিনে ভালো করে খেতে না পাক, বাড়িতে প্রয়োজন মত জীবনের দুষ্প্রাপ্য আরামটুকু করবে—তারা প্রত্যেক ভুল করেছিলো। তবু যাহোক সামনে জমি নেই। থাকলে ওরা আজ বাগান করতো এবং সেই সময়ে অন্য কিছু না হোক, গাঁদাফুলের গাছ বড় হয়ে উঠতো। তাহলে কী প্রচণ্ড ভুলই না হতো।

মোদাব্বের হন্তদন্ত হয়ে এসে বললো, পুলিশ এসেছে। কেন? ভাবলো, হয়তো রাস্তা থেকে পালিয়ে একটা ছ্যাঁচড়া চোর বাড়িটায় এসে ঢুকেছে। কিন্তু সেটা খরগোশের মত কথা হলো। শিকারীর সামনে পালাবার আর পথ না পেয়ে হঠাৎ বসে পড়ে চোখ বুজে খরগোশ ভাবে, কই আমাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। তারাই তো চোর, কেবল গা ঢাকা দিয়ে না থেকে চোখ বুজে আছে।

পুলিশের সাব-ইন্‌স্‌পেক্টর সাবেকী আমলের হ্যাট বগলে রেখে তখন দাগ পড়া কপালের ঘাম মুছছে। কেমন একটা নিরীহ ভাব। পিছনের বন্দুকধারী কনেস্টবল দুটোকে মস্ত গোঁফ থাকা সত্ত্বেও আরো নিরীহ দেখাচ্ছে। ওরা নিস্তব্ধ ভাবে কড়িকাঠ গুনতে লাগলো। ওপরে ঘুলঘুলির খোপে এক জোড়া কবুতর বাসা বেঁধেছে। একটা শাদা আরেকটা ধূসর। তাও দেখতে পারে তারা তাকিয়ে তাকিয়ে। হাতে বন্দুক আছে কিনা।

মতিন সবিনয়ে বললো,—

—আপনার কাকে দরকার?

—আপনাদের সবাইকে। আপনারা বে-আইনী ভাবে এ বাড়ি কবজা

করেছেন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আপনাদের এ বাড়ি খালি করে দিতে হবে— ব'লে অর্ডার দেখালো।

বাড়ির কর্তা তাহলে ফিরে এসেছে। ট্রেন থেকে নেমে এখানে এসে কাণ্ডটা দেখে সোজা থানায় চলে গেছে। এখন সঙ্গে এসেছে কিনা দেখবার জন্য আফজল একবার গলা উঁচিয়ে দেখলো। কেউ নেই। পেছনে কেবল গোঁফওয়ালা বন্দুকধারী কনেস্টবল দুটো।

—কেন? বাড়িওয়ালা কী নালিশ করেছে?

—গভর্নমেণ্ট বাড়ি রিকুইজিসন করেছে।

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকলো তারা। অবশেষে মতিন বললে,—

—আমরা তো গভর্নমেণ্টেরই লোক।

মাঝে মাঝে মানুষের নির্বুদ্ধিতা দেখে অবাক হতে হয়। কথা শুনে নিস্তব্ধ কনেস্টবল দু'টো পর্যন্ত কড়িকাঠ থেকে চোখ নামিয়ে তাকালো তাদের পানে, ভাবাচ্ছন্ন চোখ হঠাৎ কথা কয়ে উঠলো।

বাড়িতে এরপর একটা ছায়া নেমে এলো। ভাবনার অন্ত নেই। কোথায় যাই এই চিন্তা। কেউ কেউ রেগে উঠে বলে, কোথাও যাব না, এইখানেই থাকবো। দেখি কে ওঠায়। কেউ যদি এ বাড়ির চৌকাঠ পেরোয় তবে সে আমাদের লাশের উপর দিয়ে আসবে। (কোথায় ছাত্ররা নাকি এমনি এমনি গায়ের জোরে একটা বাড়ি দখল করে আছে। তাদের ওঠাবার চেষ্টা করে সরকারের উচ্চতম কর্তারা পর্যন্ত নাকি নাস্তনাবুদ হয়ে গেছে। সে কথাই স্মরণ হয়।) অবশেষে রক্ত তাদের গরম হয়ে ওঠে। বলে কখ্খনো ছাড়বো না। যে আসে আসুক, কিন্তু সে যেন একথা জেনে রাখে যে, তাকে আমাদের লাশের উপর দিয়ে আসতে হবে।

ক'দিন গরম রক্ত টগবগ করলো। কাজে মন নেই, খাওয়ায় মন নেই। কেবল কথা, তিক্তরসে সিঞ্চিত ঝাঁঝালো কথা। কিন্তু ক্রমশ কথা কমতে লাগলো। এবং এদের কথা থামলে রক্ত ঠাণ্ডা হতে ক-দিন।

এরা তো আর ছাত্র নয়। এরা যে কী সে-কথা দর্প ক'রে সেদিন পুলিশকে নিজের'ই তো বলেছিলো। বাড়ি রিকুইজিসন হবার কথা শুনে কিছুক্ষণ বিমূঢ় থেকে বলেছিল, কেন, আমরা তো গভর্নমেণ্টেরই লোক।

একদিন তারা সদলবলে চলে গেলো। যেমন ঝড়ের মত চলে গেলো,

ঘরময় ছিটিয়ে রেখে গেলো পুরোনো খবর কাগজের টুকরো, কাপড় ঝোলাবার দড়ির একটা দুর্বল অংশ, বিড়ি-সিগারেটের টুক্‌রো, বা ছেঁড়া জুতোর গোড়ালিটা। নীলকুঠি-বাড়ির ফ্যাসানে তৈরী দরজা-জানালাগুলো খাঁ খাঁ করতে লাগলো। কিন্তু সে আর ক-দিন। রঙ-বেরঙের পর্দা ঝুলবে সেখানে।

পেছনে রান্নাঘরের পাশে তুলসীগাছটা কেমন শুকিয়ে উঠেছে। তার পাতায় আবার খয়েরী রঙ ধরেছে। যে দিন পুলিস এসে বাড়ি ছাড়বার কথা জানিয়ে গেলো সেদিন থেকে তার গোড়ায় কেউ পানি দেয় নি। তুলসীগাছের কথা না হোক, গৃহকর্ত্রীর ছলছল চোখের কথাও কী এদের আর মনে পড়েনি?

কেন পড়েনি সেকথা কেবল তুলসীগাছ জানে, যে তুলসীগাছকে মানুষ বাঁচাতে চাইলে বাঁচাতে পারে, ধ্বংস করতে চাইলে এক মুহূর্তে ধ্বংস করতে পারে অর্থাৎ যার বাঁচা বা সমৃদ্ধ হওয়া আপন আত্মরক্ষার-শক্তির উপর নির্ভর করে না।

জিবরাইলের ডানা

শাহেদ আলী

আজিমপুর হয়ে যে-রাস্তাটি সোজা পিলখানা রোডের দিকে চলে গেছে; তারি বাঁ-পাশে, গাছ-পালার ভেতর এগিয়ে গিয়ে একখানি ছোট্ট কুটির। ঘরের মেটে-দেওয়ালগুলোর উপরিভাগ চ'লে গেছে অনেক দিন, রোদ-বৃষ্টি আর হাওয়ার অবারিত যাতায়াত এই ঘরের মধ্যে। মরচে-ধরা বহু পুরোনো টিনের সুরাখ দিয়ে দেখা যায় নীল আস্‌মানের ছিটে-ফোঁটা।

মা ও ছেলে শুয়ে আছে চাটাই বিছিয়ে।

সন্ধ্যেবেলা হালিমা খুবই মেরেছিলো নবীকে। ছ'বছর গিয়ে সাত বছরে পা দিয়েছে নবী। হালিমা তাকে এক বিড়ির দোকানে ভর্তি করে দিয়েছে। কাজ না শিখলে দিন-গুজরানের উপায় থাকবে না। নবীকে দুধের বাচ্চা রেখেই বাপ তার ইন্‌তেকাল করেছে। একা হালিমা কীই বা করতে পারে তার জন্যে? নিজের পেট পালতেই সাত বাড়ি ঘুরতে হয় তার; কাজ না পেলে ভিক্ষে করতে হয় এবং সন্ধ্যেবেলা গিয়ে ব'সে থাকতে হয় গোরস্তানের গেটের কাছে। কবর জেয়ারত করতে এসে অনেকেই দান-খয়রাত করে, তাঁদের কাছ থেকে দু-চার পয়সা হালিমার বরাতেও জুটে যায় কখনে-কখনো। নবী অবশ্যি বিনে মাইনেতেই বিড়ির দোকানে কাজ করে, দোকানী শুধু দুপুরবেলা একবার খেতে দেয় নবীকে। এখনো সে পাকা হয়ে ওঠেনি বিড়ি বাঁধায়। কাজ সম্পূর্ণ শেখা হয়ে গেলেই সে মাস-মাস পাঁচ টাকা ক'রে পাবে দোকানীর কাছে। কিন্তু নবী ফাঁকি দিতে শুরু করেছে আজকাল, কোনো অছিলায় দোকান থেকে বেরিয়েই সে যে কোথায় চলে যায় কেউ বলতে পারে না। সন্ধ্যে পর্যন্ত আর দেখাই মিলে না তার। এ নিয়ে দোকানের মালিক তিনদিন নালিশ করেছে হালিমার কাছে, আজ তাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে, সে কাজ ছাড়িয়ে দেবে নবীর, এমন দুষ্ট ছেলেকে দিয়ে দরকার নেই তার। সারাটা বিকেল গোস্বায় আগুন হয়ে ছিলো হালিমা—ছেলে যদি কোনো কাজ না শিখে, তার কি কোন ভবিষ্যত আছে আজকের দুনিয়ায়? অথচ, এমন মগড়া যে, এদিকে মনই বসে না

তার। মন বসবেই বা কেন? মা তো রয়েছে তার জন্যে ভিক্ষে করতে বাঁদিগিরি করতে! সন্ধ্যেয় নবী বাড়ি ফেরবার সঙ্গে সঙ্গে হালিমা ধুম্-ধুম্ করে কতকগুলো কিল বসিয়ে দেয় নবীর পিঠে। সারাদিন কাটায় কোথায় নবী? —জানতে পীড়াপীড়ি করেছিলো হালিমা, কিন্তু নবীর কাছ থেকে জওয়াব পাওয়া কঠিন, সে শুধু ফুলে ফুলে কেঁদেছে। কাঁদতে কাঁদতে না-খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে নবী।

হালিমা খেতে বসেছিলো, কিন্তু দু'এক লোকমা গিলেই সে উঠে পড়ে—তার পেটেও ভাত গেল না আজ। কতো অনুনয়-বিনয় করেছে হালিমা, কিন্তু তাতে মন গল্‌লো না অভিমানী শিশুর। শুধু দু'একবার চোখ মেলে হালিমার দিকে তাকিয়েছিলো। তারপর মুখ গম্ভীর করে সে নিজেকে সঁপে দেয় ঘুমের কোলে।

গলে যাওয়া দেয়ালের ওপর দিয়ে হালিমা তাকিয়ে আছে আস্‌মানের দিকে। একটা হাত তার নবীর ওপর রাখা, নবীর পিঠে কঞ্চি ভেঙেও কোনোদিনই খুব ব্যথা পায় না,—কিন্তু আজ এই মুহূর্তে, ঘুমিয়ে পড়া ছেলের ওপর হাত রেখে, তার মনটা হু হু ক'রে ওঠে দুঃখে। সত্যি, এতোটুকু ছেলে কী-ই বা বুঝে? বাপ তো মরে গিয়ে রেহাই পেয়েছে চিরদিনের জন্য, বাপ-মার যুগল দায়িত্ব নিয়ে বেঁচে আছে হতভাগিনী হালিমা। যখন তখন ওকে মারপিট করা সত্যি অন্যায়। কিন্তু আজ যদি কিছুই না শিখে, ও বাঁচবে কী করে সংসারে? হালিমা তো আর চিরদিন বেঁচে থাকবে না যে, নিজের দিন গুজরানের কথা নবীর না ভাবলেও চলবে!

হালিমার চোখ আঁসুতে ভ'রে আসে, আসমান থেকে নজর ফিরিয়ে নিয়ে সে চুমো খায় নবীর কপালে।

নবী আস্তে আস্তে চোখ মে'লে চায়—আর হঠাৎ একবার দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, ওই মা এইডা কে?

—কইরে? বিস্মিত হালিমা প্রশ্ন করে।

—উই যে গেলো, ডান হাত বাড়িয়ে নবী দেখিয়ে দেয় অপরিচিতের যাওয়ার পথটি।

—কেউ না, নিঃসন্দিগ্ধ উত্তর দেয় হালিমা।

—তুমি লুকাইবার চাও?—নবীর অভিমান যেন ফুলে ওঠে—খুব সুন্দর একটা মানুষ গেছে না? রাঙা ধবধবা আর পিন্দনে ছুন্দর কাপড়?

—ছুন্দর মানুষ? হালিমার বিস্ময় এবার আরো বেড়ে যায়।

—হ, চোখ ছুটো বড়ো বড়ো করে নবী—মিঠাই নিয়া আইছিল,—তোমার কাছে দিয়া গেছে না মা?

—হ, দিয়া গেছে, একটা করুণ হাসিতে প্রায় আর্তনাদ ক'রে ওঠে হালিমা—তারপর একটু শান্ত হয়ে বলে, নবী, এখন তুই ঘুমা,—বিহানবেলা খাবিনে মিঠাই।

—লোকটা কোন্‌খান থে আইছিল, মা? নবী আবার প্রশ্ন করে—ছুইটা পাখ্‌না দেখছো পিঠে?

—পাখ্‌না?—হালিমার আক্কেল সত্যি হার মানে এবার। আধো-আলো আধো-অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণতর করে সে তাকায় নবীর মুখের দিকে, কিছুই ঠাহর করে উঠতে পারে না হালিমা।

নবী আবার বলে—হ, পাখ্‌না।—মউরের পেখমের মতো ছুন্দর!

হালিমা আরো কাছে টেনে নেয় নবীকে, পিঠের ওপর হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে—ফিরিছ্‌তা আইছিল্ রে—ফিরিছ্‌তা। আজ ছবে-বরাত না! ঘরে ঘরে আইয়া খোঁজ-খবর নিছে মানুছের। ফিরিছ্‌তার তো আজ ছুটি।

ফেরেশ্‌তা এসেছিলো! নবীর সারা গা রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। এক দারুণ উত্তেজনায় সে উঠে পড়ে বিছানা ছেড়ে। সুন্দর আজকের রাতটা—রুপা-গলা জোছনায় ধুয়ে ঢল ঢল করছে সারা পৃথিবীর গা। সন্ধ্যেয় ঘরে ফেরবার সময় আজ সে দেখেছে মস্‌জিদে মস্‌জিদে কোরআন-তেলাওৎ-রত ছেলেমেয়েদের। রাত হয়েছে অনেক, তবু শাহ্-বাড়ির মস্‌জিদ থেকে কোরআন তেলাওতের শিরীন আওয়াজ ভেসে আসছে এখনো—গোরস্তান গমগম করছে মানুষে। আজ ঘুমিয়ে নেই কেউই, ফেরেশ্‌তার সঙ্গে, মৃতদের রুহের সঙ্গে আজ মোলাকাত করবে সবাই; নিজেদের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার মারফত জানাবে আল্লাহ্‌র কাছে। শুধু নবী আর হালিমা-ই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নষ্ট করেছে এ সুযোগটা। তাদেরই দুয়ারের সম্মুখ দিয়ে চলে গেছে আল্লাহ্‌র ফেরেশ্‌তা, তাদের চাওয়ার কথা—জীবনপিপাসার কথা কিছুই জেনে যায়নি—কিছুই জানানো হলো না তাকে।

বাতি ধরিয়ে হালিমা পরীক্ষা করে ছেলের হাবভাব। একবার বলে—কিরে, তোর খিদে লাগছে খুব? ভাত খাবি এখন? নবী কোনো জবাব দেয়না তার, খিদের কথা সে ভুলেই গেছে একদম। মন তার আচ্ছন্ন হয়ে আছে এক মধুর কঠিন ভাবনায়। ফেরেশ্‌তারা খবর নিয়ে যায় আল্লাহ্‌র কাছে। তাদের খবরও কি নিয়ে গেছে ফেরেশ্‌তা? সে কি গিয়ে বলবে না,

বরাতের রাতেও সে ঘুমে দেখে গেছে নবী আর হালিমাকে—ফিরিছ্‌তারে কিছু কইয়া দিছো মা? আবার জিজ্ঞাসু হয় নবী।

কিছু বুঝতে না পেরে চুপ করে থাকে হালিমা।

—দুয়ারের কাছ দে' গেলো আর কিছু কইয়া দিলা না? অত্যন্ত করুণ হয়ে ওঠে নবী, আমারে ডাকলা ক্যান তুমি?

—আরে পাগলা, হালিমা তার জ্বালা চেপে রাখতে পারে না, ফিরিছ্‌তা আমাগো কথা ছুনব• ক্যান? বড় লোকগো খোঁজখবর করবার লাই না আসছে? আমাগো দুয়ারের কাছ দে' তাগো বাড়িই হে গেছে।

নবী চুপ ক'রে থাকে অনেকক্ষণ, তারপর হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসে—তুমি নামাজ পড়ো না ক্যান্ মা? অসহ্য মুরুব্বিয়ানার সুর বেজে ওঠে তার প্রশ্নে।

—কী হইবো নামাজ পইড়া? একটা পরম বিতৃষ্ণা প্রকাশ পায় হালিমার কণ্ঠে।

—কী, অইবো কি? এতোটুকু নবী জ্বলে ওঠে বিরক্তিতে, যারা নামাজ পড়ে, তাগো বাড়িতেই না ফিরিছ্‌তারা আছে? আল্লা তো তাগো কতাই হোনে।

—না-রে না, হালিমা একরকম চিৎকার ক'রে ওঠে এবার, আল্লা তো ঘুমাইয়া রইছে কেঁতা গায় দিয়া। ছুনা-রুপা দিয়া ছেজ্‌দা করলেই হে চায়। গরীবের সোদা নামাজে হের মন ভিজে না।

আল্লাহ্‌র এই মহৎ গুণের কথা ভেবে একান্তভাবেই ঘাবড়ে যায় নবী। কাঙাল যারা, মিসকিন যারা, তাদের আর কোন ভরসাই নেই তা'হলে। এতো সোনা-রুপাও তারা পাবে না, তাদের দিলের আরজুও গিয়ে পৌছবে না খোদার কাছে। আর তাই তো গরীবদের যারা নামাজ পড়ে তাদের তো মালদার হতে দেখা যায় না; দুঃখ তাদের ঘুচছে কই? সোনা-রুপার শিরীন আওয়াজেই তাহলে ঘুম ভাঙে খোদার! সেই জন্যেই বুঝি মালদার আরো মালদার হয়, একগুণ দিয়ে পায় সত্তর গুণ!

কিন্তু খোদা তো পয়দা করেছেন সবাকেই। তিনি কেন তাঁর রহমত একতরফা বিলিয়ে দেবেন মালদারদের মধ্যে? কোনো দিন কি ঘুমের ঘোরেও দরিদ্র বান্দার দুঃখে অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে না তাঁর চোখ? সত্যি কি গরীবেরা ঘুম ভাঙাতে পারে না তাঁর?

হতাশার আঁধারে হাতড়ে ফিরতে থাকে নবীর মন। দুয়ারের সুমুখ দিয়ে গেছে কেরেশ্‌তা, দবদবে আগুনের মতো রঙ, ময়ূরের পেখমের মতো

বিচিত্র বর্ণের ছুটো ডানা তার পিঠে, তার সারা গায়ে সে কী খোশবু! সাদা ধবধবে তাজী ঘোড়া কোমর নাচিয়ে চলেছে ফেরেশ্‌তাকে নিয়ে। নবী জেগে থাকলে আজ শুয়ে পড়তো ফেরেশ্‌তার পথে, আর মিনতি ক'রে বলে যেতো, তার রক্তের ঢেউ-ওঠা অফুরন্ত দুঃখের কাহিনী। কথা না শুনলে সে ঝুঁকে পড়তো ডানা ধ'রে—ফেরেশ্‌তার সাথে সাথে উড়ে সেও চলে যেতো একেবারে আল্লাহ্‌র কাছে। অমনি চোখ না মেললে নবী চিৎকার করতো গলা ফাটিয়ে খামচিয়ে রক্তাক্ত ক'রে ঘুম ভাঙাত আল্লাহ্‌র।

কিন্তু তা-তো আর হলো না। অথচ সব কিছুরই চাবি রয়েছে খোদার হাতে। তাঁর ঘুম ভাঙাতে না পারলে কেইবা আর খুলে দেবে ভাগ্যের মণিকোঠা?

বিছানায় গিয়ে আবার শুয়ে পড়ে নবী। রাজ্যের যতো চিন্তা এসে জটলা পাকায় তার মনে। হালিমাও বাতি নিবিয়ে গা এলিয়ে দেয় নবীর কাছে। ছেলে ছু'চোখ মেলে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে, হালিমা তা দেখছে না, শুধু বুক দিয়ে অনুভব করছে নবীর বুকভরা অস্বস্তি! একবার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে হালিমা বলে, নবী অনেক রাত অইছে—তুই ঘুমা।

নবী আস্‌মানের দিকে চেয়ে থাকে চুপ ক'রে, আর একটা পথের খোঁজের কল্পনা তার হয়রান হ'য়ে যায়। আকাশ ভরে পৃথিবীতে এতো জ্যোৎস্না—তবু যেন কতো অন্ধকার, চোখের সঙ্গে মনও হারিয়ে যায় সে-অন্ধকারে।

হঠাৎ একবার বিজলি ঝিলিক দিয়ে যায় তার চোখে, অকূল দরিয়ায় যেন নারিকেল কুঞ্জ-ছাওয়া উপকূলের আভাস পেয়েছে নবী। খুশিতে, আবেগে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে তার সারা দেহ। হয়েছে, আর ভাবতে হবে না! আরশের পায়ায় রশি লাগিয়ে টান দেবে সে। রশি তো হাতেই রয়েছে তার। এবার থেকে নির্বিকার ভাব ঘুচে যাবে খোদার।

পরদিন। আগের দিনকার পানি-ভাত ছুটো খেয়ে দোকানে কাজ করতে যায় নবী—যাবার ইচ্ছে তার মোটেই ছিল না, হালিমা-ই তাকে পাঠিয়েছে অনেক শাসিয়ে। হালিমা বলে, নিজের হাতেই আজ গড়তে হবে কপাল, আল্লার কাছে আরজি পেশ করলেই চলবে না।

কয়েকটা ছেলের সাথে নবী বিড়ি বাঁধছে, কিন্তু তার মন পড়ে আছে পিলখানার ওপাশে ফণিমনসায় ঘেরা নির্জন জায়গাটুকুতে। দোকান পাকিয়ে

লোক-চক্ষুর আড়ালে ঐখানে সে রোজই ঘুড়ি ওড়ায় আপন মনে। এ-খবর সে ছাড়া আর কেউ জানে না সংসারে। পৃথিবীকে লুকিয়ে শিশু তার কচি হাত দুটো বাড়িয়ে দেয় আসমানের দিকে। কিন্তু হাত আর কদ্দুরই বা ওঠে? নবীকে তাই নিতে হয়েছে ঘুড়ি—ঘুড়ি উড়িয়ে উড়িয়ে সে তার বাঞ্ছাকে এতোদিন অজান্তে ওপর হতে আরো ওপরে আরশের দিকেই পাঠিয়েছে!

পেট ব্যথার অজুহাত তুলে নবী বেরিয়ে পড়ে দোকান থেকে। মুহূর্তের জন্যেও সে স্থির থাকতে পারছে না। আজ অতি সন্তর্পণে বাড়ি পৌঁছে নবী। মা বাড়ি নেই। আনন্দের সীমা থাকে না নবীর। তিনটা পাতিল তচ্‌নচ্‌ করে সে বার করে দু'আনা পয়সা—ওহ! দুই আনা পয়সা তো নয়, সাত রাজার ধন! পয়সাগুলো মুঠোয় পুরে নবী ছুটে যায় নবাবগঞ্জে। সুতো কিনে আবার সে দৌড়তে শুরু করে দেয়। এক নতুন অভিযানের নেশায় বুক তার কাঁপছে। জঙ্গলের ভেতরকার এক পরিত্যক্ত ভাঙা মস্‌জিদের অন্ধকার গুহা থেকে নবী বার করে আনে একটা ঘুড়ি আর লাটাই। এই ঘুড়িই তাকে রোজ দোকান থেকে বের করে আনে কাজ ভুলিয়ে, এই ঘুড়িই তাকে পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে আস্‌মানের পথে নিয়ে যায়। আর সব ব্যাপারেই খই ফোটে নবীর মুখে, কিন্তু এই ঘুড়ির কথা কারো কাছে সে বলে না। এ যেন তার নেহাত পুশিদা খেলা, একান্তভাবেই নিজস্ব।

এক সময় নবী চলে যায় পিলখানার ওপাশে সেই ফণিমনসায় ঘেরা নির্জন জায়গাটুকুতে। পুরোনো সুতোটার সঙ্গে নতুন সুতোটা গেরো দিয়ে সে ঘুড়ি উড়িয়ে দেয় আস্‌মানে। ঘুড়ি যতোই ওপরে উঠতে থাকে উল্লাসে অধীরতায় ততোই বিচলিত হয়ে ওঠে নবী, একটা স্মিতহাস্যে তার মুখ থেকে চোখ পর্যন্ত ঝিলিক দিয়ে ওঠে বারবার। আরশের পায়ে রশি লাগিয়ে আজ সজোরে টান দেবে নবী।

ক্রমেই ছোট হয়ে আসে ঘুড়িটা। এক সময়ে যখন হাতের সুতো শেষ হয়ে গেল, নবীর দুঃখের সীমা থাকে না। সুতো শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু ঘুড়ি যে দেখা যাচ্ছে এখনো। খোদা কি এতো কাছে তাতো নয়, মানুষের দৃষ্টিসীমার বাইরে অনেক দূরে আরশের ওপর ঘুমিয়ে আছেন তিনি। এতো কাছে হলে তো খালি চোখেই দেখা যেতো আল্লাহ্‌কে। সুতো চাই তার, আরো অনেক সুতো,—যে তার ঘুড়িকে নিয়ে যাবে মেঘের ওপারে, আরশের

একেবারে কাছটিতে। কিন্তু এখানেও দরকার পয়সার। সে যে সুতো কিনবে সে পয়সাই বা কই নবীর? তাদের দুর্দশা তাহলে আর ঘুচবে না! নবী আসমানের দিকে চেয়ে নিজের ব্যর্থতায় আর্তনাদ করে ওঠে। ঘুড়ি ওড়ানো যতোদিন একটা শখ ছিলো, নেশা ছিলো, ততোদিন শুধু ঘুড়ি উড়িয়েই আনন্দ পেয়েছে। কিন্তু আজ যখন ওই ঘুড়ি একটা গভীর অর্থ নিয়ে তার কাছে ধরা দিয়েছে, সহস্র বেদনায় সম্ভাবনার পথও অবারিত হয়ে গেছে তার জন্যে।

কিছুক্ষণ ঘুড়ি উড়িয়েই বাড়ি চলে আসে নবী। এই সুতোয় হবে না, আরো অনেক সুতো চাই। বামনের হাত বাড়িয়ে আরশের পায়া ধরা অসম্ভব। পরম যত্নে সে ঘুড়িটা লুকিয়ে রাখে ভাঙা মসজিদের নির্জন অন্ধকারে।

বেলা চলে যাচ্ছে, ঘরেও পয়সা নেই। মার কাছে পয়সা চাইতে গেলে হালিমা কঞ্চি দিয়ে তার পিঠের ছাল না তুলে ছাড়বে না। যে দু'আনা পয়সা আজ সে চুরি করেছে তার জন্যেই তার বরাতে কী আছে কে জানে? তবু লোভ সামলাতে পারে না নবী। আজকালের লিধা পাল্টাতে হলে কিছু খরচ—কিছু ক্ষতি স্বীকার করতে হবে বইকি। মার অবর্তমানে নবী উল্টেপাল্টে দেখে ঘরের সব কটা হাঁড়ি-পাতিল—ছেঁড়া কাপড়ের খাঁজে তন্নতন্ন করে। একটা পয়সা নেই কোথাও। পয়সা থাকবেই বা কী করে? ভিক্ষে করে পরের বাড়িতে কাজ করে যা দু'চার পয়সা পায় তাতে করে মা ছেলের আধপেটা খাবারই হয় না কোনদিন, তারা আবার জমাবে পয়সা।

হঠাৎ নবীর মনে পড়ে যায়: ইস্টিশনে গেলে দু'চার পয়সা পাওয়া যেতে পারে। তার বয়সী ছেলেদের সে কুলিগিরি করতে দেখেছে অনেকদিন। নবী আর ভাবতে পারে না, একপেট ক্ষিধে নিয়েই সে ছুটে যায় ইস্টিশনের দিকে। অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয় তাকে। তারপর গাড়ি যখন এলো, তাজ্জব বনে যায় নবী, কতো বিচিত্র রকমের মানুষ, আর কতো রঙবেরঙের পোশাক! বাক্স, বিছানা, পেটরা, প্রভৃতিতে স্তূপীকৃত হয়ে ওঠে লাইনের কাছটুকু। 'মুটে চাই' 'কুলি চাই' চিৎকারে হারিয়ে যায় আর সব আওয়াজ।

সবার বরাতেই একটা না একটা কিছু জুটে যায়; কিন্তু নবীর কপাল বড়ো খারাপ। 'মুটে চাই' বলে চিৎকার করতে গিয়ে আওয়াজ এলো না তার

গলায়—হাত দুটো চাওয়ার ভঙ্গিতে ওপর দিকে উঁচিয়ে যেন ছুটে যায় এক কামরার সুমুখ থেকে আরেক কামরার সুমুখে। চোখ তার করুণ, আঁসুতে টলোমলো। ভিক্ষুক মনে করে কেউ কেউ তাকে নসিহত করলে শ্রমের মর্যাদা সম্বন্ধে, আর অতি আধুনিক কেউ দিলে গলাধাক্কা। কারো কাছ থেকেই নবী কিছু পেলো না।

ট্রেন চলে গেছে। ইস্টিশনে বসে বসে নিজের বদ্ নসীবের জন্যে বেদনায় ভরে আসে নবীর মন। দুঃখটা এবার আরও বড়ো হয়ে দেখা দেয় নবীর কাছে। মায় বেটায় কোনদিন একেবারেই উপোস করতে হয় তাদের। বছরে একবার করেও যদি কাপড় কিনতে পারতো তারা! তার বাপ সেই যে ছেঁড়া, শততালি দেয়া কাপড়গুলো রেখে গিয়েছিলো সেইগুলোই আরো তালি দিয়ে এবং গেরোর ওপর গেরো দিয়ে পরছে তারা দুজনে। ঘরের মেটে দেয়াল তো প্রায় সবটাই গলে গেছে, বৃষ্টি হলেই টিনের সুরাখ দিয়ে পানি পড়ে ঘর ফেসে যায়। দুর্দশার আর সীমা পরিসীমা নেই তাদের। আল্লাহ্‌র কাছে তাদের দিলের আরজু পৌঁছাতে পারলেই অবসান ঘটতো দুঃখরাত্রির। কিন্তু হালিমা নামাজ পড়ে না, নবীও আরতী সুরা এবং রাকাতগুলো শিখবার সুযোগ পায়নি কখনো। আল্লাহ্ কেনই বা শুনবেন তাদের কথা।

ঘণ্টাখানেক পরে আরেকটা ট্রেন যখন এলো, নবীর আনন্দ দেখে কে! ট্রেন থামবার আগেই 'মুটে চাই' কুলি চাই' বলে সে চিৎকার শুরু করে দেয় প্রাণপণে। ট্রেন থামলে একটা ঘড়ি-পড়া বলিষ্ঠ হাতের ইশারায় নবী এসে দাঁড়ায় এক প্রথম শ্রেণীর কামরার সুমুখে। ভদ্রলোক একটা এটাচি ও হোল্ডঅল্ দেখিয়ে দিয়ে বললেন—ওয়েটিং রুমে নিয়ে যেতে পারবি?

—ক্যান পারুম না? তাচ্ছিল্যের সাথে জবাব দেয় নবী, দেন আমার ঘাড়ে তুইলা। আমার বহুত পইছার দরকার—চোখ দুটো বড়ো বড়ো করে উচ্চারণ করে নবী—আমনে কতো দিতে পারবেন?

ভদ্রলোক এবার দৃষ্টি প্রখরতর করে নবীর মুখের দিকে তাকান; অদ্ভুত ছেলে তো! বলেন—অতো পয়সা দিয়ে কি করবি?

—বারে, পইছার বুঝি কাজ নাই। নবী রীতিমতো বিস্ময় প্রকাশ করে, ঘুড়ির রছি কিমু যে—অনেক রছি।

ভদ্রলোক এবার সত্যিই হেসে ফেলেন এবং হোল্ডঅল্‌টা নবীর মাথায় দিয়ে এটাচিটা হাতে করে নেমে পড়েন গাড়ি থেকে। ওয়েটিং রুমে এসে চার পয়সার জায়গায় চার আনা দিয়ে বলেন—এই নে, অনেক সুতো হবে।

নবী সিকিটা ছুঁড়ে মারে ওয়েটিং রুমের মেঝেয়—না, আমি নিমু না। চার আনায় আমি কি করুম? আমার অনেক রছি লাগবো। আমার ঘুড়ি আছমান ছুইবো গিয়া।

সবাই অবাক হয়ে যায় নবীর মেজাজ দেখে। ভদ্রলোক সিকিটা হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে বলেন—ঘুড়ি আসমান ছুঁলে তোর কি হবে?

—ক্যান, আরছের পায়ায় বাজাইয়া টান দিমু। এক স্বপ্নিল নেশা আর শক্তির স্ফূর্তিতে নবী মুহূর্তে যেন বিরাট কিছু হয়ে ওঠে—আল্লা খালি আপনাগো কথাই ছুনবো, আমাগো কথা বুঝি ছুনোন লাগবো না হের?

এবার সকলে এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে থাকে। পরিবেশটা মুহূর্তে যেন কেমন থম্‌থমে বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। কারো মুখে টু শব্দটি নেই। রাজভক্তদের সামনে যেন রাজদ্রোহের বাণী উচ্চারিত হয়েছে শিশুর মুখে। ভদ্রলোক পকেট হতে একটা আধুলি বের করে বলেন—এই নে, এখন হবে তো?

আধুলিটা হাতে নিয়ে কৃতজ্ঞতায় আঁখি ছল্‌ছল্‌ করে ওঠে নবীর। আন্তরিকতা মিশিয়ে বলে, আমাগো যখন অনেক পইছা অইবো, আমাগো বাড়ি তখন আইয়েন—আপনের জেভ ভইরা দিয়া দিমু হেদিন।

নবীর কথায় হেসে ফেলে সবাই। যিনি আধুলিটা দিয়েছেন, তিনিও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন হাসিতে। তাঁর আজকের এই মেহেরবাণীর কথা ভুলতে পারবে না নবী—দিন যখন ফিরবে, নবী দুই জেব ভর্তি করে পয়সা দিয়ে শোধ করবে তাঁর ঋণ। হাসতে হাসতেই বলেন, হাঁ হাঁ নিশ্চয়ই আসবো, আমরা সবাই আসবো সেদিন।

নবী এসব শুনবার জন্য অপেক্ষা করে না। সে সোজা চলে যায় চকের দিকে। অনেকটা সুতো কিনে যখন বাড়ি ফিরলো তখন সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে। সুতোটা লুকিয়ে রেখে আসে মস্‌জিদে—তার ঘুড়ির পাশে।

হালিমা ভিক্ষা-করে আনা চালগুলো জাল দিচ্ছে। গাছতলা থেকে ভিজে বন কুড়িয়ে এনেছে আগুন ধরাবার জন্যে। নবীকে দেখেই চোখ কচলাতে কচলাতে বলে, কিরে,—অতোক্ষণে কোন্‌থে আইলি?

মার দরদভরা প্রশ্নে অত্যন্ত খুশি হয় নবী; তার মেজাজ তাহলে বিগড়ে যায়নি আজ। হয়তো পাতিল তচ্‌নচ্‌ করে পয়সা নেবার খবরটি সে জানতেই পারেনি এখনো। মনে মনে আল্লাহ্‌কে সে শুক্‌রিয়া জানায়।—দোকান তে বার অইয়া একটু ঘুইরা আইলাম মা,—মার দিকে চেয়ে সে বলে সহজভাবে।

চুলোয় বন ঠেলতে ঠেলতে হালিমার কণ্ঠে দরদ ভেঙে পড়ে— দোকান তে পালাস নে যেন! কাজটা ছিখে ফেললে অনেক পইছা আইবো ঘরে। কাজ না জানলে কি আর ভাত-কাপড় জুটে? আমাগো মা-পুতের কি এ ছাড়া আর উপায় আছে'—এবার ছেলের মুখের দিকে চেয়ে হালিমা প্রশ্ন করে—হারে নবী, তোর খিদা লাগছে, না?

মায়ের আন্তরিকতায় নবী একরকম ভুলেই যায় তার খিদের কথা। তাছাড়া, একদিকে রশি কেনার আনন্দ, অন্যদিকে মার স্নেহ—দুটোতে মিলে আজকের দিনটি অপূর্ব হয়ে উঠেছে নবীর কাছে। হেসে সে বলে—না মা, আমার খিদে লাগছে না। দোকানে আমাগোরে খাওয়ায় কিনা দুপুরবেলা।

—তাই ভালো—হালিমা সায় দেয়—ভিক্ষার ভাত যতো কম পেটে দেয়া যায় ততোই ভালো। এ ভাতে ছেলেমাইয়া গো 'বাইড়' থাকে না।

রান্না হলে নবী ও হালিমা, দুজনেই কিন্তু ভিক্ষের ভাত পেটে ঢেলে স্বস্তিবোধ করে কিছুটা।

পরদিন দোকানের কথা বলে নবী একটু সকাল সকালই বেরিয়ে পড়ে ঘর থেকে। আজ আবহাওয়া খুবই অনুকূলে—এবং নবীর হাতে অনেক সুতো। পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে অনায়াসে আজ সে তার হাত পৌঁছিয়ে দিতে পারে আসমানে।

নবী ঘুড়িটাকে বুকের কাছে চেপে ধরে—বুক তার ঢিপ ঢিপ করছে। কিছুক্ষণ পরেই ঘুড়ি উড়লো আসমানে,—হাওয়ার ভরে নেচে নেচে। দুঃসাহসের দোলায় কেঁপে কেঁপে ঘুড়ি উঠে যায় ওপর হতে ওপরে—আরো ওপরে! সুতো আজকে ফুরোতে চায় না,—ঘুড়ি ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে—এই বুঝি ঘুড়ি হারিয়ে যায় দৃষ্টির ওপারে অসীম শূন্যতায়। আবেগে, ঔৎসুক্যে বড়ো হয়ে এলো নবীর চোখ দুটো। তার বুকের শ্বাস দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে আসে, ঠোঁটের বাঁধন খুলে গিয়ে একটা অদ্ভুত হাসির আমেজ লাগে তার সারা মুখে। ঘুড়ির নাচের সঙ্গে সঙ্গে একটা অপূর্ব চঞ্চলতায় নাচতে থাকে তার বড়ো-হয়ে-আসা চোখের চকচকে তারা দুটো।

এক সময় টের পায় নবী—লাটাই আর ঘুরছে না। সুতো শেষ হয়ে গেছে। সেই নির্জন ফণিমনসার ঘেরা জায়গাটুকুতে নবীর চোখ পানিতে ভরে আসে। ঘুড়ি এখনো দৃষ্টিসীমার ভেতরেই।

নবী ঘুড়ি নামিয়ে আনলো। আরো বেশি রশি চাই তার, অনেক রশি। খোদা তাঁর আসন এতো দূরে পেতেছেন কেন, বুঝতে পারে নবী। কিন্তু

আসন দূরে পাতলেই কি আরশে বসে ঘুমোনো এতো নিরাপদ? সংসারে কি রশি নেই যে, তাঁর আরশ ছোঁওয়া যাবে না, টলিয়ে দেয়া যাবে না পাখায় রশি লাগিয়ে? নবীর আকাঙ্ক্ষা আরো প্রবল হয়ে ওঠে বাধা পেয়ে।

চিরদিনকার মতো মস্‌জিদে ঘুড়ি আর লাটাই লুকিয়ে রেখে আজ সে চলে যায় ইস্টিশনে। পয়সা চাই তার, রশি কেনায় পয়সা—যে রশি সে আরশের পায়ায় বেঁধে খোদাকে বেঁধে খোদাকে নামিয়ে আনবে মাটির মানুষের মধ্যে!

শেষ পর্যন্ত দু'আনার বেশি আর জুটে না। কতোটুকু সুতোই বা আর কেনা যায় এ দিয়ে!

এমনি করে রোজ কিছু কিছু পয়সা আয় করে নবী—আর তাই দিয়ে সুতো কিনে পুরোনো সুতোটার সাথে জুড়ে দিয়ে ঘুড়ি উড়িয়ে দেয় আসমানে।

পিলখানার ওপাশের ওই স্থানটুকু নবী একান্ত আপন করে নিয়েছে অনেকদিন। অমন নির্জন নীরব পরিবেশে আসমান ছাপিয়ে ওঠে নবীর দুর্জয় সাহস। কিন্তু হাতের সুতো যখন শেষ হয়ে যায়, এবং ছোট হতে হতেও ঘুড়ি তখন থেকে যায় দৃষ্টির ভেতরেই। নবীর তখনকার দুঃখ আর আক্রোশ দেখে কে? তবু মন তার ভেঙে পড়ে না—সাফল্যের নিকট সম্ভাবনা তাকে করে তোলে আরো সাহসী, আরো জেদী।

রোজ নবী দোকানের কথা ব'লে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়—কিন্তু কোথায় বা দোকান আর কোথায় বা নবী? ইস্টিশনে, বাজারে মুটেগিরি ক'রে যা দু'চার পয়সা পায় সবই খরচ করে সুতো কেনায়। দিনে দিনে সুতো দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে ওঠে।

একদিন সত্যিই ঘুড়ি ছোট হতে হতে একটা কালো বিন্দুর মতো হয়ে আসমানের অসীম শূন্যতায় হারিয়ে গেলো। ভোর ধরে রেখে আসমানের দিকে চেয়ে আছে নবী। আর প্রচণ্ড কাঁপুনিতে থরথর ক'রে উঠছে তার শরীর। উত্তেজনায় কপাল দিয়ে ঘাম বেরিয়ে এলো তার, বিস্ময়ে-আশঙ্কায় দম যেন বন্ধ হয়ে আসে—একটা করুণ হাসিতে মধুর হয়ে ওঠে শিশুর মুখ। আজ যেন টানাটানি পড়ে গেছে আসমান আর পৃথিবীর মধ্যে—কে হারে, কে জেতে—এবং ভারি আকর্ষণ সে অনুভব করছে হাতের রশিতে। শুধু একটা রশি টন্‌টন্ করছে আসমানের আকর্ষণে। হয়তো দৃষ্টির আড়াল থেকে কে টানছে রশিকে ধরে—আর সেই টানে ফুলে ফুলে উঠছে নবীর হাতের শিরা উপশিরা।

রশি বেয়ে বেয়ে নবীর বিস্মিত দৃষ্টিও হারিয়ে যায় আসমানে। আজকে আর ঘুড়ির রশি গুটোবে না নবী; লোকচক্ষুর ওপারে ঘুড়ি উড়ে বেড়াক আপন ইচ্ছায়—আপন ধর্মে। এক সময় হয়তো আটকে যাবে আরশের পায়ায়—আর শক্ত টান পড়বে হাতে, রশিতে টান দিয়ে নবী টলিয়ে দেবে আল্লার আরশ। ভয়-চকিত আঁখি মেলে আজ তিনি তাকাবেন মাটির মানুষের দিকে, অনিচ্ছায়ও শুনতে হবে দুঃখী বান্দার কাহিনী—তাদের ইতিহাস!

নবী চেয়ে আছে ওপর দিকে, শুধু একটা সুতো—সে-রাতের পুলের মতো সূক্ষ্ম একটা সিঁড়ি বেহেশত্ আর দুনিয়ার মাঝখানে। মাঝে মাঝে শাদা, কালো নানা রঙের মেঘ আনাগোনা করছে, আর আঁৎকা টান পড়ে পড়ে ঝন্ ঝন্ করে উঠছে সুতোটুকু—মেঘ দু' টুকরো হয়ে যাচ্ছে সে সুতোর ধারে! নবীর চোখ দুটো পানিতে ভ'রে আসে। আল্লাহ্র আরশ ঠিক কোন্খানটিতে তা' সে জানে না, কিন্তু আজ তার মনে হলো—সে যেন তার বিদ্রোহের নিশান আরশের কাছাকাছি কোথাও পাঠিয়ে দিয়েছে। আর যেন দূর নয় বেশি!

পেটের ক্ষিধে, মা ও সমস্ত সংসার—সব কিছু ভুলে যায় নবী। সন্ধ্যের পরও অনেকক্ষণ 'ডোর' ধরে দাঁড়িয়ে থাকে সে। কই, কোথাও তো আটকে গেলো না ঘুড়ি! এক সময়ে সে সুতো গুটিয়ে ঘুড়ি নামিয়ে আনে নীচে এবং জমিন ছোঁবার আগেই ঘুড়িটাকে চেপে ধরে তার বুকের মাঝে, ঘাড় নীচু করে সে পরশ নেয় ঘুড়ির, কেমন যেন একটা অদ্ভুত গন্ধ পায় নাকে, আর ঘুড়িটাকে মনে হয় ভেজা ভেজা। আহ্—নবীর বুকে খুশি আর থামাই পায় না যেন। বহুদিন পর খোদা তাঁর গরীব বান্দার দুঃখে কেঁদেছেন, আর তাঁরই আঁসুর ধারায় সিক্ত হয়ে উঠেছে নবীর ঘুড়ি।

আরশের পায়া ধরে টান দিতে হল না আর; এর আগেই খোদা কেঁদে ফেলেছেন তার বান্দার দুঃখে। নবী আজ সত্যি বিজয়ী—সে সার্থক হয়েছে তার অভিযানে; আজ থেকে কোন দুঃখ থাকবে না তাদের।

বাড়ি ফিরে দেখে, হালিমা বিছানায় পড়ে কোঁকাচ্ছে—জ্বর এসেছে তার। জোহরেরর সময়েই চলে এসেছিল ঘরে—আজ আর কিছুই জোটেনি কপালে। মনটা খারাপ হয়ে যায় নবীর—খোদা যদি তার বান্দার দুঃখে কাঁদবেন তো তার মার জ্বর হবে কেন আজ? তাদের ঘরে আজ ভাত

জুটবে না কেন? এ তা'হলে আল্লার আঁহ নয়—শয়তানের পেশাব! শয়তান চায়না যে মানুষের দিলের আরজু পৌছুক গিয়ে আসমানে।

নবী বুঝতে পারে, আরো অনেক সুতোর দরকার হবে তার। সাত তবক আসমান পেরিয়ে গিয়ে তবেই না আল্লহ্‌র আরশ! সকালবেলা জর নিয়েই উঠে পড়ে হালিমা। কয়েক বাড়ি ঘুরে কিছুটা খাবার যোগাড় ক'রে নিয়ে আসে নবীর জন্য। নবী বলে—তুমি খাইবা না, মা?

না—হালিমা ধীরে ধীরে বলে—তুই খাইয়া দোকানে যা। নবী পিয়ে পিয়ে ফেনটা গিলে নেয়। তারপর মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে—তুমি চিন্তা কইরোনা মা—আল্লা আমাগো উপরে মুখ তুইলা চাইবো। এ হাল আমাগো বেছি দিন থাকবো না।

হালিমা ছেলের দিকে চেয়ে একটু করুণ হাসি হাসে—কিছু বলে না। টলতে টলতে এক সময় সে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। সে জানে না যে নবী দোকানে যায় না একদিনও—বাজারে ইস্টিশনে মুটেগিরি করে, আর পিলখানার ওপাশে ঘুড়ি ওড়ায়।

নবী মুটেগিরি ক'রে ক'রে রোজ কিছুটা সুতো কেনে। উর্ধ্ব হতে আরো উর্ধ্বলোকে পাঠিয়ে দেয় তার বিদ্রোহের নিশান। কিছুতেই থামতে পারে না নবী; তার নূরের জেল্লিতে সিনাই পাড় পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। তার দিকে হাত বাড়িয়ে দুঃসাহসী শিশু!

কিন্তু যতোই সুতো জুড়ে দিচ্ছে—ঘুড়ি ততোই ওপর হতে আরো ওপরে উঠছে—কোন কূল কিনারাই পায় না নবী। অতোদূরে—মানুষের নাগালের বাইরে এ-ভাবে আত্মগোপন করার কী মানে থাকতে পারে, কিছুই সে বুঝে উঠতে পারে না।

একদিন নবী সন্ধ্যের সময় ঘুড়ি উড়িয়ে ফিরে এসে দেখে—মা আজ বড়ো খুশি। পরনে তার নতুন শাড়ি—সান্‌কি আর বাটিতে ভাত-সালুন বেড়ে বসে আছে নবীর অপেক্ষায়।

বহুদিন পর সান্‌কি-ভরা ভাত দেখে পেট জ্বালা ক'রে ওঠে নবীর। সে সোজা গিয়ে বসে পড়ে হালিমার কাছে। খেতে খেতে মাকে বলে—মা অতো ছব্‌ পাইলা কই আইজ?

আজো জর ছিলো হালিমার। কিন্তু এই মুহূর্তে নবীর খাওয়া আর খুশি দেখে সে যেন সুস্থ হয়ে ওঠে হঠাৎ। ধীরে ধীরে বললে—কাহারটুলির জমিদার বাড়ির বউ মরছিল না, তারি কাতিহা আইছে আইজ, বহুত কাপড় চোপড়

আর টানা পয়ছা দান-খয়রাৎ করছে তারা। দেখ না—তোর লাইগা একটা লুঙ্গিও আনছি চাইয়া। হালিমা উঠে পড়ে এবং একটা ছোট্ট নতুন পুঙ্গি এনে দেয় নবীর হাতে।

বিস্ময়ে অবাক হয়ে যায় নবী। আজ বুঝি সত্যি তাদের দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন আল্লাহ্, ঘুম তাহলে ভেঙেছে তার আজ! শুকরিয়ার বান ডেকে যায় তার বুকে। ছলোছলো চোখে মার দিকে চেয়ে বলে—কইছিলাম না মা—এ হাল আমাগো বেছি দিন থাকবো না।

হালিমা নবীর এ-কথায় সায় দিতে পারতো না কোনোদিনই। কিন্তু এই মুহূর্তে সে সায় না দিয়ে পারে না। নবীর চোখে যেন সে পরিচয় পেয়েছে তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের।

জমিদার বাড়ির দেয়া পয়সা আর চালে ছুদিন ভালোই যায় তাদের আবার শুরু হয় আধ-পেটা খাওয়া আর উপোসের পালা। নবীর মন ভেঙে পড়ে—রাগে জ্বালা ধরে যায় তার সমস্ত সত্তায়। একি ছলনা—একি ছিনিমি'ন খেলা বান্দার জীবন নিয়ে? তাদের আরজু তা হলে এখনো গিয়ে পৌছায়নি খোদার কাছে।

নবী রোজ ঘুড়ি উড়ায় আর মনে মনে বলে—আল্লাহ্র আরশ পর্যন্ত পৌছুতে পারে এতো সুতো যদি সে কিনতে পা-ই পারে এতো ফেরেশ্তা রয়েছে কী জন্যে? তারাই তো মানুষের দিলের আরজু পৌছয় গিয়ে খোদার কাছে। আল্লাহ্র কাছ হতে তারাই পয়গাম নিয়ে আসে মানুষের কাছে। আজকাল এতো নিষ্ক্রিয় কেন এই ফেরেশ্তারা? কেন তারা নবীর ঘুড়িকে; নিয়ে যায় না আল্লাহ্র কাছে।

সেদিন সোমবার। নবী না খেয়েই ঘুড়ি আর লাটাই নিয়ে বেরিয়ে পড়ে চুপি চুপি। সেই ফণিমনসায় ঘেরা নির্জন জায়গাটুকু! নবী দূর্বার ওপর বসে নতুন সুতোটাকে জুড়ে দেয় পুরোনো সুতোটার সঙ্গে। আসমান কেমন যেন মেঘ্লা মেঘ্লা। সূর্যের আলো পড়ে মেঘগুলো শাদা হয়ে গেছে। আর ফাঁকে ফাঁকে চক্চক্ করছে গাঢ় নীল আসমান। এই সময় নবী ঘুড়িটাকে উড়িয়ে দেয় আসমানে,—তাতে তার লাটাই আর ঘুড়ি শন্শন্ ক'রে ধাওয়া করছে ঊর্ধ্বদিকে। নবী অপলক চোখে চেয়ে আছে ঘুড়ি পানে—আর রশিতে টান পড়ে পড়ে ঝিন্ ঝিন্ ক'রে উঠছে তার সারা শরীর। অকারণ উল্লাসে ভরে উঠছে নবীর মন। নবী কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। মন তার আবেগ-উৎসাহে থরথর করে কেঁপে উঠছে, কল্পনা স্বর্গ ঈগলের মতো ডানা মেলেছে আসমানে!

ঘুড়ি ক্রমেই ছোট হয়ে এলো। একসময় নবী বিস্মিত হয়ে দেখতে গেলো, তার ক্ষুদ্র ঘুড়িটার চারপাশে একটা বৃহৎ পাখি উড়ছে আর ঘুরছে। মাঝে মাঝে পাখিটা হারিয়ে যাচ্ছে মেঘের আড়ালে, আবার দেখা যাচ্ছে ডানা মেলে ঘুড়িটাকে কেন্দ্র ক'রে। আশ্চর্য, একবার ঘুড়ির রশি আটকে যায় পাখির পায়। নবীর হাতে টান পড়ে আর তাতেই সারা দেহ অজানা আশঙ্কায় দুলে ওঠে—পাখিটা ঘুড়ি নিয়েই ঘুরতে থাকে আরো দ্রুতবেগে। রশি আরো প্যাঁচ খেয়ে লাগে পাখির ডানায় আর পায়ে। হঠাৎ এক সময় নবী টের পায়, সুতো ঢিল হয়ে গিয়ে নেমে আসছে, আর ঘুড়ি ঘুরছে পাখির পিছে পিছে। নবীর এতোদিনের অহংকার মাটি হয়ে যায় আজ। আরশের পায়ায় রশি লাগিয়ে আরশকে টলিয়ে দেয়া আর সম্ভব হলনা জীবনে।

একাকী শূন্য মাঠে ডুকরে কেঁদে ওঠে নবী। দুচোখে-ভরা অশ্রু নিয়েই সে একবার তাকায় ঘুড়ির দিকে। একটা কালো বিন্দুর মতো পাখির পিছে পিছে ঘুরছে ঘুড়ি আর পাখিটা শুধু ঘুরে ঘুরে উপরের দিকেই উঠছে। আচম্‌কা নবীর মনে হলো—এতে পাখি নয়—এ যে ফেরেশ্‌তা,—জিবরাইল এসেছে পাখির সুরত ধ'রে তার ঘুড়িকে আল্লাহ্‌র কাছে নিয়ে যাবার জন্যে। দুচোখ ফেটে এবার কৃতজ্ঞতার অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে নবীর গাল বেয়ে; তার অশ্রু ধোয়া মুখে ফুটে ওঠে একটা অপূর্ব হাসি—বেদনায় আর আনন্দে ঝলমল্ করা।

নিজের বোকামির কথা ভেবে শরম হয় নবীর। এতোদিন পর ফেরেশ্‌তা এসেছে তার দিলের আরজু আল্লাহ্‌র কাছে নিয়ে যাবার জন্যে। আর সে কি না কাঁদছে, পাখি তার ঘুড়ি নিয়ে গেল বলে! চোখ মুছে সে তাকায় আসমানের দিকে—পাখি ত নেই—ঘুড়িও নেই, শুধু শাদা মেঘ, আর তারি ফাঁকে চক্‌চক্-করা গাঢ় নীল আসমান। অনেকক্ষণ নবী চেয়ে থাকে আসমানের দিকে, আবার তার চোখ ফেটে দরদর করে বেরিয়ে আসে কৃতজ্ঞতার অশ্রু। আজকে সে সার্থক—আজকে সে জয়ী! আর কোনো ভাবনা নেই তার, জিবরাইল এসে নিয়ে গেছে তার ঘুড়ি—নতুন পাতা খুলবে এবার জীবনের।

আবার আসমানের দিকে চেয়ে, এক পলক হেসে নবী বাড়ি ফিরে আসে। খুশিতে তার সারা শরীর আজ নেচে নেচে উঠছে। হালিমা উঠোনে বসে শাক বাছ্‌ছিলো—'মা-মা—হুনছো'—বলে নবী ঝাঁপিয়ে পড়ে হালিমার কোলে।

হালিমা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে পড়ে—তারপর রাগে ঠোঁট কামড়ে, টিপে ধরে নবীর ঘাড়—গর্‌গর্ ক'রে বলে—কোখে আইলিরে হারামজাদা? আইজ তোর রক্ত, আমি না বাইর কইরা ছাড়ুম না!

নবী তার মার রাগের কারণ বুঝতে পারে না—তবু, তার খুশির খবরটুকু সে না দিয়ে পারছে না তার মাকে;—মা, আইজ জিবরাইলেরে দেখছি—আমাগো খবর···

নবী কথা শেষ করতে পারে না—ধুম ধুম করে হালিমার শক্ত হাতের কিল পড়তে থাকে তার পিঠে। কিলোতে কিলোতেই বলে—ওরা দিবো আর আমরা খামু বইয়া বইয়া—ঝাঁটা মারু জিবরাইলের মুখে শতবার।

—মা, মা—তুমি গাল দিয়ো না, চিৎকার ক'রে ওঠে নবী—গুণা অইবো মা, আল্লা রাগ করবো।

হালিমার রাগ আরো বেড়ে যায়, গালের ফোয়ারা থামতে চায় না তার। নিরুপায় নবী কামড়ে ধরে তার মার হাত।

এবার যেন আগুন লেগে যায় হালিমার গায়। বিড়ির দোকানের মালিক আজকে ব'লে গেছে—নবী দোকানে যায় না কোনোদিনই; সুতরাং কাজ তার ছাড়িয়ে দেওয়া হলো আজ থেকে। দোকানীর কাছেই শুনেছে হালিমা—নবী নাকি কোথায় ঘুড়ি উড়ায় সারাদিন, আর সময় সময় ছুটে বেড়ায় বাজারে, ইস্টিশনে। খবরটা পেয়ে অবধি গোস্সায় আগুন হয়েছিলো হালিমা। এমন অবাধ্য শয়তান ছেলেকে দিয়ে কাজ কি? হালিমা এবার কঞ্চি হাতে নিয়ে সপাং সপাং মারতে থাকে নবীর পিঠে, হাতে, মাথায়।—হারামজাদা, তোর জ্বালার লাইগাই না আমার মাথা বিষ, আর তুই কিনা ফাঁকি দেছ আমারে। আমি মরলে জিবরাইল থাঙ্গা থাঙ্গা ভাত লইয়া আইবো না তোর লাগি।

আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায় নবীর পিঠ। চিৎকার করে সে কাঁদে এবং কামড়ে কামড়ে রক্তাক্ত ক'রে দেয় হালিমাকে। এক সময় প্রায় বেহুঁশ হয়ে সে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে।

রাতের বেলা হালিমার গায়ে জ্বর এসে যায়। নবী তার মার দিকে একবার চায়, এবং কিছু না বলেই ঘরের এক কোণে শুয়ে পড়ে মাটির ওপর। কিছুই পেটে পড়লো না তার। শুয়ে শুয়ে কপাল কুঁচকে, ঠোঁট ফুলিয়ে সে কটমট করে তাকিয়ে থাকে হালিমার দিকে।

তারপর, কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়লো, সে নিজেই জানে না।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নবী স্বপ্ন দেখলো: জিবরাইল তার ঘুড়ি নিয়ে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আসমানের দিকে ধাওয়া করেছে। এক সময় নীল আসমান দুদিকে সরে গিয়ে পথ করে দিল জিবরাইলের জন্যে। ফাঁকে ফাঁকে আবার

যাত্রা শুরু হলো—আবার একটা আসমান ফাক হয়ে গেল। আবার আরেকটা আসমান খোলার সঙ্গে সঙ্গে আগুন লেগে গেলো জিবরাইলের ডানায়, জিবরাইল তবু এগুচ্ছে নবীর ঘুড়ি নিয়ে। তারপর এক সময় খুলে গেলো সপ্তম আসমানের দরজা আর তারি ফাঁক দিয়ে একটা তীব্র আলোকচ্ছটা এসে ঝলসে দিলো নবীর চোখ দুটোকে। আর চাইতে পারলো না নবী—দু চোখে হাত দিয়ে চিৎকার ক'রে ওঠে ঘুমের ঘোরে—মাগো, আমার চোখ দুইটা পুইড়া গেলো।

চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে বসে নবী—গলে-যাওয়া দেওয়ালের উপর দিয়ে সূর্যের আলো তার নাকে মুখে এসে লাগছে॥

তৃতীয় রাত্রি

শওকত আলী

শীতের দুপুর তবু মনে হচ্ছে চোখের সামনে দুনিয়াটা যেন দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলছে। ধোঁয়াটে আকাশ প্রকাণ্ড রাগী ষাঁড়ের গায়ের মত দুলে দুলে উঠছে। দুচোখের ভেতরে মণির মধ্যে তীক্ষ্ণ আর স্থির একটা জ্বালা সূচীমুখ হয়ে জ্বলছে। মনে হচ্ছে কেউ চোখের মণি দুটোর ঠিক মধ্যিখানে একটা করে মিহি আর হালকা সূঁচ ঢুকিয়ে দিচ্ছে একটু একটু করে। জ্বরের ঘোরে গায়ের ব্যথা এখন আর বোঝা যায় না। গুটি ওঠার আগে পর্যন্ত ছিলো। এখন আর নেই। এখন রয়েছে জ্বালাটা। শরীরের কোন জায়গা ঝলসে যাবার পর ঘা হলে যে রকম জ্বালা থাকে—ঠিক সেই রকমের জ্বালা। জ্বালাটা একেক সময় সবকিছু ভুলিয়ে দিচ্ছে।

মাঝে মাঝে আবার খেয়াল ফিরে আসছে। বুকের ভেতরকার শুকনো পিপাসাটা হা হা করে উঠছে, চারপাশে তাকিয়ে দেখছে সে মেয়েটা এলো কিনা। হাতে একটা ঘটি অথবা মাটির ভাঁড়ে টলটলে ঠাণ্ডা পানি নিয়ে আসে কি না। অদূরে নদী আর কাশবন ধূ ধূ করছে। যদি উঠতে পারতো, সারাটা গায়ে যদি এমনি যন্ত্রণা না থাকতো তাহলে হয়তো বারান্দা থেকে নেমে চলে যেতো। কুড়ি ফুট উঁচু পার থেকে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ে আকণ্ঠ পানি খেতো মুখ ডুবিয়ে। কিন্তু গায়ের গুটিগুলো এমন জ্বালা করছে এখন যে তার হেঁটে চলে বেড়াবার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত আছে কি নেই বুঝতে পারছে না।

আকাশের দিকে মুখ মেলে পড়ে আছে সাজাহান ওস্তাদ। বহু দিনের পুরনো অব্যবহৃত বারান্দাটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করেছিলো কাননবালা। সেই স্বল্প পরিষ্কার খোয়া-ওঠা বারান্দার একপাশে লাট করে রাখা কাপড়-জামা আর বিছানা-চাদর লেপের সঙ্গে একাকার হয়ে শুয়ে রয়েছে। ঘরের ছাদটা ভেতরের দিকে ভাঙা। গোটা আকাশটা সেই ঘরের ভেতরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে রয়েছে। তাই বারান্দায় আশ্রয়।

কদিন হলো? মনে মনে হিসেব করতে চেষ্টা করে সাজাহান ওস্তাদ।

তারপর অদূরে নিষ্পত্র শিমুল গাছটার দিকে চাইলো। সেখানে ক'টা ফ্যাকাসে শকুন ঘাড় গুঁজে বসে রয়েছে। সারারাত ঐ শিমুল গাছটা থেকে শকুনের বাচ্চার কাতর কান্না শুনেছে। ক'টা শেয়াল এসে ঘুরে ফিরে গিয়েছে বারান্দার চারপাশে।

শীতের সূর্য ঝাঁকি মেরে মেরে ওপরের দিকে উঠছে। বারান্দার অর্ধেকটা জুড়ে রোদ পড়েছিলো। এখন সরে যাচ্ছে। উত্তরের হাওয়া বয়ে আসছে মাঝে মাঝে।

আমি মরে যাচ্ছি, বিড়বিড় করে বললো সাজাহান ওস্তাদ। কাননবালা গিয়েছে গরুর গাড়ির খোঁজে। সেই সঙ্গে খাদ্যবস্তু যদি কিছু পায়। কিন্তু আমি জানি এমনি একদিন ও বেরিয়ে যাবে আর ফিরবে না। গায়ের গুটিগুলো সব পাকতে আরম্ভ করেছে। এক সময় ওগুলো গলতে আরম্ভ করবে—পচা চামড়ার আর পুঁজের শুকনো দুর্গন্ধ বেরুতে থাকবে। শ্মশানের বড় বড় মাছি ইতিমধ্যে বারান্দায় এসে বসতে আরম্ভ করেছে। এক সময় ওগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে আসবে; সর্বাঙ্গ ছেয়ে যাবে। একটা গুটির মুখ দিয়ে ঢুকে আরেক গুটির মুখ দিয়ে বেরুবে। রাতে হয়তো কোন দুঃসাহসী শেয়াল এসে তার জ্যান্ত শরীরে কামড় দেবে—অদূরে শকুনের দল ডানা গুটিয়ে নেমে আসবে। আর সবাই অপেক্ষা করবে। একটু একটু করে গলা বাড়িয়ে মাথা নীচু করে ঠোঁটের বাঁকানো ডগা দিয়ে চামড়া টেনে ছিঁড়বে।

আমি তাহলে মরছি। অনেক মরণের খেলা দেখিয়ে, অনেক দুঃসাহসী মরণের খেলা খেলে শেষটা আমাকে মরতে হচ্ছে। একবার ত্রিফলা বর্শার একটা ফলা উরুতে গেঁথে গিয়েছিলো, একবার অনেক উঁচু থেকে শরীরে আগুন লাগিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়ে শরীর ঝলসে গিয়েছিলো, একবার রিং-এর খেলা দেখাতে গিয়ে দোলনার দড়ি ছিঁড়ে নীচে পড়েছিলো। অনেক খেলা খেলে—মরণের উত্তেগটাকে অসংখ্য লোকের চোখের তারায় তারায় নাচিয়ে আমি বেঁচে গিয়েছি—কিন্তু এবার আর বাঁচোয়া নেই।

হুঁ, আমি শালা তাহলে মরলাম। এই শ্মশানের ভাঙা ঘরে, আমি মরলাম। কলেরার ভয়ে মেলা শুদ্ধু লোক পালিয়ে গেলো, আমি গেলাম না—কিন্তু কলেরায় আমার মরণ হলো না, হলো বসন্তে।

সূর্যটা এখনো চোখে লাগছে। বারান্দাটা আলোকিত। আহা কত আলো! চারপাশে গ্যালারিতে থাক থাক মানুষ একসঙ্গে জোড়া জোড়া চোখে কৌতূহল আর উদ্বেগের জোনাকি জ্বালিয়ে বসে রয়েছে। সাজাহান ওস্তাদ মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। গায়ে আঁটো সিল্কের গেঞ্জি, জাঙিয়া মোজা, বুকের ওপর সার সার মেডাল ঝোলানো। আর তার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো মিস হীরা। আহা হীরার কি সুঠাম শরীর, কী প্রমত্ত জোয়ারের কলকল বাজলো দর্শকের রক্তের গতিতে। বাজনা বাজছিলো ধীর মৃদু লয়ে। করনেট আর সাইডড্রাম শুধু। এবার বিউগ্‌ল আর ড্রাম বাজতে শুরু করলো। ব্যাণ্ডমাস্টার সাধু খাঁ নজর রাখছিলো মিস ডায়মণ্ডের ওপর। এক একবার বাহু বিক্ষেপে, শরীরের ঝাঁকুনিতে দম্ দম্ করে সে ড্রামে ঘা দিচ্ছিলো।

কতো আলো, কত আলো! ব্যাণ্ডমাস্টার বাজাও, বাজাও—ম্যানেজার কুটুম্বারাও বিপুল দর্শক সমাগমে উত্তেজনায় অস্থির হয়ে কথা বলছিলো।

ত্রিফলা বর্শা এলো, তীক্ষ্ণধার ফলা তিনটির মাথায় কালো ভেলভেট জড়ানো—আর সেই ভেলভেটের মাথার ওপর একটা ছোবলাতে উদ্যত রুপোর সাপ; তার মণি দুটো মটর দানার মত বড় লাল চুনি পাথরের তৈরী। সাপটা দুলছিলো, মণি দুটো হিল্‌হিল্ করে কাঁপছিলো আর সামনে একে একে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছিলো মিস ডায়মণ্ড। একেবারে ওপরে উঠে একটা বাঁশের মাথায় ব্যালান্স করে সে একে একে কাপড় খুললো। ভেতরের লাল জাঙিয়া আর কাঁচুলি শরীরে নিয়ে সে দু পা বাঁশের ওপর রেখে পাশে দুহাত ছড়িয়ে দাঁড়ালো। এবং তারপরই সে পিকক্ করলো এক হাতের ওপর ভর করে। সেই দৃশ্য ঘটছে সাজাহানের সম্মুখে, সে বাঁশের নিচে ত্রিফলা বর্শাটা নিয়ে উঁচুতে তুললো। বিন্‌বিন্ স্বরে বাজনাটা বাজতে বাজতে চলেছে তখন।

এইবার, এইবার। মিস ডায়মণ্ড, ঝর্না দাস তুমি কত খেলা দেখাবে। যতদিন শরীরটার জওয়ানী ততদিনই তো। যতদিন ঐ উরু বিশাল থাকবে, যতদিন স্তনযুগ সুপুষ্ট আর উদ্ধত থাকবে ততদিনই তো। কিন্তু তারপর। আজ ম্যানেজারের তাঁবুতে শোবে কিন্তু মোহব্বত জমাবে আমার সঙ্গে—কাল যখন আমি পুরনো হয়ে যাবো তখন থাকবে অন্য কেউ। মিস্ হীরা, ছাখো ছাখো তোমার স্বল্প পোশাক থেকে কী রকম

আগুন জলছে ভাখো। সাপের চোখের মণি দুটোতে কি কুটিল লাল জলছে ভাখো।

বাজনাটা একসঙ্গে বেজে উঠেই ঝম করে বন্ধ হয়ে গেলো এবং সাজাহান ওস্তাদ মাটিতে শুয়ে শুয়ে অনুভব করল তার উরুতে তীব্র যন্ত্রণা। ত্রিফলা বর্শার ফলা বেঁধা উরুর তীব্র যন্ত্রণাটা এতোদিন পর সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে গিয়েছে। সেই যন্ত্রণা—কিন্তু জ্বালাটা কোথায়? সেই তীব্র আর ক্ষিপ্ত জ্বালাটা কোথায় গেলো?

সাজাহান ওস্তাদ পাশ ফিরলো। চোখে সামনের জগৎটা হলদে হয়ে আসছে। ক'টা কাক তারস্বরে চেঁচাচ্ছে ছাতের ওপর। কাছেই দেখলো কাননবালা মাটির ভাঁড়ে করে পানি নিয়ে আসছে।

খুব কষ্ট হচ্ছে!

না। খুব কি আর এমন।

গাড়ির ব্যবস্থা হলো না। আজ অনেকদূর গিয়েছিলাম। পঁচিশ টাকা দিতে চাইলাম তবু এলো না।

একটু পর শুকনো টোস্ট এনে রাখলো সামনে—খাও।

মুখের ভেতরে গুটি উঠেছে। সাজাহান ওস্তাদ পানিতে ভিজিয়ে ভিজিয়ে মুখে দিলো একটু একটু করে। চিনি নেই। কবেকার তৈরী টোস্ট কে জানে। এখন টকে উঠেছে। চা হলে হতো। হঠাৎ চা খাওয়ার ইচ্ছে অনুভব করলো সাজাহান।

কেমন লাগছে এখন? ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলো কাননবালা। মেয়েটাকে ক্লান্ত দেখলো সাজাহান। হাসলো একটুখানি। বললো, ভালো লাগছে, হ্যাঁ ভালোই আছি।

নতুন গুটি উঠেছে!

না, বোধ হয় ওঠেনি।

হায় ভগবান, এ কি কাণ্ড। চোখটা লাল কেন ওস্তাদ?

ও, সাজাহানের খেয়াল হলো একটা চোখে সে ঝাপসা দেখছে। বললো, গুটি উঠছে হয়তো।

উদ্বেগে আর সহানুভূতিতে মেয়েটা কেমন যেন হয়ে গেলো। দেখলো সাজাহান ওস্তাদ। মেয়েটার জন্য তার দুঃখ হলো। বললো, তুই চলে যা। ওদের পেয়ে যাবি কাঞ্চনগরের মেলায়। ওখানে দিন কয়েক ওরা থাকবে।

সোজা রাস্তা, কোন ভুল হবে না। আখানগরে গিয়ে রেলগাড়িতে উঠবি তারপর ঠাকুরগাঁয়ে নেমে বাসে চড়ে সোজা মেলা।

যাঃ, কি সব ভাবছো আজেবাজে। এখানে কেউ না থাকলে তো শেয়ালে খেয়ে ফেলবে তোমাকে।

আরে না, না, অত সোজা নয়। আমি মরবো না। জিন্দগীতে শুধু তো বেঁচেই গেলাম। এতো মরণের খেলা খেললাম কিন্তু মরলাম কই। দেখিস এবারও ঠিক বেঁচে যাবো।

একটু থেমে বললো, এ বরং ভালই হলো। পার্টি ছাড়তে পারছিলাম না। কেমন যেন মায়া পড়ে গিয়েছিলো। এই চান্সে একটা সুবিধে হয়ে গেলো। এবার নতুন পার্টি খুলবো।

থাক থাক ঘুমোও তুমি। কাননবালা ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলতে লাগলো, শালারা আমায় ছেড়ে পালিয়ে গেলো। না হয় মরেই যেতাম কলেরায়—তাই বলে ফেলে পালাবে!

অমন হয় কাননবালা। জিন্দগীটা মহা মূল্যবান বস্তু মানুষের কাছে, তাই জানের ভয়টা সব চাইতে বড় ভয়।

কিন্তু তুমি ভয় করলে না কেন?

আমার আবার ভয় কি। শালা বেয়ারিং চিঠির মত দিন কাটাচ্ছি। তুই মরতে বসেছিলি, ভাবলাম তোর এখনো বয়স আছে, মরবি কেন তুই। দেখি যদি বেঁচে যাস। তুই বেঁচে গেলি। এখন বেঁচে থাক আরো কিছুদিন। যতদিন বাঁচবি ছাখ জিন্দগীটা প্রাণ ভরে। বড় মজার জায়গা দুনিয়াটা।

রিং-এর খেলা দেখাতো কাননবালা। ভাঁটু রাজা তার দলে জুটিয়েছিলো। বলেছিলো, এ মেয়ের বদনে আসল সার্কাসের রক্ত আছে। হাওয়ার মত উড়তে পারবে। মনের জোর আছে লেড়কির। বেটি জিতা রহ। পিঠ চাপড়ে বলতো সে। ট্রাপিজের খেলা শেখাতে চেয়েছিলো ভাঁটু রাজা। ভাঁটু ট্রাপিজের খেলা দেখাতে দেখাতে হাত ফসকে পড়ে গেলো নিচে, ঘাড়ে চোট লাগলো আর ঘাড় ভেঙে লোকটা মরে গেলো। কাননবালা ঘোড়ার ওপর নাচলো কিছুদিন, কিছুদিন সাইকেল চালালো, চোখ বাঁধা খেলোয়াড়ের ধারালো ছোরার ফলার সামনে দাঁড়ালো। কাননবালা ফালতু খেলোয়াড় হয়ে থেকে গেলো। কিন্তু মরলো না।

এঃ সালি একদম বনবিল্লী হ্যায়! চন্দন পাল একদিন কাননের তাঁবুতে ঢুকতে গিয়ে চোট খেয়ে এসে বলেছিলো।

আহা সেই মেয়েমানুষগুলো! ফাইন ফাইন শরীরগুলো। নিটোল আর পরিপূর্ণ আর শক্তিমতী শরীরগুলো। স্পষ্ট করে ভাবতে পারছে এখন সাজাহান ওস্তাদ।

কমলা সার্কাসের ডরোথী আর ক্লাউন মদন মালহোত্রা। কী কেলেঙ্কারিটাই না হলো। ডরোথী ঘুরিয়েছিলো সবাইকে। অ্যাংলো মেয়ে ডরোথী জান খারাপ করে দিয়েছিলো সবার। ম্যানেজারের পর্যন্ত। সেই ডরোথী মরে গেলো সিংহের খাঁচায় নয়, খোলা জায়গায় প্র্যাকটিশের সময় ঘোড়ার চাট খেয়ে। মেয়েটা মরে গেলো কিন্তু তার পেছনে লেগে থাকা মানুষগুলো কেউ তার চিকিৎসার জন্য ব্যস্ত হলো না। বেতো ম্যানেজার মাথা কুটে মরলো, কিন্তু একটা লোককে পাঠাতে পারলো না ডরোথীর সঙ্গে। মেয়েটা হাসপাতালে মরে গেলো দুদিন পর।

কাননবালা মরার চান্স পায়নি। অমন খেলা তাকে কেউ শেখায় নি।

কত বছর থাকলি তুই গোল্ডেন সার্কাসে?

দশ বছর।

অনেকদিন হয়ে গেলো। এবার ফিরে যা, অন্য পার্টিতে ঢোক গিয়ে। এখনো বয়স আছে এখনো দেখতে ভালো লাগবে তোকে। নতুন খেলা শিখে নাম করবি।

আমি না হয় যাবো ওস্তাদ, কিন্তু তুমি!

আমিও কিছু একটা করবো নিশ্চয়ই।

আকাশটা এখন ধূসর। শীতের কুয়াশা কাটেনি। কাননবালা ছাতু ভেজালো। মেঘ করেছে আকাশে, হয়তো বৃষ্টি হবে। এই শীতে বৃষ্টি!

যদি তখন চলে না আসতাম তাহলেই ভালো হতো! মেলার কোন ঘরে থেকে যেতে পারতাম।

তা পারতাম!

কিছুটা বোকামি হয়েছিলো বইকি। মেলাতে কলেরা লাগলো—দনাদ্দন লোক মরতে লাগলো। সবাই পালালো। সাতদিন পড়ে থাকলো সাজাহান ওস্তাদ মেয়েটার পাশে। মেলার সরকারী ডাক্তারের ওষুধেই বেঁচে গেলো। মেয়েটার রক্তের জোর সত্যিই ছিলো। তারপর পার্টির খোঁজে রাস্তা ধরা। হারামজাদারা পাওনা টাকা পয়সা পর্যন্ত দিয়ে যায়নি। ওদের খোঁজে রাস্তায় নেমেই এই বিপদ। সকাল বেলাতেই ওর জ্বর জ্বর ভাব ছিলো, বিকেল নাগাদ হাঁটতে হাঁটতেই দেখলো গুটি উঠতে আরম্ভ

করেছে, গাঁয়ের ভেতরে জায়গা চাইতে কেউ থাকতে দিলো না। গতবারের মড়কে গোটা গাঁ উজাড় হয়ে গিয়েছিলো। তাই এই শ্মশানবাস। গাছতলায় বসে থাকতে থাকতে সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোয় সাজাহান ওস্তাদ নিজেই দেখেছিলো ঘরখানা। মনে হয়েছিলো হোক শ্মশান, তবু পাকা ঘরতো।

দেয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখলো। হিজিবিজি অসংখ্য দাগ কাটা। কোথাও কোথাও লোকের নাম, সাল, তারিখ। সম্ভবত শ্মশানে আসা শবদেহের নাম, মৃত্যুদিন। বড় বড় করে লেখা—নরনারায়ণ সাহা, ১৪ই অগ্রহায়ণ, সন ১৩৫২। এক জায়গায় লেখা—৺শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

একটা চোখ দিয়ে দেখা। ডান চোখটা বেদনায় টাটাচ্ছে না এখন আর।

ছাতু খেলো কাননবালা। তার আগে নদীতে ডুব দিয়ে এসেছে।

তুমিও কিছুটা খেয়ে ফেলো।

হ্যাঁ, খাবো। একটু পরে খাবো।

বিকেল হতেই আবার উঠলো কাননবালা।

যাই ওস্তাদ, দেখে আসি যদি কোন গরুর গাড়ি পাই।

সাজাহান হাসতে চেষ্টা করলো।

কাননবালা আকাশের পুব দিকে তাকিয়ে বললো, বিষ্টি আসতে পারে। তাহলে তুমি তো তুমি, আমি শুদ্ধু নিমোনিয়ায় মরবো।

সাজাহান ঘাড় কাত করে দেখতে চেষ্টা করলো মেঘাচ্ছন্ন পুবদিকটা। কেমন একটা স্তব্ধতা থমকে আছে। সাজাহান এবার হেসে উঠলো। এতোক্ষণ চেষ্টার পর। তারপর বললো, চোখটা বোধ হয় গেলো। কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

কাননবালার দ্রুত চলে যাওয়ার শব্দ শুনলো শুধু। কোন কথা না বলে চলে গেলো মেয়েটা।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে চেষ্টা করলো সাজাহান ওস্তাদ। দেখতে পেলো না। একটা চোখের ওপর ভারী আর ঝাপসা পর্দা আর অন্যটার দৃষ্টি শিমুল গাছটার আড়াল অবধি পৌঁছায় না—শুধু বুঝলো কাননবালা পালালো।

এ শালার ভালোই হলো। নিজের ভবিষ্যতটা বোঝা গেলো। এবার আর কি, ঠিক এখানে না হোক এই এলাকারই কোথাও মরে পড়ে থাকবো। এখনো মৃত্যুর আতঙ্কটা তার মনের ভেতরে আসছে না। আমার বুদ্ধিটা

এখনও কাজ করছে। বুঝতে পারছি। রোগের তরাসে বুদ্ধি-বিবেচনায় ঘোর লাগলেও স্পষ্ট বুঝতে পারছি। আমার ভবিষ্যতটা ফরসা।

কাননবালা তুই গেলি তাহলে। যা যা জিন্দগীটা এখনো তোর কাছে তাজী ঘোড়ার মত টগবগে। তোর জওয়ানীতে গরম রক্তের টগবগানি এখনো থামে নি। এবার যাবি জোয়ান মরদের কাছে যে তোর আসল তারিফ বুঝবে।

এই হয়। রক্তই হলো আসল। যতদিন রক্তের তেজ থাকে ততদিনই তো জিন্দগী। আর জওয়ানীই হলো জিন্দগীর আসল আসোয়ার। মোটা শরীর মাও লুন ব্যালান্সের খেলা দেশাতো। হারামজাদা পাখির মত উড়তো। হাতের কাজতো নয় যেন জাদু। তাক লেগে যেতো ওর খেলা দেখে। সেই মাও লুন টাকা জমাচ্ছিলো লুকিয়ে লুকিয়ে। জহরত বাই এর সঙ্গে চুটিয়ে মুহব্বত করতো। আর সেই সময় জহরত বাই-র তাঁবুর দরজায় অন্ধকারে ওর বুকে ছুরি চালিয়ে দিলো কে যেন। খোঁজ খোঁজ রব পড়লো আর তার পঞ্চাশটা গিনি নিয়ে জহরত বাই উধাও হলো।

সেই রক্তগুলো কী লাল ছিলো। হাজাকের উজ্জ্বল আলোয় সেই লাল রক্ত ফিনিক দিয়ে বেরুচ্ছিলো। ধড়ফড় করছিলো পাখির মতো হাল্কা মানুষটা। তারপর আস্তে আস্তে তার আতঙ্কিত চোখ মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেলো। লোকটার রক্ত শেষে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে এক সময় সে স্থির পাথরের মত ভারী হয়ে গেলো।

সেই রক্তেরই তেজ তো হল আসল। সেই রক্ত উত্তাল হয়, টালমাটাল করে তোলে জিন্দগীকে—দরিয়ার জোয়ারের মতন। আর এই জোয়ারটাই হলো জওয়ানী। সেই জওয়ানী নিয়ে আজ চলে গেলো কাননবালা। না গেলেও যাবে একদিন।

সাজাহান, ওরে কালু শেখ তুই এবারে মরলি। শুধু দুঃখ, মরবার সময় খেলা দেখিয়ে মরলি না। তোর শেষ খেলাটি কি হবে তাতো জানি। এক সময় তোর বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাবে, বাঁচবার জন্যে পাগল হয়ে উঠবি। মরতে ভয় পেয়ে এক সময় তুই ছুটে যেতে চাইবি। গোঙিয়ে গোঙিয়ে চেঁচাবি—কিন্তু মরণ থেকে পার পাবি না। হুঁচোট খেয়ে দিশা হারিয়ে জান হারিয়ে পড়ে যাবি কোথাও। তারপর সেখানে মরে যাবি।

শকুনের ঝাঁক পড়বে তোর লাশের ওপর। আজ হোক কি কাল হোক। এমনই তো হয়।

আকাশের মেঘটা এখন ছড়িয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে। সূর্য হেলে পড়েছে। গোটা বারান্দায় রোদ। ঘরের ভেতরের স্যাঁতসেঁতে দেয়ালে শ্যাওলা ধরেছে। একটা পাখি উড়ে এসে বসলো। মনে হলো পাখিটা কতকগুলো খড়কুটো ঝেড়ে ফেললো ওপর থেকে। মেঝেতে নীল রঙের ডিমের খোসা পড়ে রয়েছে।

শীত শীত লাগছে এখন। পায়ের কাছ থেকে চাদরটা টেনে নিলো সাজাহান ওস্তাদ।

আমি তাহলে মরছি! আবার বিড়বিড় করে বললো সে নিজেকে। মরবো আজই রাতে অথবা কালকে। ভাবনাটা ওকে ক্রমশই একটা ধূসর থেকে ধূসরতার এবং বিবর্ণ চিন্তার দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে লাগলো।

আমি মরে যাচ্ছি। আমি মরে যাচ্ছি।

উত্তরের ধূসর পাহাড়ী দিগন্ত সে দেখতে চাইলো একবার। একবার ইচ্ছে করলো দক্ষিণের খোলা মাঠে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যায়। উত্তরে হিমালয়ের পঞ্চচূড়া কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যেতো আকাশ পরিষ্কার থাকলে। তাঁবু থেকে সে বেরিয়ে প্রায় রোজই দেখতে যেতো। এখান থেকেও দেখা যাচ্ছে নিশ্চয়ই। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছে না। কিষণগঞ্জের খাগড়ার মেলা থেকে দেখা যেতো। হরিহরছত্রের মেলা থেকে দেখা যেতো, আলোয়া খাঁর মেলা থেকে দেখা গিয়েছে। পাহাড় আর প্রান্তর আর ঠাণ্ডা মওসুম—এ না হলে যেন সার্কাস হয় না। হিমালয়ের উঁচু চূড়োর দিকে তাকিয়ে মালাবার হিল্‌সের গল্প করতো বিশ্বনাথন। দিনের পর দিন এক মেলা থেকে আরেক মেলায় গিয়েছে। দেশ ভাগাভাগির আগে পর্যন্ত জমজমাট মেলা বসতো। হরিহরছত্রের মেলা আর খাগড়ার মেলার নাম ছিলো। তিব্বত থেকে, ইন্দোনেশিয়া থেকে ব্যবসায়ীরা আসতো। ন্যাড়ামাথা লাল কম্বলের আলখাল্লা পরা তিব্বতীরা কোমরে গুঁজে নিয়ে আনতো মৃগ-কস্তুরি, বর্মীরা বিচিত্র কাঠের বাক্সে বোঝাই করে নিয়ে আসতো মূল্যবান পাথর আর আসতো ইন্দোনেশিয়ার মুসলমান ব্যবসায়ীরা।

কিন্তু সেই দিন থাকলো না। 'কমলা' ভেঙে গেলো। 'জুবিলি' আধমরা হয়ে কোনরকমে বেঁচে রইলো। আর যারা নতুন বাজারের জন্যে চলে এলো এপারে তারা মরলো।

গোল্ডেন সার্কাসও ভাঙছে। তাকে বাঁচানোর চেষ্টা বৃথা। আজকাল আর সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী মেয়েরা সার্কাসে আসতে চায় না। কোম্পানীতে

পয়সা বেশি। বাঙলা দেশে মাসের পর মাস ধরে বৃষ্টি পড়ে—ভেজা মাটির ওপর ক্যাম্প খাটে শুয়ে থাকতে হয়। নীচে ব্যাঙের পিছু পিছু সাপ ঢুকে পড়ে, ব্যাঙে আর সাপের লুটোপুটি শব্দ হয়।

ভয়ে, অসুখে, বিনি রোজগারে গোল্ডেন সার্কাস ভাঙছে। কুটুম্বারাও চলে গিয়েছে সেই কবে। মিস ডায়মণ্ড পালিয়ে চলে গেলো কমলা সার্কাসে, গোল্ডেন জুবিলিতে গিয়ে জুটলো মনোহর্ কাউর। থেকে গেলো শুধু বুড়ো আশিফ আজাদ। ঝলমলে পোশাক পরে সে গোল্ডেন সার্কাসের বাঘের খাঁচায় ঢুকতো। আশিফ আজাদ বুড়ো গেলো না কোথাও, কিন্তু একে একে তিনটে বাঘই মরে গেলো। সুন্দরী মরলো বাচ্চা হবার সময় আর লাল বাহাদুর মরলো ঠাণ্ডা লেগে।

গোল্ডেন জুবিলি তারপর থেকে ভাবছে আবার ফিরে যাবে কি না। আবার ফিরে যাবে কি না বিশাল রুক্ষ উন্মুক্তিতে। এই শ্যামল শোভা সবুজ মাটি বহুত খতরনাখ্।

বেলা আর নেই। অন্ধকার দিগন্তের কাছ থেকে এখুনি তেড়ে আসবে। আর সেই অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে আসবে শ্মশানের শেয়ালগুলো। অন্ধকারের ওপারে তাদের চোখগুলো জ্বল জ্বল করে জ্বলবে। বারবার করে আসবে। তাড়িয়ে দিলেও আবার ফিরে আসবে। আর চেষ্টা করবে তার গায়ের মাংসে দাঁত বসাতে।

জ্বলজ্বল করে জ্বলছিলো অমনি লোভী পাশব আর ধূর্ত চোখগুলো। কাওসারবানু, তুমি এসেছিলে গোল্ডেন সার্কাসকে বাঁচিয়ে তুলতে। নাচ আর গান আর শরীরের লোভ দেখিয়ে ভাঙা আসর জমাতে চেষ্টা করেছিলে। গোল্ডেন সার্কাসের কাউণ্টারে আবার ঝমাঝম্ পয়সা পড়তে আরম্ভ করলো। সব ভালো হলো, সব ঠিক হলো—কিন্তু গোল্ডেন সার্কাস থাকলো না। যেখানে দুঃসাহসী ভাঁটুরাজা—রাজার মত অধীশ্বর ছিলো সেখানে এখন কাওসারবানু হলো মক্ষীরানী। ম্যানেজার থেকে আরম্ভ করে সবাই সমীহ করে কথা বলতো কাওসারবানুকে। কাওসারবানু বসে থাকতো। নাইলনের গোলাপী কামিজ তার ওপর শিফনের ঘোপাট্টা। পাঞ্জাবের মেয়ে এক লোকের হাত ধরে ভাগ্য-ভরসা করে ভেসে পড়েছিলো। ঢাকায় এসে সে লোক একদা উধাও হয়ে গেলো। আর কাওসারবানু তখন পথে এসে নামলো। ওকে জুটিয়ে নিয়ে এল কাননবালা। ট্রেনে আলাপ, সেই থেকে সই পাতানো এবং সেখান থেকে সার্কাসের তাঁবুতে।

কাওসারবানুর শরীরে আগুন ছিলো। একটা দামী হীরে যেমন এপাশ ওপাশ ফেরালে ঝলকায়—তেমনি ঝলকাতো কাওসারবানু। চোলি আর ঘাগড়া পরে সে আসরে নাচতো। চটকদার সিনেমার গানের তালে তালে। কে জানে সে কি নাচ। তার ঘাগড়া খসে খুলে পড়ে যেতো। চোলির পেছনের ফিতের বাঁধনগুলো ছাপিয়ে তার চামড়ার আর যৌবনের জৌলুশ উপছে পড়তো, বুকের দোলনে সে বাঁধন এক সময় পট্ পট্ করে ছিঁড়তো। আর বাজনার তালে তালে শেষ বাঁধনটি খুলে পড়ার মুহূর্ত পর্যন্ত সে নাচতো। এবং সেই শেষ বাঁধনটি খুলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সব বাজনা একসঙ্গে থেমে পড়তো আর কাওসারবানু, গোলাব কি রানী, দুহাতে উত্তুঙ্গ স্তন আড়াল করে বসে পড়তো।

কাওসারবানু অনেকদূরে এগিয়ে গেলো। হ্যাঁ অনেকদূর। তার নিজের জন্য আলাদা তাঁবু হলো। তার জন্যে লম্বা লম্বা আয়না এলো। সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতো নিজেকে। আর হাসতো। আর আড়ালে অন্ধকারের সঙ্গে মিশে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতো সার্কাসের ছোকরা কজনা। দেখতো তাঁবু ফুটো করে কেমনভাবে গোলাব কি রানী শুধু ঘাগড়া আর ব্রেসিয়ার পরে ম্যানেজারের গলা জড়িয়ে হাসে। কখনো বা সার্কাসের ছোকরা হাসান আলীর সঙ্গে কি রকম ঠাট্টা মশ্‌করার নামে বিছানার ওপর হুটোপাটি করে। ছলকাতো কাওসারবানুর যৌবন। তাই রাতের অন্ধকারে মিশে আসতো সেই লোভী শয়তানের চোখ। একে একে নিঃসাড়ে আসতো লোভী জোড়া জোড়া চোখ। অন্ধকারে সেই সব চোখে ধিকি ধিকি সবুজ আগুন জ্বলতো। কাওসারবানু দেখেও দেখতো না।

আহা! কি ফাইন 'বডি' ছিলো কাওসারবানুর। পুরুষ মানুষের তিয়াস মেটে মেয়েমানুষ পেলে। একবার পেলে তার তৃপ্তি আসে। কিন্তু এই মেয়েটার শরীর যেন অন্যরকম। একবার পেলেও ওর তিয়াস শান্ত হতো না। থামতো না। বুকের ভেতরের রক্তের গোপন জ্বালাটা উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকতো। তাই সাজাহান ওস্তাদ এক ঘণ্টার জন্য গিয়ে সারারাত থেকে এসেছে মেয়েটার কাছে। কিন্তু তার সঙ্গে শুয়ে রাত ভোর করে দেয়ার পরও মনে হয়েছে—মেয়েটার কিছুই পাওয়া যায়নি। কি পিয়াস মেয়েটার শরীরে।

আর তাই কয়েক জোড়া পাশবচক্ষু জীব অন্ধকারের মধ্যে কাওসারবানুকে নিয়ে চলে গেলো। সবাই চিৎকারটা শুনেছিলো। সবাই ছুটে গিয়েছিলো কিন্তু কিছুই করা যায় নি।

সেই পাশব চক্ষু জীবের দল আসছে।

পালাও সাজাহান ওস্তাদ, কালুয়া শেখ ভাগো। নইলে আজ রাত শেয়াল কামড়ে কামড়ে খাবে তোমাকে। পালাও এখনো দিনের আলো আছে আকাশের গায়ে।

কেমন আছো এখন ?

ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করছে কেউ।

না, গোলাব কি রানী কাওসারবানু নয়। কাননবালা আবার ফিরে এসেছে।

আবার সন্ধ্যার ধূসর আকাশ, মুছে যাওয়া দিগন্ত, আর সারা শরীরের জ্বালা।

আমি মরছি কাননবালা। তুমি এবার চলে যাও।

না, না, কিছু ভয় নেই। কাল সকালের দিকে গাড়ি নিয়ে আসবে। তিরিশ টাকা ভাড়া ঠিক হয়েছে। আখানগর স্টেশনে পৌঁছে দেবে।

সাজাহান ওস্তাদ চুপ করে শুনলো। একের পর এক কথা বলে যেতে লাগলো কাননবালা। কিন্তু সে কথায় যেন জোর নেই। মনের ভেতর থেকে যেনো কথাগুলো আসছে না। বললো, এবার চলো আমরা আলাদা সার্কাস খুলি।

তার কথার উত্তর দিলো না সাজাহান ওস্তাদ। শুধু অন্ধকারে হাসলো। আকাশে তখন তারা ফুটছিলো, যে মেঘটা একটু একটু করে জমছিলো তখন আর সেটা নেই। শুধু ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে।

রাত বাড়লো। পায়ের কাছে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়লো একসময় মেয়েটি। অন্যদিন ঘুমোবার আগে অনেক কথা বলতো, আজ কিছু বললো না। শুয়ে পড়ার আগে চাদর থেকে মুখ বার করে একবার বললো শুধু, আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। দরকার হলে ডেকো।

চোখের টাটানিটা এখন একেবারে নেই। কারণ শরীরের জ্বালাটাও কমেছে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যে কি রকম বিচিত্র একটা কাশি জেগে উঠছে। শীত লাগছে বেশি করে।

অদূরের শিমুল গাছ থেকে শকুন ছানার করুণ কান্না ভেসে এলো। কটা পেঁচা শ্মশান ঘরের ভাঙা দেয়ালের ফোকর থেকে হুপহুপ শব্দ করে উড়ে চলে গেলো। কটা শেয়াল ডাকলো। তারা ছুটোছুটি করছে নদীর ধারে। হয়তো কোন মরা লাশের অবশিষ্ট খুঁজে পেয়েছে।

আমি তাহলে মরলাম। মিথ্যে কথা বলছে আজ কাননবালা। এবার ও পালাবে। তারই জন্যে এমনি ছলনা। বিবেকটা ওকে জ্বালাচ্ছে। বিবেকটা জেগে রয়েছে বলেই ও বারবার করে ফিরে আসছে। নইলে কবেই পালাতো। যাক, চলে যাক। আমি বোধ হয় সেরে উঠছি। হ্যাঁ সেরে উঠছি। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে বুকের বাঁ-দিকে একটা টানধরা ব্যথা অনুভব করলো। ও কিছু না—ওরকম মাঝে মাঝে সবারই হয়। বুকের ব্যথাটাকে সে অস্বীকার করতে চাইলো।

আমি মরবো কেন! এতো মরণের ওপর দিয়ে খেলা দেখিয়ে এভাবে কুকুরের মত মরে পড়ে থাকবো কেন?

তার চিন্তাটা এখন বিপরীতমুখী চলতে আরম্ভ করেছে। একবার সে উঠে বসতে চেষ্টা করলো। উঠে বসেই দেখলো কয়েক জোড়া সার সার সবুজ আলোর বিন্দু সম্মুখের খোলা জায়গাটাতে।

শালারা আমাকে খেতে এসেছে। হাতের কাছে একটা কিছু পাওয়ার জন্য হাতড়ালো সাজাহান ওস্তাদ। না কিছু নেই। একপাটি জুতো হাতে ঠেকলো একসময়। জুতোটা ছুঁড়ে মারলো সম্মুখে। কয়েকজোড়া সবুজ আলোর বিন্দু সরে গেলো আশে পাশে, কিন্তু গেলো না। কিরকম ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ শব্দ করলো কয়েকবার।

এসেছিল শালারা। এতো তাড়াতাড়ি চলে এলি কেন! মেয়েটা যাক। জওয়ানীর কাছে, রক্তের তেজের মুখে এসে দাঁড়াচ্ছিস কোন্ সাহসে। শোন, আমার কথা শোন। এখন চলে যা! কাল আসিস। এখন গোলমাল করলে মেয়েটি জেগে উঠে কেলেঙ্কারি বাধাবে। যা ভেগে যা।

তবু পাশবচক্ষু জীবগুলো গেলো না। স্থির দাঁড়িয়ে জল জল করে জ্বলতে লাগলো।

নাঃ আমারই মনের ভুল। আমি ভুল বকতে আরম্ভ করেছি তাহলে। আমার শুয়ে থাকা উচিত এখন।

সাজাহান ওস্তাদ আবার শুয়ে পড়লো। শুয়ে শুয়ে সে একসময় অনুভব করলো বারান্দায় তার শরীরের চারপাশে কারা যেনো হেঁটে বেড়াচ্ছে।

নাঃ আমারই মনের ভুল। সে আবার বিড় বিড় করে চললো। আমি কাল নাগাদ অনেকটা ভালো হয়ে যাবো। বসন্তে আমি এ যাত্রায় আর মরছি না। মরলে আজ তিনদিনে মরে যেতাম। আমি সেরে উঠছি।

কালই জ্বরটা ছেড়ে যাবে। তারপর আমি চলে যাবো। শ্মশানে মানুষ বাস করতে পারে; শালা একদম রটন্ জায়গা!

সাজাহান ওস্তাদ ঘুমোতে লাগলো। বোজা চোখের ওপর সে লাল মেশানো একটা ধূসর জ্বালাময় আলো দেখতে লাগলো। আর একসময় হঠাৎ মনে হলো, তখন কতোরাত কে জানে, কাননবালা উঠে তাকে একলা ফেলে পালিয়ে যাচ্ছে! তার দম বন্ধ হয়ে গিয়েছে যেন। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে—তবু প্রাণপণে, জীবনের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে সে চেঁচিয়ে উঠলো, কাননবালা যাস না।

আর সেই চিৎকারের উত্তর শুনলো সে পাশের শিমুল গাছ থেকে। কটা শকুনের ছানা এক সঙ্গে চিৎকার করে শিশুর মতো কেঁদে উঠলো।

কি হলো, এরকম করছো কেন? খুব কষ্ট হচ্ছে?

অনেকগুলো উদ্বেগাকুল শব্দ ঝুঁকে পড়া মুখ থেকে বেরিয়ে এলো।

সাজাহান ওস্তাদ, হাত বাড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করলো মেয়েটার হাত।

তুই পালিয়ে যাচ্ছিলি?

কে বললো, কোথায়? এতো রাতে কোথায় পালাবো। সাজাহানের কপালে হাত রেখে বললো, তোমার তো জ্বর এসে গেছে!

কে জানে জ্বর এসেছে কি না। আমি ভালো হয়ে যাবো কাল। তারপর এখান থেকে চলে যাবো। তুই চলে যাচ্ছিলি, চলে যা।

কাননবালা সাজাহান ওস্তাদের অসুস্থ মাথাটা কোলে তুলে নিলো। সাজাহানের গা থেকে একটা দুর্গন্ধ বেরুতে আরম্ভ করেছে। তার নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে একটা সাঁই সাঁই শব্দ শুনতে পেলো সে। বুকে হয়তো ঠাণ্ডা লেগেছে। সাজাহান ওস্তাদের পাশে শুয়ে পড়লো কানবালা, তারপর দুহাতে লোকটাকে বুকের কাছে টেনে আনলো।

কে জানে ভোর হতে কতোক্ষণ বাকি। বারান্দার বাইরে শ্মশানের ওপর শীতের দীর্ঘরাত আর কুয়াশা-ঢাকা বিশাল আকাশ থেকে আরো ঠাণ্ডা বয়ে আসছে তখন। পঞ্চচূড়া কাঞ্চনজঙ্ঘা আবার উত্তরের দিগন্তে ঝলমল করে উঠবে—যদি কাল আকাশ পরিষ্কার থাকে॥

অবেদ্য

আহমদ মীর

বৃষ্টির যেন বিড় নেই। সারাদিন পড়েই চলেছে। ঝুপ্‌ঝুপ্‌ রিম্‌ ঝিম। থামবার নাম নেই। এ বৃষ্টি ধরবার কোন লক্ষণই দেখা যায় না। তিন দিন ধরে এমনি চলেছে। আকাশের অবস্থা দেখে মনে হয় আরো কত দিনই বোধ হয় এমনি চলে যাবে। নিমের ডালে একটা কাক বসে ভিজছে অঝোরে। ঠোঁটটা আকাশের দিকে উঁচিয়ে কুঁকড়ে বসে বসে ভিজছে। জানলার পাশে কাঁঠাল গাছের আঁধার ঝোপের মধ্যে নাম না-জানা একটা পাখি অদ্ভুত এক ধরনের একটা শব্দ করছে। মাঝে একটু করে চুপ থেকে আবার ডাকে, পুক্‌ পুক্‌ পুক্‌। বৃষ্টির মতোই একঘেয়ে। তিন দিন ধরে এই একই দৃশ্য, একই সুর আর মনের একই একঘেয়ে বিরক্তিকর একটা উৎসাহহীনতা। কিছুই ভালো লাগে না। তাকিয়ে থাকতে খারাপ লাগে। চোখ বুজে বসে থাকলে অস্বস্তি লাগে।

জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে বসে আছি। রাস্তায় কেউ নেই। মাঝে-মধ্যে দু'একটা মোটর যেন নিঃশব্দে চলে যাচ্ছে। আস্তে করে ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ি একটা ঠিক আমার জানালার সুমুখে এসে থেমে গেল। আমাদের বাগানের কাঁঠাল গাছের কটা বড়ো বড়ো ঝাঁকড়া ডাল রাস্তায় ঝুঁকে পড়েছে। ঘোড়ার গাড়িটা ঠিক পাতার ঝোপের নিচে গিয়ে দাঁড়ালো। বোধহয় সারাদিন ভিজে বেচারী কোচওয়ানের শীত ধরে গেছে। কোচবাক্সে বসে বসেই লোকটা ভিজে সপ্‌সপে লুঙ্গির নিচের অংশটা দু'হাতে নিংড়ে নিতে লাগলো। গেঞ্জিটা খুলে কাঁধে রেখেছে। এবার যেন বৃষ্টিটা আবার জোর এলো। লোকটা এবার ক্ষিপ্রগতিতে দু'তিন ধাপে গাড়ির ওপর থেকে নিচে নেবে এলো। দরোজা খুলে গাড়ির মধ্যে গিয়ে বসলো। ঝুঁকে পড়ে গদির নিচে থেকে টিনের একটা ডিবে বের করে তা থেকে বিড়ি নিলো একটা। তারপর হাত দুটোর একটা পরিতৃপ্ত ভঙ্গি করে বিড়িটা ধরিয়ে সুদীর্ঘ টান দিলো।

ঘোড়া দু'টো মাথা নিচু করে বৃষ্টির সঙ্গে যেন নীরবে যুঝে চলেছে। মাঝে মাঝে সমস্ত শরীরটা একেকবার ঝাঁকানি দিয়ে হাল্‌কা

এক টুকরো চি হিঁ শব্দ করে উঠছে। বিরক্তির কি খুশির ডাক কে জানে। বোধহয় খুশির, কেন না সে ডাক শুনে গাড়ির ভেতরে ওদের মালিকের মুখে এক টুকরো হাসি ফুটে ওঠে। মনে মনে বিড় বিড় করে লোকটা যেন কি বলে। বোধহয় ঘোড়া দুটোকেই উদ্দেশ করে কিছু বলে থাকবে। হঠাৎ গাড়ির জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে লোকটা আমাদের বাগানের দেয়ালের দিকে মুখ করে থুথু ফেলে। আশ্চর্য তো! এতো আমার চেনা মুখ। ভালো করে ঠাহর করে দেখলুম। ঠিকই, ভুল হবার কি যো আছে। সেই ধক্-ধকে আগুনের ভাঁটার মতো একটা চোখ। আরেকটা আঁশফলের মতো শাদা। শাদা কানা চোখটার মণি নেই। এ চেহারা ভুল হতে পারে না। লোকটাও বোধ হয় আমাকে চিনেছে। দরোজা খুলে নেবে আসছে। পরক্ষণেই আমার জানালা বরাবর পাঁচিলের পাশে এসে দাঁড়ালো। কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে আমিই বললুম—কি খবর পেয়ার আলী মিঞা? এতদিন কোথায় ছিলে?

প্রথম কয়েক মুহূর্ত পেয়ার আলী একটু ইতস্তত করছিলো। এখন ওর নাম ধরে ডাকায় যেন পরম নিশ্চিন্ত হলো। আকর্ণ হেসে বললো—আর বলুনি ফরিদুদ্দি ছায়েব। শালার জলাজলি হয়ে গেল।

ঠিক তেমনি আছে। ওর সঙ্গে শেষ দেখা বোধ হয় বছর তিনেক আগে। পঞ্চাশের দাঙ্গায় সর্বস্ব খুইয়ে পেয়ার আলী ঢাকায় এসে পৌছয়। হাওড়ায় ওকে যে দেখেছে সে আজকের পেয়ার আলীকে বোধ হয় চিনতেই পারবে না। আমিও পারিনি তিন বছর আগে। এখানে পৌছনোর পর তিন চার বছর ধরে এমন কোন কাজ নেই যা পেয়ার আলী করেনি। স্টেশনে মোট বওয়া, ছুতোরের কাজ, ওস্তাগরের জোগাড় দেয়া এমনি কত কাজ। কঙ্কালসার শরীরটা শুকোতে শুকোতে এমন এক পর্যায়ে এসেছিল যখন নাকি হাড় ক'খানা ছাড়া শুকোবার মতো বোধ হয় আর কিছুই থাকে নি। এমনি অবস্থাতেই ওর সঙ্গে একদিন দেখা হয়ে গেল। আমি না চিনতে পারলেও পেয়ার আলী আমাকে দেখেই চিনেছে। আমার হাত দুটো ধরে আবেগকম্পিত স্বরে বলেছে—কি ফরিদুদ্দি ছায়েব, চিনতে পারলে না? আপনাকে তো দেকেই চিনিচি।

সত্যিই চিনতে পারিনি। হাওড়ায় পেয়ার আলীর তিনটে ছ্যাকড়া গাড়ি ছিলো। নিজে একটা চালাতো। আর দুটো ঠিকেয় দিয়েছিলো। আর্থিক স্বচ্ছলতার সাথে পেয়ার আলীর চেহারা আর পোশাকের তখন ছিলো

একাত্ম সম্পর্ক। ইয়া একজোড়া পুরুষ্ট গোঁফ। সদাই মুচড়ে তা দিয়ে উদ্ধত করে রাখতো। বার্নিশ পাম্পসু। চেক কাটা মাদ্রাজী লুঙ্গির ওপরে আদ্দির পাঞ্জাবী। তার ওপর আবার জরিদার লাল ভেলভেটের ওয়েস্ট কোট। পেয়ার আলী বড়ো শৌখিন মানুষ। সব সময়েই ওয়েস্ট কোটের বুক পকেটে সবুজ সার্টিনের একটা রুমাল রাখাটা পেয়ার আলীর ছিলো আভিজাত্য। হাবভাব আর সমব্যবসায়ীদের প্রতি ওর ব্যবহারও ছিলো রীতিমতো অভিজাত শ্রেণীর। খুব কম লোকের সঙ্গেই ও হেসে কথা বলতো। অন্য কোচওয়ানরা এতে ক্ষুণ্ন না হয়ে বরং খুশিই হতো। তারাও চাইতো বোধহয়, তাদের সর্দার, একটু অসাধারণই হওয়া উচিত।

পেয়ার আলী কিন্তু আমার কাছে এলে সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ হয়ে যেতো। পাড়ার লোক হিসেবেই যে শুধু আমাকে সমীহ করতো তা নয়। ওর জীবনের সব কিছু সবিস্তারে পেয়ার আলী যখন বলতে বসতো তখন আমার চেয়ে ধৈর্যশীল শ্রোতা বোধ হয় ও আর কাউকে দেখেনি। প্রায়ই সন্ধ্যে বেলা আমার ছোট বারান্দাটায় এসে বসতো। টিনের কৌটো থেকে গোল্ড ফ্লেক সিগারেট বের করে আমার দিকে বাড়িয়ে দিতো। তারপর নিজে না ধরিয়ে কৌটোটা পকেটে রেখে দিয়ে নিজের বিচিত্র জীবনের কতো কথাই না অনর্গল বলে যেতো। আমার সুমুখে ওকে কোনদিন সিগারেট ধরাতে দেখিনি। কতো কথাই বলে যেতো। কিছু শুনতুম, কিছু অন্যমনস্ক মনে শোনাই হতো না। এমনি করে অনেক রাত হলে এক সময়ে পেয়ার আলী নিঃশব্দে উঠে যেতো। যাবার আগে মাথা দুলিয়ে বলে যেতো—আচ্ছা, চলি ফরিদুদ্দি ছায়েব। দুপা এগিয়ে তখুনি আবার ফিরে এসে পেয়ার আলী হাত দুটোর একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করে আর ত্বরিত একটু জিভ কেটে বলতো—খোদার কচম্ ফরিদুদ্দি ছায়েব, আপনার সাতে দুটো কতা বলে বড্ড আরাম পাই। দু লম্বর পরিবারটা বড়ো খিটখিটে, নইলে রোজ আসতুম। শালার মাগীর গেলে জলাঞ্জলি হয়ে গেল।

বছর দুয়েক আগে পেয়ার আলীর সাথে শেষবারের মতো দেখা হয় তখন দেখেছি পেয়ার আলী আবার আস্তে আস্তে নিজের দুরবস্থা কাটিয়ে উঠেছে। নিঃস্ব অবস্থায় এখানে এসে তিন-চার বছরে ও আবার নিজের একটা ছ্যাকড়া ঘোড়ার গাড়ি করেছে। হাওড়ার সেই জৌলুশ না থাকলেও হারানো চাকচিক্য যেন বেশ কিছুটা ফিরে এসেছে। দেখে বেশ ভালো

লেগেছিল। বলেছিলুম—যাক এখানে এসে প্রথম দিকে তোমার যে অবস্থা হয়েছিল এখন অনেকখানি কাটিয়ে উঠেছ। আরো চেষ্টা করো।

আমার কথায় পেয়ার আলী সেদিন জিভ কেটে বলেছিল—খোদার কচম ফরিদুদ্দি ছায়েব। আপনি তো সবই জানো, খোদার ইচ্ছেয় খাট্‌নিকে ভয় করি না। শালার রায়টের সময়ে এক কাপড়ে, শুধু পরিবার দুটোর হাত ধরে এখানে এসে দাঁড়িয়েচি। তারপর তিন চারটে বচর কি না করিচি দুটো পয়সার লেগে। আপনাদের দোয়ায় খোদা মুক তুলে চেয়েচে। তবে কি জানো?

কথা অসমাপ্ত রেখেই পেয়ার আলী আমার আরো কাছে সরে এসে প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বলেছে—তবে কি জানো? তোমাকে খবরটা দেয়া হয়নি। তিন লম্বর পরিবারটা বড়ো বেহেট। জলাঞ্জলি করে দিচ্চে। মাগীর বাপের অবস্থা খুব ভালো। সাতটা রেশ্‌কো চলে। মাগীর দেমাক একটু বেশি। তবে আমিও কম নয়। আপনি তো দেকেচ আমার কি বাড়বাড়ন্ত অবস্থা ছ্যালো।

সান্ত্বনার স্বরে বলেছি—তা তো নিশ্চয়ই।

পেয়ার আলী আকর্ণ হেসেছে, তারপর বলেছে—আবার সব হবে। আপনাদের মা-বাপের দোয়ায় সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তন ও মাগীর ফাঁদে আমি পা দিচ্চি না, এটুকু আপনাকে বলে রাকলুম। আপনি দেকে লিও, আমার কথার লড়চড় হবেনি। ছ্যাকড়া বেচে রেশ্‌কো আমি কুনুদিন করবুনি। ওটা আবার ব্যবসা, শালা ছোটলোকের কারবার। মাগী যতো জলাঞ্জলি করুক ওর ফাঁদে পা দিচ্চিনি বাবা। বিশ্বেস না হয় আপনি নিজে পুচ্ করে দেকো, মাগীকে ক্যামন কড়া শাসনে রেকিচি।

এক মুহূর্ত ও আমার দিকে কট্‌মট্ করে চেয়ে থাকে। বোধ হয় ওর কড়া শাসনের আভাস দেয়।

পেয়ার আলী যে শেষ পর্যন্ত তার জিদ্ বজায় রেখেছে তা এতোদিন পরেও দেখা গেলো। ওর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী যে পেয়ার আলীকে তার আভিজাত্য বিসর্জনে রাজি করাতে পারেনি স্পষ্ট তা বোঝা যাচ্ছে।

হাত ইশারা করে গেট দিয়ে ওকে ভেতরে আসতে বললুম। ঘরে ঢুকে পেয়ারী আলী মেঝেতে উবু হয়ে বসলো। তারপর মুখে অস্ফুট একটা আওয়াজ করে বললো—শালার পানি লেগিয়েচে বটে। তিন দিন ধরে রোজগারপাতি একদম বন্দ।

কথা শেষ করে উদাস চোখে খানিক বাইরে তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো—অনেক দিন পরে আপনার সাথে দেখা হলো। ত্যাকেন কাণ্ড, দু'বেলা একান দিয়েই তো যাই। চোখের সামনে থাকো অথচ কতো বচর শালার দেকা হয়নি।

হেসে বললুম—বেশতো এবার নিশ্চয়ই দেখা হবে। কি বলো?

পেয়ার আলী ওর কাঁচাপাকা গোঁফ জোড়া হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ভালো করে মুছে নিয়ে বললো—লাও কতা, দেখা তো হবেই। আজি আপনাকে একবার আমার ওকানে লিয়ে যাবো। বিশেষ জরুলি কতা আচে।

এক মুহূর্তে নিজেকে বিড়ম্বিত মনে হলো। এই বৃষ্টি-বাদলে আবার টানা-হ্যাঁচড়া। আচ্ছা মুশকিলেই পড়া গেল দেখছি।

আমার মনের কথা টের পেয়েই যেন পেয়ার আলী বলে—আচ্চা আজ না হয় কাল পরশু এসে লিয়ে যাবো। শুদু মাগীর তেজটা আপনাকে দেকাবো। এই তিন বচরেও ওর তেজ কমেনি। খালি এক কতা মুখে লেগে আচে, ছ্যাকড়া বেচে রেশ্‌কো করো। আরে মলো, ওটা কি ভদ্দর নোকের ব্যবসা। শালা বাপদাদার ব্যবসা, বনেদি কারবার ছেড়ে ছোটলোকের কারবারে লাক গলিয়ে মরি আর কি।

কথার শেষে পেয়ার আলী খানিকক্ষণ বোবার মতো এক দৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে থাকে। লাল টকটকে ভালো চোখটার পাশে ওর গলা শাদা চোখটা এক মুহূর্ত বীভৎস মনে হয়। পেয়ার আলী এবার হাসে। ছ্যাতলা পড়া হলদে দু'পাটি দাঁত। হাসতে হাসতে বলে—শালার এক লম্বর পরিবার হলে এতদিনে কবে লেতিয়ে বিদুই করে দিতুম। কিন্তন যাই বলো তিন লম্বরটা বড়ো চালাক মেয়েমানুষ। বয়েসটা একটু ভারী, তবে হ্যাঁ রূপ বটে। খোদার কচম্ বলচি ফরিদুদ্দি ছায়েব আপনি বিশ্বেস করবে না। যকন ভালো কাপড়টা বেগিয়ে পিদে মাতার চুলে চুঁটি গেঁতে আমার আশেপাশে ঘুরঘুর করে, ত্যাকন দেখতে লাগে ঠিক আপনাদের ঘরের ইস্কুলের মেয়ের মতন। ত্যাকন শালার কাম-কাজ আর কিছুই ভালো লাগে না। তবে শালীর মনটা ভারী শক্ত, জল্লাদের মতন।

পেয়ার আলী কথার ফাঁকে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বলতে থাকে—খোদার কচম্ ফরিদুদ্দি ছায়েব, একেক সময়ে মনে হয় ওই শালীর কথাই ঠিক। ঘোড়ার গাড়িতে আজকাল আর পয়সা নেই। সবাই আজকাল রেশকোই চড়তে চায়। কিন্তন সব চেয়ে বড়ো কতা কি জানো? শালার ঘোড়া দুটোর

মায়া ছাড়তে পারিনি। চার বছর ধরে নিজের হাতে খাওয়াচ্ছি, গা মলে দিচ্ছি।'

পেয়ার আলীর ঘোড়া প্রীতিকে আরো একটু প্রশ্রয় দিয়ে বললুম—তোমার এই ঘোড়া দুটো সেই হাওড়ায় তোমার নিজের হাতের গাড়িটায় যে ঘোড়া দুটো ছিলো ঠিক সেই রকম দেখতে।

আমার কথায় পেয়ার আলী হঠাৎ করে দু'হাতে মুখ ঢেকে মাথা নিচু করে খানিকক্ষণ স্থাণুর মতো বসে রইলো। বেশ খানিকক্ষণ পর মুখ তুলে আমার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। দু' চোখ বেয়ে অজস্র ধারায় পানি গড়িয়ে পড়ছে। কান্নাভাঙা স্বরে পেয়ার আলী বললো—দোহাই ফরিদুদ্দি ছায়েব, উ কতা আর মুখে এনোনি। মনে পড়লে বুক ফেটে যেতে চায়। ঠিক, ঠিক বলেচ। এর লেগেই তো শালার যতো ঝগড়া-ঝাঁটি। মন ঠিক করতে পারিনি।

এর মধ্যে পেয়ার আলীর সঙ্গে বোধহয় মাস কয়েক আর দেখা হয়নি। কি একটা কাজে উয়ারীর ওদিকে গিছলুম। বিকেল। রেল লাইনের ধার দিয়ে হেঁটে চলেছি। পেছন থেকে নাম ধরে কে যেন ডাকছে। মুখ ঘুরিয়ে দেখি হাসি মুখে পেয়ার আলী দাঁড়িয়ে আছে। হাত তুলে লাইনের ধারে ভরজা বাঁশের একটা ঘর দেখিয়ে পেয়ার আলী বললো—ওই যে ফরিদুদ্দি ছায়েব, চলো না একবার দেখে আসবে।

অগত্যা রাজি হতে হলো। লাইনের ধারেই বাঁশ আর দরমার কুঁড়ে ঘর একটা। তার পাশেই লম্বা একটা একচালার নিচে দুটো ঘোড়া বাঁধা রয়েছে। হাড় জিরজিরে অসহায় দৃষ্টি। একটা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। আর একটা শুয়ে আছে পেছনের পা লম্বা করে। বোধহয় অসুখ। পেয়ার আলী নিজেই ব্যাখ্যা করলো—শালার ইস্টিশন থেকে আসবার সময়ে কাল ড্রেনের মধ্যে পা হড়কে ঘোড়াটা জকম হয়ে গেল। বোধহয় পাটা ভেঙেই গেচে। বড্ড ঝামেলার কাজ। ক'দিন গাড়ি বসে থাকে খোদাই মালুম!

কথা বলতে বলতে পেয়ার আলী আমাকে একেবারে ওর ঘরের ভেতরে নিয়ে গেল। ঘর বলতে একটি মাত্র খুপরি। একপাশে বেড়া দিয়ে আরেকটা ছোট খুপরি বানিয়েছে। ওখানেই বোধহয় রান্না-বান্না হয়। অন্তত ভাঙচিনের বাসন আর কাচের চুড়ির আওয়াজে তাই মনে হলো। স্যাঁতসেঁতে মেঝের এক কোণে কটা ছেঁড়া মাদুর আর জীর্ণ কাঁথার টুকরো। ক্ষিপ্র হাতে ওগুলি সরিয়ে পেয়ার আলী আমার বসবার জায়গা করে দিলো। তারপর

হাত কচলে পরম বিনীত কণ্ঠে বললে—আপনি একটু বসো, জরুরি কতা আচে।

বলেই ও বেড়ার ওপারে চলে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটা টিনের মগে খানিকটা কালচে চা আর অ্যালুমিনিয়মের একটা ঢাকনিতে দুটো থিন অ্যারোরুট বিস্কুট এনে সামনে রাখলো। তারপর আমার মুখের কাছে মুখ এনে পেয়ার আলী বললো—আপনি তো সবই জানো, শালার এই পরিবারকে লিয়ে জলাঞ্জলি হয়ে গেল।

অবাক হলুম। আবার নতুন কিছু গোলযোগ বেধেছে নাকি। জিজ্ঞাসু চোখে ওর দিকে তাকাতেই পেয়ার আলী নিজেই বিস্তারিত হলো—শালার ঘোড়াটা বেয়াড়া রকম জকম হয়েছে। আমি ভাবছি কি গাড়ি ঘোড়ার কারবার তুলেই দিই। দরকার নেই ওসব ঝামেলায়। রেকশোর কারবার ঢের ভালো। আপনি কি বলো?

পেয়ার আলী ওর ভালো চোখটা আমার মুখের ওপর স্থির করে রাখলো। ভালমন্দ কোন জবাব আমার মাথায় এলো না। পরিত্রাণ পাবার আশায় বললুম—চলো তোমার ঘোড়াটা দেখি।

সত্যিই ঘোড়াটা সাংঘাতিক জখম হয়েছে। উঠতে পারেনা। তবে চিকিৎসা করালে হয়তো ভালো হলেও হতে পারে। সেই কথাই বললুম ওকে। পেয়ার আলী মুখে এক হতাশার ভঙ্গি করে বললো—আর বলুনি, যা আয় করি শালার ঘোড়ার পেটেই সব যায়, তার আবার চিকিচ্ছে। আমি বলি কি ও আপদ বিদেই করাই ভালো। খোদার কচম ফরিদুদ্দি ছায়েব, কাল থেকে এক বেলা চুলোয় আগুন পড়েনি।

চালাটার পাশেই চুড়ির আওয়াজ হলো। পেয়ার আলী মুখ তুলে তাকালো একটু। এক মুহূর্ত হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো ওর মুখ। অন্তরালবর্তিনীর উদ্দেশে একটু জোরে বললো—লাও—না গো তোমার পীরই সিন্নি খেলো, শালার গাড়ি-ঘোড়ার পাট চুকিয়েই দিলুম, আর—

আরো কি বলতে গিয়ে পেয়ার আলী কি যেন দেখে বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে গেল। একহাতে একটা অ্যালুমিনিয়মের বাটি আর অপর হাতে খানিকটা ছেঁড়া ন্যাকড়া নিয়ে পেয়ার আলীর তিন নম্বর বউ দ্রুত গতিতে আমাদের ছাড়িয়ে একেবারে জখম ঘোড়াটার পায়ের কাছে গিয়ে বসলো। বাটি থেকে চুন আর হলুদ নিয়ে ন্যাকড়ায় মাখাতে লাগলো। আমরা দু'জনেই যুগপৎ স্তম্ভিত বসে আছি! বেশ ক্ষিপ্র হাতে ঘোড়ার

খোঁড়া পায়ে একটা পটি বেঁধে মেয়েটি মাথা নিচু করে আবার আমাদের সম্মুখ দিয়ে তেমনি দ্রুত পায়ে চলে গেল। ও চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পেয়ার আলীও বিদ্যুৎ বেগে ওর পেছনে পেছনে পাশের ঘরে চলে গেল। মাঝে কয়েকটা বোধহয় বিস্মিত মুহূর্ত।

পেয়ার আলী আবার এলো। বজ্রাহত চেহারা, মুখে কথা সরে না। কিছু জিজ্ঞেস করতেও আমার ভয় হতে লাগলো। অগত্যা কিছু না বলেই উঠে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছি, ও খপ করে আমার হাত দুটো ধরে ফেললো, প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো—শালী বলে কি জানো? বলে ঘোড়ার গাড়ির কারবারই আমাদের ভালো, কাজ নেই রেশ্‌কোয়।

হাতের চেটোয় চোখ মুছে পেয়ার আলী এক মুহূর্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো, বললো—শালার রেশকোর কারবার কি ভালো মানুষে করে। আর হ্যাঁ, আপনাকে তো বলনু গো, শালার জলাঞ্জলি হয়ে গেল।

পেয়ার আলী ওর ভালো চোখটা আমার দিকে তুলে ধরলো। বর্ষণক্লান্ত আশ্বিনের শাদা চাঁদের স্নিগ্ধ আলো সে চোখে। নিঃশব্দে আরো একটু কাছে সরে এসে ফিস্ ফিস্ করে পেয়ার আলী বললো—যাই-বলো তিন লম্বর এই পরিবারটার মন কিন্তুন ভারী লরোম। খোদার কচম বলচি ফরিদুদ্দি ছায়েব।

অবিনাশের মৃত্যু

হাসান মামুদ

সন্ধ্যেয় বেরিয়েছিল অবিনাশ। এটা তার নিত্য অভ্যেস বলেই নয়, সর্বাণীর কাছে যাবার আবেগ ছিল। তদুপরি পারিপার্শ্বিকে বিগতমহিমা শীতের শেষ সোহাগ ছড়ানো; কৃষ্ণচূড়া, ও রাধাচূড়া কেবলমাত্র মঞ্জুরিত হচ্ছে। শীত সন্ধ্যার পটভূমিকায় সর্বাণীর মুখশ্রী চিত্রকলা হয়। অবিনাশ সেই শিল্পিত আদল অনেকদিন দেখেনি।

দরোজার বাইরে পা ফেলেই মনে পড়েছিল, সিগারেট নেই। বিকেলের দিকে ধূমপান তার অপরিহার্য নয়। কিন্তু অবিনাশ সর্বাণীর কাছে যাবে। ধমনীতে রক্ত বেগমন্দ্রিত ছিল এবং চিত্তময় বিলাস পরিব্যাপ্ত। গলির মোড়েই আলীর দোকান। সে থামল। দোকানী কুরূপ নয়, উপরন্তু রসবোধ আছে, বিষয়ীও বটে। আলীর দোকানে প্রায়ই ক্রেতা হয়।

অবিনাশ বলল: দেখি এক প্যাকেট ক্যাপস্টান।

: নেই।

'নেই' শব্দের নাস্তি এবং বিক্রেতা মহাজনের বাক্‌ভঙ্গিমা তাকে উত্যক্ত করল। অবিনাশ লক্ষবার ভেবে ভেবে দেখেছে যে, তার আনন্দমুহূর্ত শ্রীমান ঈশ্বর কখনোই নিটোল হতে দেন না। আজকেও তাই ঘটল।

কয়েক পা যেতেই জনৈক ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ। এক রকম আলাপ আছে; কিন্তু অবিনাশ নাম জানে না। জানে না নয়, এখন ভুলে গেছে। নাম ভুলে যাওয়া তার এক বদভ্যাস।

তিনি হাসলেন: এই যে কেমন আছেন?

: 'ভালো'। অবিনাশ বলল। 'আপনি'?

: মোটামুটি। তা, বেড়াতে যাচ্ছেন বুঝি? সন্ধ্যের দিকে না বেরুনই ভালো।

আশ্চর্য হলো অবিনাশ: 'সে কি? এ সময়েই তো লোক বেড়ায়।'

ভদ্রলোক হাসলেন: 'তা অবশ্য বেড়ায়। এমনি বললাম আর কি। আচ্ছা চলি।' অবিনাশের বুঝতে বাকি রইল না কিছু। ভদ্রলোক চলে গেলে তারপর সে ভেবেছিল, মনুষ্যত্ব এরই নাম।

পাড়ার খেলার মাঠে যেতে হায়দার পাকড়াও করল। অবিনাশের দোষ নেই, মাঠের পাশ দিয়েই রাস্তা; হায়দার দেখে ফেলেছে। আরিফ, রহমান, সকলেই রয়েছে। একহাত হয়ে যাক। দাবা। সে আর্তনাদ করে উঠল। হায়দারকে ঠেলে সরিয়ে, গাছপালা ভেঙে দিয়ে, সমুদয় দিগন্তের উপরে সর্বাণীর চিত্র ঝোলান রইল।

তার কাছে যাওয়া হল না। ঘরে ফিরতে রাত দশটা বেজেছিল।

তারপর তিন দিন বাড়ির বাইরে পা ফেলা সম্ভব হয় নি। গতকাল অবশ্য কয়েক ঘণ্টার জন্যে বেরুন যেত, কিন্তু সে বেরয়নি। ঐ ফাঁকে পিয়ন চিঠি ফেলে গিয়েছিল, 'দীর্ঘদিন তোমাকে দেখি না। আমাকে মনে পড়ে না? শিগগিরই এসো। ভালবাসা। সর্বাণী।'

তিনদিন অবশ্য খারাপ কাটেনি তার। সর্বক্ষণ সর্বাণী ছিল। তা ছাড়া, আলস্যহেতু যে সব কাজ করা হয়ে ওঠে নি, যে গোটাকয়েক পুস্তক অপঠিত পড়েছিল এতদিন, অবিনাশ সব সমাপন করেছিল। তদুপরি রাত্রে ছাদে উঠে ছবি দেখেছে কিছু: কখনও কখনও কোনো কোনো দিগন্ত, অন্ধকার আকাশ, লাল আভায় অঙ্কিত থেকেছে, এবং তারকারা অবলুপ্ত। এ সময় তার দুর্বিনীত আকাঙ্ক্ষা হয়েছে, ঐ রক্তিমার প্রেক্ষাপটে সালভাদোর দালির "গৃহযুদ্ধের পূর্ব সূচনা" টাঙিয়ে দেয়। এতদ্ব্যতীত, হল্লাও মাঝে মাঝে তুমুল হয়েছে। কেবল মাদল ছিল না; দ্রিমি দ্রিমি সেই আদিম ধৈবত অনুপস্থিত যদিও, তবু অবিনাশ ভেবেছিল, বাঙলাদেশ আফ্রিকা হয়ে গেল। অগত্যা, সর্বদিক দিয়ে—কি অধ্যয়নে, দুশ্চিন্তায়, বোধে বা স্বপ্নে—সে দিবসত্রয়ীকে ব্যবহারে লাগাতে পেরেছে। পারতপক্ষে অবিনাশ এ কদিন ঘুমোয় নি।

কিন্তু গত কালকের দিনপঞ্জী কিছু-বা ভিন্ন ছিল। আলস্য, নিদ্রা এবং স্বপ্ন তাকে অধিকার করেছিল। গত রাত্রে নিদ্রার পূর্বমুহূর্তে তার অনুভবে চুলের বন্যা, ওষ্ঠের সপ্রাণতা হানা দিয়েছে।

॥ দুই ॥

সকালে ঘুম ভাঙতে অবিনাশ দেখল, প্রায় আটটা বাজে। অবিনাশ ভাবল, আজকে যেতে হবে। সে যাবে এই বিশ্বাস ও আনন্দ তার সমস্ত প্রাতঃকালীন কর্তব্যসমাপ্তি ত্বরান্বিত করল। সে যাবে, আত্মার এই আনন্দ চিৎকার সারা সকালে এবং তার সকল কর্মে চিত্রিত হল।

পুলের নিচে অবিনাশ দেখল, ঘর নেই। কেন না, অগ্নি সর্বভুক।

জীবনে এই সর্বপ্রথম অবিনাশ শব্দটির সমাস নির্ণয় করল এবং তা থেকে অর্থ। অতঃপর মনে মনে অঙ্ক কষল, সমুদ্র? সমুদ্রের সঙ্গে মনে এল কল্লোল, গর্জন, ঘূর্ণিত তরঙ্গের বেগ; এবং তারপরই অকস্মাৎ—কাসাব্লাঙ্কা সমুদ্র ও অগ্নির অর্থ আর ঝাপসা রইল না, আভিধানিক সংজ্ঞা ছাড়িয়ে প্রতিটি শব্দটি তাদের অবয়বিক দেহ নিয়ে তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল।

সামনে তাকিয়ে সে দেখল. খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে লোকটা পোড়া ঘরের মধ্যে পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরপোড়া গরু; অবিনাশ জানে না এই প্রাবচনিক উদ্ধৃতি এই দুঃখচিত্রেও কেন হঠকারী হল। কিন্তু, অবিনাশ, ঘরপোড়া গরু ঘরে থাকে না, পালায়; এমন কি সিঁদুরে মেঘও তাকে ঘর ছাড়া করে। মানুষ গরু নয়, অবিনাশ বুঝল, পোড়া ঘরের জমিনে পা রেখে মানুষ পৃথিবী ছ্যাখে।

দগ্ধগৃহের পাশে সিগারেট ও মনোহারীর দোকান এখনও অম্লান। করিম মিঞা পান চিবুচ্ছে, রোজই চিবোয় (দীর্ঘদিনের ক্রেতাবিক্রেতা সম্পর্কে সে দোকানদারের নাম জানে); কিন্তু তার অবিস্মরণীয় টেরাকোটা মুখের রেখা কিঞ্চিৎ থমথমে। করিম মিঞা কি পুলকিত প্রতিবেশীর এই সর্বনাশে? অথবা তারও হৃদয়ে এক খাবলা মাংস নেই? তাম্বুল চর্বনের সঙ্গে হৃদয়ের কোনো ক্ষরণ যোগসাজস সম্বন্ধে জারিত কিনা কে জানে?

সিগারেট কিনল অবিনাশ। যেন কিছু হয়নি, যেন পৃথিবী তেমনি বিদ্যমান, পৃথিবীর মানুষ চিরায়ত বিশ্বাসে যেন-বা তেমনি নিজ নিজ বিন্দুতে দাঁড়ানো, এমনভাবে অনাবেগ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল।

: কবে পুড়ল? দিনতিনেকের মধ্যে, না?

মুখ তুলে তাকাল করিম মিঞা, 'না সাহেব। ঐ হট্টগোলে গেলে তো দুঃখ ছিল না। আজ ভোরের দিকে।'

: 'সে কি?' অবিনাশ অবাক হলো।

: 'ভোরের দিকে হয়ত ঝিমুনি এসেছিল পুলিশের, সেই ফাঁকে।' একটু থেমে আবার বলল, 'তাছাড়া শহর কাল থেকে অনেকটা চুপচাপ কিনা, কেউ ভাবে নি।'

অবিনাশ বলল: দেখি, একটু মৌরী। আচ্ছা না, পানই দাও।

সর্বাণীর কাছে যাবার জন্যেই কি রঞ্জিত ওষ্ঠের বহির্ব্যঞ্জনা? আসলে, আনন্দ হয়নি তার; নিজের মুখ বিস্বাদ মনে হল, স্বাদ ফিরে আনতে অবিনাশ পান কিনল। তাম্বুল চর্বনের সঙ্গে হৃদয়ের কোনো যোগসাজস

আছে কি? হৃৎপিণ্ডের ধক ধক শব্দে, রক্তবাহী নালীমুহে কারা ক্রোধগর্জন দাঁত চেপে চেঁচিয়ে উঠল, অ-বি-না-শ। সেই চিৎকার ধিক্কারে ধ্বনিত হলো: অবিনাশ। কই তুমি তো জানলে না, কেউ মৃত কিনা। তুমি কি জানতে এরা কারা ছিল, অথবা এখানে সংসার, জীবন ও প্রেম ছিল। তুমি কখনো ভাল ক'রে দেখ নি। ছিঃ। করিম মিঞা তোমার কে অবিনাশ? এক প্যাকেট সিগারেটের জন্যে এত? ছিঃ অবিনাশ।

পান মুখে দিয়ে পাশ ফিরিতেই দেখল, সুখদারঞ্জন বাবু। স্কুলের মাস্টার, পুরোনো দিনের গ্রাজুয়েট। সনাতন রীতিতে সাইকেলে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। কাছেই বাসা। অবিনাশ দেখল, সুখদা বাবু ঘর এবং ঘরপোড়া মানুষ দেখছেন; দর্শনীয় এই ছবি দেখতেই তিনি এসেছেন। পোশাক তেমনি পরিচ্ছন্ন এখনো। একবার মনে হল, অবিনাশ কানে কানে বলে: 'স্যার, আপনি এখনো আছেন? কি আশ্চর্য, কি অন্যায়! ওরা আপনার খোঁজ পেলো না।' পরমুহূর্তেই চতুর্গুণ বিশ্বাসে, দ্বিগুণ জোরে ধমক দিল তার বুকের জুগুপ্সাকে, তার অবিশ্বাসকে; তার ধমনীর ধিক্কার ডুবে গেল। আমি মৃত্যু মানি না। নাস্তিতে আমার আস্থা নেই। হে সভ্যতা, হে প্রেম, বিবেক, তুমি আমার পাশে থাকো।

সাইকেলে হাত রেখে পরিচ্ছন্ন সুখদারঞ্জন মাস্টারমশায় ভস্মগৃহের জ্বালচিত্রে স্বজাতি দেখছেন। অবিনাশ তাঁর পিছন দিয়ে চলে গেল। তিনি দেখতে পেলেন না। অবিনাশ রিক্সায় উঠল। বলল, ভজহরি সাহা স্ট্রীট।

দরজা খুলে যিনি বেরিয়ে এলেন, তিনি অচেনা। গলা শুনে ভয় পেল অবিনাশ।

: কাকে চাই?

হতবাক হয়ে গেল সে। সর্বাণীর বাসায় এসে অপরিচিত মুখের ধৃষ্ট উক্তিতে অবাক হল। কী বলবে বুঝতে পারল না।

: ভূপেন বাবুর সঙ্গে দেখা করব।

: আপনার নাম?

পা থেকে মাথা পর্যন্ত সামনে দাঁড়ান লোকটিকে সে চোখ দিয়ে বিধ্বস্ত করল। শুকনো গলায় জবাব দিল: অবিনাশ।

: তাঁরা এখন এখানে নেই।

সময় দিল না অবিনাশকে। মুখের উপর দরজা বন্ধ হয়ে গেল। প্রহৃত,

লাহিত, বিমূঢ় অবিনাশ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর রিক্সায় ফিরে এল। ভাগ্যিস রিক্সা ছেড়ে দেয় নি। হুকুম দিল ধানমণ্ডি যাবো।

কিছু ভেবে উঠতে পারছিল না সে। সর্বাণীরা কোথায় গেল? এখন সে কোথায় তাকে খুঁজে বেড়াবে। 'কিন্তু যেখানেই যাক, অবশ্যই মঙ্গলের জন্যে গেছে, অবিনাশ', মনকে প্রবোধ দিল সে। সর্বশেষে ভাবল, আগামী কাল পরশুর মধ্যে নিশ্চয়ই সর্বাণী বিশদভাবে লিখবে। এই চিন্তা তৃপ্তি এনে দিল তাকে। এই দুঃসময়ে সর্বাণীর কল্যাণ হোক, সকলের কল্যাণ হোক। মনে মনে তাই চাইল অবিনাশ। এবং মহৎ অথচ সাধারণ এবং প্রাচীন প্রার্থনা কেন জানি মুহূর্তের মধ্যে তাকে তার দুস্বপ্ন ও খেদ ভুলিয়ে দিল।

বলল: রিক্সা তোমাকে বলেছি কোথায় যাব? ধানমণ্ডি চলো।

কড়া নাড়তেই বেরিয়ে এল রহমত। এসেই জড়িয়ে ধরল: 'যাক্, এসে গেছিস? খুব ভাবনা হচ্ছিল।' উভয়ে ঘরের ভিতরে চলে এল।

: 'কালকে অবশ্য একবার যেতে পারতাম।' কৈফিয়ত দিল রহমত, 'ভেবেও ছিলাম; কিন্তু কি জন্যে যেন যাওয়া হয়ে উঠল না।'

: আরে তাতে কি? তুই যাস নি, আমি চলে এলাম।

খাবার সময় রহমতের মা জিজ্ঞেস করলেন: ভাল কথা, বাবা, নমি-র বিয়ের কদ্দুর কি করলে?

বোন পপি বলল: সেকি? নমিতার এমন কি বয়েস হল? মা, কদ্দিন আগে এসেছিল না নমিতা?

রহমত জবাব দিল: বছর দেড়েক।

: তা আর কি-ই বা বয়েস?

মা বললেন: কি জানি। তা, অবি সেদিন ঐ রকম কথাই তো বলছিল।

: 'হ্যাঁ, তাই তো।' অবিনাশ কথা বলল। 'এখন থেকে খুঁজছি, পেতে পেতে বছর দুই পার হবে।'

পপি জিজ্ঞেস করল: কেন? ছেলে পেতে আবার দু'বছর লাগে নাকি?

: তা জানি না, পাচ্ছি কই? সবাই তো কলকাতায়, মানে ভারতে চলে গেছে। ফলে, ছেলে পাওয়াই ভার। তা থেকে আবার খুঁজে চুঁড়ে বের করতে হবে। আ, কষ্ট না? আর সময়সাপেক্ষও তো।

মা বললেন: তা বাবা, ছেলে ভাল না মিললে, কলকাতাতেই খোঁজ।

: বাবা এ রকম কথা তুলেছিলেন, আমি রাজি হইনি।

এই সময়ে সাংসারিক আলাপের অবিকল সেই ছবি, বাবা এবং মা-র আকৃতি ও কণ্ঠ সে অনুভব করল।

: কেন ?

অবিনাশ উত্তর দিল : কী যে বলেন ? অতদূরে বিয়ে দিলে দেখাশোনা করবে কে ? পরে খবরাখবর নেয়াই মুশকিল হয়ে যাবে, মাসিমা।

পপি চিন্তিত হল : তাহলে ?

: তাহলে আর কি ? খুঁজতে খুঁজতে মনের মতো সুপাত্র এখানেই মিলে যাবে। ভালো লোক তো এখনও কিছু আছে, যারা বরাবর এখানেই থাকবে। এই ত্যাখ না, যেমন আমি। আমার মতো একজন খুঁজে পেলেই তো সমস্যার সমাধান হয়ে গেলো। নয় কি ?

পপি বুঝল : তা বটে।

খাওয়ার ফাঁকে, কথার ফাঁকে, রহমত প্রশ্ন করল, 'বাবাকে খবর দিলি ? না হলে আবার ভাববেন।' চুপ করে থাকল অবিনাশ। তারপর মুখ খুলল 'এ তিন দিন তো বেরুতে পারি নি। কাল অবশ্য করলে পারতাম, ভুল হয়ে গেল। আগামী কাল একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেব'খন।'

আহার শেষ হলে এরা বারান্দায় এসে বসল। শীতের আমেজ বাতাসে এখনও অবশিষ্ট। রাত্রে লেপ এখনও প্রয়োজনীয়। গরমের তাপ কিন্তু দুপুর হলেই ছোবল দিচ্ছে ; ওরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল লেকের জলে বাতাসের প্রাণাবেগ, য়ুক্যালিপ্টাসের সরু সরু আঙুল কম্পমান এবং সামনের রাস্তা যানহীন ও জনবিরল। দুপুরের হাওয়া আনন্দ দিল তাদের।

রহমত তির্যক দৃষ্টি হানল বন্ধুর দিকে ; অবিনাশ সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। গলার কাছে একটা অস্বস্তি বিঁধে রইল রহমতের, বলল : সর্বাণীরা ওখানে গিয়েছিলি ?

অবিনাশ বলল : বাসা থেকে আর কোথাও গিয়ে উঠেছে। বাড়িতে লোক রেখে গেছে, দেখলাম।

: তাহলে, কুশলেই আছে সবাই। তাই না ?

'তাই না' অক্ষরদ্বয় এবং জিজ্ঞাসার কণ্ঠ অবিনাশের উত্তরের আশায় মুখ তুলে চেয়ে রইল।

সে বলল : তা ছাড়া আর কি ? তবে কোন্‌খানে গিয়ে উঠল জানলে কিঞ্চিৎ চিন্তামুক্ত হতে পারতাম।

: 'ভূপেনবাবু বলছেন কিছু ?' প্রসঙ্গান্তরে চলে এল রহমত।

: এমনিতে বলছেন না কিছু, তবে গতিক সুবিধে বোধ হচ্ছে না।

: কেন ?

: সর্বাণীই সেদিন বলছিল। কলকাতায় কে ওর জ্যাঠামশাই আছেন, বারবার সর্বাণীকে যেতে লিখছে। ওর বাবাও চাপ দিচ্ছেন।

রহমত এর মধ্যে অসুবিধের গতিক নির্ণয় করতে পারল না। বলল: তা এতে ভয়ের কি ?

: গেলে আর আসতে দেবে নাকি ভেবেছিস ?

এরপর বলার কিছু থাকল না কোন পক্ষে। কিছু পরে সমস্যার সমাধান বের ক'রে রহমত বলল: তা, তুইও নাহয় যা। দুজনাই তো তোরা শিক্ষিত ; উপার্জনের ভাবনা খুব কি ভাবতে হবে ?

অবিনাশ কি বলবে ? সব কিছু স্ফটিকের মত দেখতে পেল সে, রহমতের হৃদয় ও বেদনা। তাই, দীর্ঘ সময় অতীত হলে কেবলমাত্র উচ্চারণ কোরল, 'না'। বিশিষ্ট ভঙ্গিমার উক্ত উচ্চারণ তার অনীহা ও নির্বেদ হতাশা ও যন্ত্রণা যুগপৎ প্রচার করল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, যেন-বা মন্ত্রোচ্চারণ।

: অবিশ্বাসী হয়ে বেঁচে থেকে কি হবে, রহমত ?

রহমতের ইচ্ছা হল বলে, বেঁচে থাকলে বিশ্বাস আবার গজাবে। জীবন ধারণই প্রাথমিক। কিন্তু ইত্যাকার কোনো কিছুই সে বলল না। কুরুক্ষেত্রের সঞ্জয় যেন সে, কেবল বলল : অবি, গৌতম মারা গেছে

সময় বয়ে গেল। বন্ধুদ্বয়ের চোয়াল দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হলো। বিকেলে হাওয়া দিল। ঘুমফোলা চোখে পপি চা রেখে গেল। দু'বন্ধু বসে রইল তেমনি। এক সময় হাওয়ায় ভেসে কথা বলল অবিনাশ : রহমত, দীপককে মনে আছে ! আসার পথে দেখলাম, মীজান বাজার করে নিয়ে যাচ্ছে ওদের জন্যে। পরশু রাত্রে মীজানের বুড়ো বাপ কোরাণ ছুঁয়ে মিথ্যে কথা বলেছে। ফলে দীপকরা বেঁচে আছে।

বেলা পড়ে এল। সন্ধ্যে থেকে আবার কারফিউ। অবিনাশ বলল, 'এবার তো উঠতে হয়।' রহমত বলল, 'থেকে যা না।' পপি আব্দার ধরল, 'কী দরকার বাপু যাবার ? বৌদি তো আসে নি এখনও।'

কিন্তু থাকা যায় না। অবিনাশ থাকতে পারে না। বাসাতে কেউ নেই, অবশ্য বাসাতে নেইও কিছু ; চুরি আর কি করবে ? কিছু বইপত্তর। আর পোড়ায় যদি, আমি থেকেই কি ঠেকাতে পারব ? কিন্তু অবিনাশ, কার

ভয়ে, কেন, কি জন্যে, তুমি বাড়ির বাইরে থাকবে আজ? কখনও তো এমন হয় নি অতীতে।

অবিনাশ বলল: 'না, চলেই যাই। চলেই যাই, পপি।' পরে বন্ধুর দিকে দৃষ্টি ফেলে, 'আয়, আগিয়ে দে।'

উভয়ে হাঁটল কিছু পথ। তারপর অবি-কে রিক্সায় তুলে রহমত পিছন ফিরল। পিছন থেকে আওয়াজ ভেসে এল: কাল বাসায় থাকিস, সকালেই আসব।

॥ তিন ॥

রিক্সায় উঠে অবিনাশ স্বগতভাষণে বলল, কাল বাবাকে সকাল বেলায় টেলিগ্রাম করতে হবে। পপিটা বিয়ের পর দেখতে আরো সুন্দর হয়েছে। পপি টেনে নিয়ে এল নমিতাকে। নমিতাকে বিদেয় করতে পারলে অবিনাশ হাত-পা ঝাড়া। কিন্তু আরো কতদিন খুঁজতে হবে? সর্বাণীর মত নমিতাও তো কাউকে ভালবাসলে পারত, দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেত সে। অথচ, মফস্বল শহরে ভালবাসার সুযোগ সুবিধে, অন্তত নমিতাদের জন্যে, কমে আসছে। ঢাকায় না হলে সর্বাণীই কি খুঁজে পেত তাকে? কিন্তু অবিনাশ এ প্রার্থনা করো না। তুমি তো জান, সর্বাণীর জন্যে তোমার হৃদয়ে দহন। কেমন করে তবে নমিতা, তোমার সহোদরার জন্যে তা আকাঙ্ক্ষা করো তুমি? কে জানে অবিনাশ, সর্বাণী এর মধ্যে তার জ্যাঠামশায়ের কবলে কি না? তুমি কি নিশ্চিত, প্রায়শ্চিত্তের জন্যে তুমি রয়ে গেলে না?

অবিনাশ ভাবল, প্রায়শ্চিত্ত। প্রায়শ্চিত্ত কিসের? না, পাপের, অতঃপর অবিনাশ পাপকে প্রত্যক্ষ করল। কার পাপ? তোমার পাপ, আমার পাপ। প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত সে পড়ে রইল? তুমি এবং আমি।

অবিনাশ প্রার্থনা করল: ঈশ্বর ক্ষমা কর। গৌতম বড় ভাল ছিল। গৌতমের তো কোন শত্রু ছিল না। ঈশ্বর ক্ষমা কর।

'ঈশ্বর ক্ষমা কর' এই প্রজ্ঞা তার কানে শোনাল: অবিনাশ, তুমি যীশু। যন্ত্রণা ব্যতীত উদ্ধার নেই, ঘাতকই আমাদের মুক্তি। Woman, behold thy son: ক্রুশবিদ্ধ আত্মার আর্তনাদ উচ্চারিত, ঈথারে ছড়িয়ে গেল; এবং সম্মিলিত শত্রু ও শিষ্যের প্রতি Behold my mother প্রার্থনা ও দীর্ঘশ্বাসে একাকার হয়ে Father, forgive them, for they know not what they do—এই অমোঘ বাণী অবিনাশের বুকে বিঁধে

রইল। গৌতম বড় ভাল ছিল; গৌতম অজাতশত্রু। অবি, গৌতম মারা গেছে।

অবিনাশ এইখানে ভাবল মৃত্যু ক'রকমের হয়? মৃত্যুর কথায় আবার সুখদারঞ্জন স্যার হানা দিলেন।

: অবিনাশ তুমি কি বরাবর এখানেই থাকবে নাকি, এ তো ভাল কথা নয়। লেখপড়াও তো কলকাতাতে করলে পারতে। দেখ না, আমার ফ্যামিলির সবাই কলকাতায়। ওখানেই সব লেখাপড়া করছে। এখানে থেকে কি হবে? তা তুমি পড়াশুনা না হয় এখানেই শেষ করলে, আর কেন? আর না, চলে যাও।

: কেন স্যার?

: কেন? অবাক করলে। মৃত্য, মৃত্যু। বাঁচতে হবে তো তোমাকে। এখানে মানুষ থাকে?

: স্যার, তবে আপনি আছেন?

সুখদারঞ্জন বললেন: আমি? দাঁড়াও না, আমিও যাব। তেমন সুবিধা মতো অফার পেলেই যাব। তুমি চলে যাও। ইয়ংম্যান, লেখাপড়া শিখেছ; তোমার আবার চিন্তা কি?

বৎসরখানেক পূর্বের ঘটনা। অবিনাশ মৃত্যু ক'রকমের হয়?

রিক্সা থেমে গেল। আর যাবে না। অন্ধকার হয়েই এল; এখনি সাইরেন বাজবে, কারফিউ। রিক্সাকে এর মধ্যে তার আস্তানায় ফিরে যেতে হবে।

অবিনাশ নামল। করার কিছুই নেই। জোরে পা চালিয়ে নিতে হবে। কিছুদূর হাঁটলেই সুখদাবাবুর বাসা। বিপদ ওঁৎ পেতে ছিল। দরজা বন্ধ, কিন্তু জানালায় চোখ রেখে সুখদারঞ্জন রাস্তা দেখছিলেন। 'ভদ্রলোক কী অপরিসীম ভীতু।' সে ধিক্কার দিল। বাড়ির কাছে যেতেই চাপা গলায় তিনি ডাকলেন: অবিনাশ। শোন, শোন।

উপায় নেই। অবিনাশ, তোমার উপায় নেই। তুমি যীশু। তোমায় থামতে হবে, বাল্যকালের শিক্ষক মহাশয়ের অমৃতবচন অনুধাবন করতে হবে। God, behold thy son!

: 'এ সময় যাচ্ছ কোথায়? এক্ষনি তো সাইরেন পড়বে। এখানে এস।' তেমনি সর্পিল কণ্ঠে গুরুমহাশয় তাঁর একটা ছাত্রের উদ্দেশ্যে ভালবাসা জানালেন।

: এই তো এসে গেছি স্যার। পুলটা পার হলেই। দশ মিনিটের রাস্তা চলে যাব।

দাঁড়াল না অবিনাশ। কয়েক পা যেতেই সাইরেন বাজল। থামল না অবিনাশ। শত্রু। মনে মনে বলল, traitor। সুখদাবাবুর মন বড় নোংরা। কোনো কোনো লোকের হৃদয়ে এত অপ্রেম থাকে কেন? পদক্ষেপ আরো দ্রুত হল। পুলিশের ভয় আছে; কারফিউ অমান্যের শাস্তি ভয়ানক। কিন্তু, এই তো এসে গেছে। কেবল সেই পোড়ো বাড়ি, তারপর তো প্রায় ঘরেই পৌছান।

গলির মধ্যে সে কোন পুলিশ দেখলো না। অবিনাশ, সামনে কিন্তু থাকতে পারে। কিন্তু না, আর কোন সান্ত্রী সে-পথে ছিল না। অবিনাশ ভাবল, পুলিশও দেহধারী, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও নিদ্রার শিকার। তার মমতা হল। স্বস্তি বোধ হল তার। ব্রিজ অবধি রাস্তা খালি।

করিম মিঞার সিগারেটের দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। তুমি তো জানতে; এ সময় দোকান কি খোলা থাকে? আর, সিগারেট নেবার সময় নয় এটা। যাক্, এই তো ভস্মীভূত গৃহের সামনে এসে গেছ। তারপর কেবল ব্রিজটা পেরুনো; তারপর আর ভাবনা কিসের?

পুলের গোড়ায় এক ঝাঁক অন্ধকার থমকে আছে। অন্ধকার ভাল এবং আলোও সুন্দর। কিন্তু আবছায়া আলো-আঁধারি বীভৎস—সে ভাবল। মাথার এক মাইল উপরে, ল্যাম্পপোস্টে বিশ পাওয়ারের বিজলী আলোয় পথ চেনা যায় না।

অগ্নিভুক্ত ঘরগুলো প্রেতময় হয়ে আছে। টিনগুলো মুখ থোবড়ানো, ভূমিলগ্ন, একটা দুটো খুঁটি যেন গ্রীক স্থাপত্যের স্তম্ভ: ভয়াবহ নিঃসঙ্গ, একাকী এবং অতীতময়।

কিন্তু পোড়োজমিতে অর্ধ-আঁধারে কে নড়ে? সকালের সেই খোঁচা খোঁচা দাড়ি—লোকটা কি এখনও এখানে শোকাহত? মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল অবিনাশ। কে দৌড়ে এল? একবার মনে হল, আলী। অবিনাশ মুখ দেখতে গেল দেখতে পেল না!

অবিনাশ দেখল, সমুদ্র, তার কল্লোল ও গর্জিত তরঙ্গের বেগ; অবিনাশ দেখল, সর্বভুক গগনচারী। সমুদ্রের জল লবণাক্ত। এবং অর্জুন পলাতক। পিতামহ ভীষ্ম: অবিনাশ বলল, জল।

অবিনাশ, তোমার ভয় কি? তুমি যীশু। অবিনাশ, এত রক্ত কিসের?

ক্রুসিফিকেশন। woman, behold thy son…এবং রহমত, কাল সকালেই আসব; নমিতার মুখের শ্যামলিমা; বাবাকে টেলিগ্রাম: ভাল আছি এবং সর্বাণী…।

জ্যোৎস্না রাতে তারা সবাই বনে চলে গেল॥

সুখের সন্ধানে

হাসান আজিজুল হক

ছায়াটা কী ঠাণ্ডা আমাকে ডাকছে।

কুসুম বুকের নীচে বালিশ দিয়ে কুয়োতলার দিকে চেয়ে ছিল। চিলের কণ্ঠে দুপুর তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল আর তখুনি বাতাবি লেবুগাছের সেই ছায়াটুকুর আশ্রয়ে ছাইমাখা কাকটা গা ধুতে এলো। কুসুম তার স্নান দেখছে—গলার কাছটা ভিজিয়ে নিয়ে ডানায় আরো খানিকটা নোংরা পানি মেখে কাকটা কি সুখে লেবুগাছে বসে পা দিয়ে মাথা আঁচড়াচ্ছে।

তখুনি যন্ত্রণা উঠল কুসুমের। ছিঁড়ে যেতে লাগল সে। টুকরো টুকরো ছত্রখান। যেন কে হাহাকার করে উঠল বুকের ভেতরে। যেন নতুন টাকার ওপর সুখের নামাঙ্কন দেখে উল্টোতে গিয়ে দুঃখ সোজা মুখের দিকে চেয়ে!

এই রকম সব অদ্ভুত কথা। মনে হতে কুসুম নিজের অতীতকে ওলোট পালট করে দেখতে চাইল। ঠিক যেন পুরোন চিঠির বাক্স খোঁজা। পুরোন কাপড় বা মৃত মায়ের গয়না স্পর্শ করার মত তক্ষুনি সুখ তার গায়ে নিশ্বাস ফেলতে শুরু করল। ভারী অদ্ভুত তো—দুঃখের সমুদ্রে যেন ভেসে যাচ্ছিলাম। কিন্তু খুঁজতে গিয়ে আমি কোথাও তাকে পেলাম না।

কুসুম বিছানা ছেড়ে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দুপুরকে দেখতে পেল স্থির হয়ে আছে। এই সময় দক্ষিণ দিকের একটা আমগাছ থেকে ঘুঘু ডেকে উঠল। স্মৃতি ফিরে এলে জানালার শিকে থুতনি রেখে সে আর অনেকটা সময় কাটিয়ে দিল। কিন্তু দুপুরটা আকাশ থেকে ঝুলেই রইল এবং এইভাবে নিজেকে দেখে, ফিরিয়ে ফিরিয়ে বিচার করে ক্লান্ত হয়ে বাইশ বছরের কুসুম এখন বিরক্ত হয়েছে। কারণ তার কাছে কিছুই ধরা দেয় না। সুখ না। অথবা তারা আসে এবং দ্রুত চলে যায়। সে হাত বাড়িয়ে দেয় তাদের দিকে। কিন্তু একটু সময়ের জন্যেও ধরে রাখতে পারে না। তখন বিশ্রী লাগতে থাকে। সেই যন্ত্রণাটা উঠে আসে। ফাঁকা ফাঁকা লাগে বুকের কাছে। এমন মাথা ধরে যে অসময়ে বিছানায় শুয়ে পড়তে হয় এবং এই রকম হতে হতে শেষ পর্যন্ত অজ্ঞানই হয়ে যেতে হয় তাকে।

উৎপাতটা প্রথম দেখা দিলে রাজিব করুণা কপালে ঢেউ তুলেছে। কুকুমকে বুকে নিয়েই সে তাকে আরাম করে দিতে চেয়েছে, শেষ পর্যন্ত তোমার হিস্টিরিয়া দেখা দিল।

ক্ষীণ কণ্ঠে কুঙ্কুম বলে, কি যে হল আমি বুঝতে পারি না। এমন তো কোনদিন ছিল না আমার। ছোটবেলায় মাথা ধরতো খুব, চশমা নিতে হয়েছিল। তারপর যখন কলেজে পড়ি মাথা ধরাটা ফিরে এসেছিল আবার। একবার একটা শুকনো ইঁদারার অন্ধকারে ঢিল ফেলেছিলাম। কোথা কোন অতল থেকে ঢঙ করে একটা আওয়াজ এলো। সেই থেকে মাঝে মাঝে মাঝে কেমন অদ্ভুত ফাঁকা লাগে।

এগুলো তোমার ম্যানিয়া। বড্ড ম্যানিয়াক হয় মেয়েরা। কিন্তু বিয়ের পর এ সব তো সেরে যাওয়া উচিত। এমন জোর দিয়ে রাজিব বলল কথাগুলো যে ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে কুঙ্কুম অপরাধী বোধ করল নিজেকে রাজিবের কাছে।

যাক্ অত চিন্তা করার কারণ নেই। আপনিই ঠিক হয়ে যাবে।—এই কথায় রাজিব সান্ত্বনা দিল বলেই কি পরিবর্তে উপসর্গটা নিয়মিত হয়ে এলো? কারণ এরপর থেকেই ব্যাপারটা হিসেব মাফিক হতে থাকল। যেমন, অফিস থেকে ফিরে এলো রাজিব সন্ধ্যার অনেক আগে। হাতের জ্যাকেট খুলে মেরুন রং-এর শাড়িটা বের করে কুঙ্কুমের নিটোল উজ্জ্বল শরীরটাকে জরীপ করল চেয়ে চেয়ে। এইসব বুঝে, রাজিবের চোখের লোভটুকু খুঁজে পেয়ে কুঙ্কুম এমন ব্যবহার করল যেন আজ দুপুর থেকে তার মাথা ধরেনি—যেন সে উল্লাসে ফেটে পড়ছে। কিন্তু নতুন শাড়িটা পরে রাজরাজেশ্বরীর মতো সেজে অপেক্ষা করতে করতে এমন অসম্ভব যন্ত্রণা হতে শুরু করে যে, তাকে জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে হয় এবং তখন তার দেহটিকে নিদ্রিত সুন্দরী হিসেবে গ্রহণ করার কোন উপায়ই থাকে না রাজিবের পক্ষে। ছেলেটাকে অতএব ভব্যতা, ভদ্রতা, শিক্ষা ইত্যাদি বিস্মৃত হয়ে একেবারে বর্বর পশুসুলভ আচরণ করতে হয়। অফিস শেষ হলেই সোজা বাসায় চলে আসা যার অভ্যেস—অফিসে কাজের লোকের ভিড়ের মধ্যে কুঙ্কুমের শরীরের ছায়ায় হঠাৎ বিব্রত অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে যে এবং তক্ষুনি সব ফেলে বাসায় ফিরে তাকে জড়িয়ে আদর করে এলোমেলো করে দিতে আকুল হয়—সেই মানুষটা এখন রাত এগারোটার আগে ফিরছে না কিছুতেই। এইভাবেই রোদ মিইয়ে আসছে, বিকেল নেমে আসছে ছাদের ওপর এবং কুঙ্কুমের ঘরে সে এবং নির্জনতা

পাশাপাশি বাস করছে। অথচ এই নিরিবিলিটা দুজনের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেবার কথা ছিল।

শহরের মধ্যে বাসা নিলাম না এ জন্যেই বুঝলে—রাজিব হেসেছিল, তোমাকে আদর করার অবধি সুযোগ পেতাম না তাহলে।

এরপর চমৎকার খাট, স্টিলের আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, বই এর র‍্যাক ইত্যাদি ইত্যাদি যা কিছু কুঙ্কুমের প্রায় স্বপ্ন ছিল বলা চলে সেইসব এসে ঘর সাজিয়ে বাইশ আর সাতাশ বছরের দুটি যৌবন মূলধন করে সুখে জীবন কাটানোর আয়োজন হল।

কিন্তু এসব আয়োজনের প্রত্যেকটির মধ্যে—যেমন বাক্স-পেটরায় জম প্রত্যেক দিনের ধুলো, চালের টিন, বিস্কুটের কৌটো এই সবের মধ্যে সারা জীবন কাটানোর ক্লান্তির বীজ প্রবেশ করল। পোকার মতো কুরে কুরে গর্ত করে চলল অলক্ষ্যে।

তোমার কি রকম অসুবিধে হচ্ছে? কি ধরনের অসুখে ভুগছো তুমি বলবে তো আমাকে—ভুল রাজিব বলে। উত্তরে কুঙ্কুম ইঁদারার সেই অন্ধকারের কথা ছাড়া আর কিছুই বলতে পারে না। তাও বলে ভাসা ভাসা ভাবে। অতএব রাজিব এখন রাত এগারোটার আগে ফেরে না।

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে এইসব ভাবল কুঙ্কুম। রোদ এখন কাত হয়ে তার কপালে এসে পড়েছে। বাজে ভাবনা আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। নাহলে আমি পাগল হয়ে যাব—কুঙ্কুম অস্ফুটে কথাগুলো উচ্চারণ করল এবং শাড়ি সায়া ব্লাউজ সাবান ইত্যাদি নিয়ে কুয়োতলার দিকে চলে গেল। যে দিকটা তখন একেবারে চুপ করে গেছে। লেবুগাছের নীচে দাঁড়াল কুঙ্কুম। যে দিকে ঘন ডালটা আছে সেখানে কালো ছায়া—বাকি যে দিকটায় গাছটা পাতলা হয়ে এসেছে প্রৌঢ়ের চুলের মতো সেদিকে রোদে ছায়ায় মাখামাখি একটা অস্থিরতা সিপ সিপ কাঁপছে। কুঙ্কুম বেড়ার গায়ে শাড়ি ইত্যাদি রেখে কুয়োটায় উঁকি দিল। কালো ঠাণ্ডা পানির দিকে চেয়ে গা শির শির করে উঠল তার এবং সমস্ত শরীর যেন তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠল। তারপর ছোট্ট দরজাটা বন্ধ করে দিতেই আশ্চর্যভাবে একা বোধ করল সে। অথচ ঠিক এই সময়েই যখন সে ব্লাউজ ও ভিতরের জামা খুলে সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক হয়ে যায়, ঠিক তখুনি তার চারপাশে শব্দের জগৎ মুখর হয়ে ওঠে। তখন নিঃসঙ্গ কাকটা চিৎকার করে, কি ঘুঘু ডেকে ওঠে অথবা শুকনো পাতা খসে পড়ে বা বাতাস ইত্যাদির শব্দ ওঠে। তবু এই সমস্তের মধ্যে থেকে বড় নির্জন প্রশান্ত বোধ

করতে থাকে মেয়েটি। এবং যদিও সে বুঝতে পারে সমস্ত প্রকৃতি এবং অজস্র-প্রাণী তার নগ্ন দেহ দেখছে সে লজ্জা অনুভব করে না। এখন কুঙ্কুম অসংখ্য পা-অলা কীটটিকে হাতের তালুতে এনে রাখছে এবং পানি দিয়ে তার সামনে একটা প্লাবন সৃষ্টি করছে। সামনের পা দিয়ে যে ফড়িংটি মাথা ঘষছে সেটাকে সে লক্ষ্য করছে একমনে এবং ভুল করে যে প্রজাপতিটি উড়ে এসে হঠাৎ তার চুলে এসে বসল সেটা যাতে উড়ে না যায় সে জন্যে পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে আছে। বলা যায় মূক জগতের কাছে নিজেকে মেলে ধরে কুঙ্কুম। নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে সুখ পায়। সুখের কথা ভাবতে পারে।

স্নান সেরে সুখ গায়ে মেখে ঘরে এসে অবাক হয়ে যায় কুঙ্কুম। এই অসময়ে রাজিব এসে চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে! তার ফরসা কপাল চোখে পড়ল কুঙ্কুমের আর আঙুলের ফাঁক দিয়ে টিকোল নাকটা। জামা কাপড় ছাড়েনি রাজিব—জুতো পর্যন্ত না। ওকে এইভাবে দেখে হঠাৎ বিয়ের কথা মনে পড়ল কুঙ্কুমের। প্রথম ওকে দেখে সে ভেবেছিল রাজপুত্রের সঙ্গেই বিয়ে হয়ে গেল তার শেষ পর্যন্ত, যা নাকি একমাত্র বইএ পড়া যায়! জীবনের জন্য এই সুন্দর মানুষটাকে নিজের হিসেবে পাওয়ার ব্যাপারটা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে মন চায়নি তার।

তোমার শরীর খারাপ নাকি? এমন অসময়ে চলে এলে যে অফিস থেকে? উত্তরে রাজিব শুধু একবার চাইল তার দিকে। বোধহয় দুমাস আগে এমন হলে আনন্দে ফেটে বেরুত কুঙ্কুমের চেহারা। আর কোন প্রশ্নের তোয়াক্কা না করেই রাজিব বলল, অফিসে পোষাল না আজ। চলে এলাম। সোজা কথা তোমাকে বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু সেসব কিছু না বলে সে এখন চুপ করে আছে। অর্থাৎ সত্যি করেই তার মাথা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়ছে।

কুঙ্কুম সুখের আবেশ কাটিয়ে উঠল, মাথা ধরেছে না?

হ্যাঁ।

তা এই রোদের মধ্যে আসতে গেলে কেন? দুঃখী চোখে চেয়ে কুঙ্কুম বলল।

রাজিবের দৃষ্টি কঠিন হয়ে এলো। তুমি এখনও খাওনি।

এইতো খেতে যাচ্ছি।

এতক্ষণ কি করছিলে? আমি খেয়ে গেছি দশটায়। এখন এই বেলা সাড়ে তিনটে পর্যন্ত বসে আছো? রাজিব এমন করে কথা বলে যেন তার

মাথা ধরা সেরে গেছে এবং কুঙ্কুমকে ভর্ৎসনা করার জন্যেই এই অসময়ে অফিস থেকে এসেছে। কুঙ্কুম কথা খুঁজে পায় না। যেন এতক্ষণ না খেয়ে এইভাবে শুয়ে থেকে অন্যমনস্ক হয়ে সে যে রাজিবের ওপর বিতৃষ্ণ এটাই প্রমাণ করেছে।

আমি কুঙ্কুম মেয়েটিকে বুঝতে পারলাম না—রাজিবকে শোবার ঘরে রেখে রান্না ঘরে আসতে কুঙ্কুম ভাবতে শুরু করল, এবং ঠাণ্ডা ভাত তরকারি গলা দিয়ে নামাতে নামাতে ওর ভাবনা গড়িয়ে চলল, যখন ছোট ছিলাম, ফ্রক পরতাম, প্রজাপতির পিছনে ছুটতাম, চিৎকার করে কবিতা আওড়াতাম, তখন সুখ কাকে বলে জানতাম না; যদিও তখন সুখে ছিলাম; আহা কি গভীর সুখে—কি ঘন উত্তপ্ত সুখের সময়ে ডুবে ছিলাম আমি।

কুঙ্কুম জানলা দিয়ে দেখল বুনো আতাগাছটায় এইটুকু একটা পাখি লাফাচ্ছে।

যখন কেউ সুখে থাকে সে খবর সে জানে না, কারণ সুখ এমন একটা জিনিস যার সম্বন্ধে তুমি সচেতন থাকলে সে উবে যায়। এবং সময়—মানে বর্তমান আর কি—প্রত্যেকটি জিনিসের মধ্যে ঢুকে পড়ে, দাঁত বসায় ফেড়ে ফেলে। অথচ অতীত তা নয়, অতীত বা স্মৃতি সুখের আস্তর বিছিয়ে দেয় সব কিছুর ওপর। চিন্তাটা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল বলে কুঙ্কুম আরও গুছিয়ে ভাবার চেষ্টা করছিল। যখন বড় হবার স্বপ্ন দেখতে শিখলাম: কলেজে পড়ার সময়। এবং আশ্চর্য যে স্বপ্ন দেখছি সব সত্যি হয়েছে। রাজিবকে পেয়েছি, সচ্ছলতা পেয়েছি, শোবার ঘরে যা যা ভেবে রেখেছিলাম সব আছে—শুধু আলমারীটা টিকের নয় কাঁঠালের আর আলনাটা ভারি সস্তা দামের। তবু বলা চলে মোটামুটি স্বপ্ন সফল হয়েছে। কিন্তু স্বপ্ন দেখার সময় যে সুখ ছিল, কাজে খেটে গেলেও সেই স্বপ্ন আমাকে সুখ দিতে পারছে না।

কুঙ্কুম যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলো তখন রোদের তেজ নেই। উঠোনে দাঁড়িয়ে কুঙ্কুম আকাশ দেখছিল। আকাশের রং প্রায় শাদা এবং পাখিরা চলাচল করছিল। এখন সুন্দর বিকেল নেমে আসছে—ভাবল কুঙ্কুম, যদি সুখ কিছু থাকে; আমি যখন এইভাবে আকাশের দিকে চেয়ে থাকি, আতাগাছে কাঠবিড়ালী দুটোকে দেখি এবং—এবং আমি নগ্ন হলেও সমস্ত আকাশ এবং প্রকৃতি যখন আমার দিকে চেয়ে থাকে আর পৃথিবীর বুক থেকে গুনগুন ভেসে আসে—তখন আমার খুব ভাল লাগে! আমার মনে হয় এমনি করে ভাল

লাগাই সুখ আর এমনি করে চিরকাল—চিরকাল সুখে থাকতে পারি আমি। এইসব ভেবে দুঃখের গহ্বরে পা দেয়ার জন্য সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে কুঙ্কুম দেখল দেয়ালে বিকট আকারের টিকটিকিটা নিস্পন্দ চোখে চেয়ে আছে একটা পোকার দিকে। কুঙ্কুম দাঁড়িয়ে পড়ল এবং তার বুকের মধ্যে এমন যন্ত্রণা উঠল যে মুক্তোর মত ঘাম জমল তার কপালে ঠোঁটে চিবুকে। টিকটিকিটা নিঃশব্দে এগিয়ে গেল একটু—স্রোতের মত একটা কদর্য হিল্লোল তার ঘাড় থেকে পিঠ, পিঠ থেকে দু'তিনটে বাঁক নিয়ে লেজের দিকে নেমে এলো। পোকাটার একেবারে কাছে এসে স্থির দাঁড়িয়ে আছে টিকটিকিটা—পেতল রঙের ঠাণ্ডা চোখ পলকহীন! কুঙ্কুম ঘাড় ফিরিয়ে দেখল প্রকৃতি বারুদের মত অপেক্ষা নিয়ে থেমে আছে। তখন সে কিছুতেই সহ্য করতে পারল না এবং টিকটিকিটা লাফ দেবার সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট চিৎকার করে ঘরে ঢুকে পড়ল।

সেখানে রাজিব বিছানার ওপর উঠে বসে আছে। চেয়ে আছে। কুঙ্কুম চেয়ারের পিঠে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে, তারপর মসৃণ টেবিলে হাত রেখে, বই-এর র‍্যাক ছুঁয়ে—তার চিরকালের স্বপ্নের প্রত্যেকটি জিনিসের কাছে আশ্রয় চেয়ে চেয়ে সমস্ত ঘরটা পরিভ্রমণ করছে। আর, এইসব বর্তমানের দস্তাঘাতে আহত ক্ষতবিক্ষত আসবাবগুলো; বেঁচে থাকার ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন বস্তু পিণ্ডের মধ্যে যখন তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে, রাজিব বিভ্রান্ত স্থির চোখে তার দিকে চেয়ে আছে—তখন আপন অস্তিত্বের অতল থেকে উঠে-আসা দুঃখের অন্ধকারে মেয়েটি ডুবে যাচ্ছে, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না॥

গোলাপের নির্বাসন

জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত

আত্মার আত্মীয় গোলাপ আমার সহোদরা।

আমাদের পিতা ছিলো না, মাতা ছিলো না, কেবল সতেজ রৌদ্রকরে এবং পবনের দাক্ষিণ্যে আমরা সুসলিলা পৃথিবীতে আশৈশব স্পন্দিত হয়েছিলাম।

পরস্পরের বাইরে আমরা কাউকে জানতাম না তখন। ফলত, গোলাপকে আমি দেবীর মতো হৃদয়ে স্থাপন করেছিলাম তার মধ্যে আপনার ছায়া দেখবো বলে এবং সযত্নে, সঙ্গোপনে লালন করেছিলাম সে আমার আনন্দ হবে বলে।

গোলাপ কোনোদিন পিতৃস্নেহ বা জননী-সান্নিধ্যের অভাব অনুভব করতে পারে নি। বরং বলা যাক, একাধারে আমাতেই সে মাতা এবং পিতাকে প্রত্যক্ষ করেছিলো। আমি তাকে স্নিগ্ধ প্রদীপশিখার মতো প্রজ্বলনের ক্ষমতা দিয়ে অন্যায়ী বায়ুর প্রতি তীক্ষ্ণ লক্ষ রেখেছিলাম, যেনো সে সহসা কৃতকার্য না হয়।

অন্ধকার উদ্যানে সমুজ্জ্বল পুষ্প আমার গোলাপ।

জানালার খড়খড়ি তুলে আমি গোলাপকে দেখলাম। দিনের আলোয় ছায়াচ্ছন্ন পথে তার দেহ সে কি মোহন দৃশ্যের অবতারণা করে। তার সুঠাম দেহ, সুগঠিত যৌবন, অপূর্ব মুখশ্রী, বংকিম চাহনি প্রতি পদক্ষেপে পথচারীকে স্তম্ভিত ও উপাসক করে দিয়ে যায়।

কিছুক্ষণ আগে সে আমার পাশে ছিলো। তার দেহের সুবাস এখনও এই কক্ষের পরিসরকে ছাড়িয়ে যায় নি। দরজার বাইরে পা দেওয়ার মুহূর্তে সে পরম মমতায় আমার ললাট স্পর্শ করলে আমি তার মস্তকে ওষ্ঠ রাখি। আলো, ছায়া, পথ, মানুষের নক্‌শা সমস্ত কিছুর ওপারে আমরা তখন শৈশব-নিহিত স্মৃতির দাস। মুহূর্তে সেই নদী দেখা দেয় যে প্রমত্তা নয়, নবদূর্বাদল যার প্রান্ত সযত্নে ধারণ করেছে। আমার চপল হরিণশিশু, আবেগে ক্রীড়ামত্ত। দূরে ভাসমান একাকী কচুরীপানার ঝোপ, কয়েকটা জলপোকা কেবল নদীর ঘোলাজলের সৌন্দর্য বাড়ায়। স্মৃতি ক্রমে আসে, ক্রমে যায়।

বৃক্ষলতার সবুজ আমাদের মনোহরণ করলে, কোনো নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে আমরা বনবাসী হতাম। সেখানে কালানুযায়ী কোকিল বা বউ-কথা-কও পাখির স্বরের প্রতিধ্বনি অথবা ঝোপের মাঝে হঠাৎ পরিষ্কার কিছুটা ফাঁকা জায়গা পরম রসভোগের কারণ হয়। কোনো বিগত-মধ্যাহ্নকালে ঘরের পিছনের ভাঙড়া ঝোপে, লাউডগা সাপের স্বচ্ছন্দ গতিভঙ্গি আস্তাকুঁড়ে অকস্মাৎ গো-সাপের আবির্ভাব অবশ্যই রহস্যের অবতারণা করতো। এবং কোনো আসন্ন সন্ধ্যায় নোঙরের মতো শিকড়ওলা ডুমুরগাছ হঠাৎ আশ্রয়ের মতো বোধ হয়।

এই সমস্তই আমাদের সঙ্গে নির্বোধ কুমীর, মর্কট, ধূর্ত শৃগাল প্রভৃতির পরিচয়ের পথ উন্মুক্ত করে দেয় এবং পরিশেষে সুবচনীর হাঁস, টুনটুনি, অরুণ-বরুণ এদের সঙ্গে যোগ দিলে আমরা চট্টগ্রাম-মেদিনীপুর-বাঁশের কেল্লা স্মরণ করে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠি।

সেই মোহন শৈশব-কৈশোরে আমাদের কোনো নাম ছিলো না। আমি এবং গোলাপ তখন পরস্পরের মধ্যে নিহিত ছিলাম। বর্ষায় দিগন্তপ্লাবী সমুদ্রে ডিঙ্গিনৌকার আরোহী আমরা এখন, কালক্রমে পৃথক অস্তিত্বকে স্বীকার করেও কেউ কাউকে পরিত্যাগ করতে পারি না। ত্যাগের চিন্তা বাতুলতা প্রতিভাত হলে বক্ষ আনন্দের শ্বাসে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

গোলাপের কোনো বাসনাই আমি অপূর্ণ থাকতে দিতাম না। প্রাক-যৌবনে মিছিলে চিৎকার করে স্বর ভেঙে গেলেও শ্লোগানের সুরে আমার সর্বাঙ্গ কম্পিত হতো। অন্ধকার রাত্রিতে প্রাচীরপত্র লাগাতে গিয়ে প্রহরীর হুমকিও আমায় বিচলিত করতো না, কেননা, আমি জানতাম, গোলাপ এর সবই পছন্দ করে। সমস্ত শহর ঘুরে খবরের কাগজ ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার কালে মলিন জামার আস্তিনে ললাটের স্বেদকণা মুছতে আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত হতাম না। কেননা, আমি জানতাম, গোলাপ আছে।

কেবল কখনো প্রচণ্ড বর্ষণ আমায় কিছু সময়ের জন্যে কোনো গৃহবাসীর বারান্দায় বিশ্রাম নিতে বাধ্য করলে এবং সে ভ্রূকুটি করলে, ক্ষণিকের জন্যে গোলাপকে ভুলে যেতাম এবং হায়রে জীবন হায়রে পৃথিবী—এই সব কথা আশপাশে ধ্বনিত হতো।

অবশেষে আমি সমস্ত পথ পার হয়ে এলাম। কোথাও থেমে যাই নি; হতোদ্যম হয়েও ক্ষান্ত হই নি; ভেবেছি জয়মাল্য অবশ্যই আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। ভাবতাম, তাকে আমি সুখী করবোই!

সেই জন্যেই আমার ভবিষ্যৎ প্রায় নির্ধারিতই ছিলো। সরকারী আমলা, স্থূলোদর ব্যবসায়ী, হৃদয়হীন চিকিৎসক, অন্যায়ী কারিগর কোন রূপেই আমাকে মানায় না। আর তাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্যাগত আইনজীবী আমি গোলাপকে সম্মুখে রেখে অগ্রসরমান।

দেখলাম স্থলপদ্মের শোভা। হাল্‌কা গোলাপী রং কেমন করে ক্রমান্বয়ে গাঢ় হয় এ লক্ষযোগ্য। রজনীগন্ধার আনন্দ বর্ষায় কিন্তু প্রিয়তম যেহেতু সুদূরগত নন অতএব পার্শ্ববর্তীও হওয়া চলে বৈকি এবং ওখানে ওই শিউলি। কেবল গোলাপের কার্পণ্য।

আমি ফুলবাগানে ঘুরে বেড়াতে থাকলেও তাকে সর্বদাই দেখতে পাই। আহার, নিদ্রা, অর্থোপার্জন সব যথানিয়মে চলে এবং চলে আমার ফুলবাগানে পসরা সাজানো।

আমার হাতে কিছু যন্ত্রপাতি। কিছু মাটি তাতে লীন হয়ে আছে—কিছু আমার বসনেও আছে। যে-ক'জন ফুলবালার পরিচর্যা করেছিলাম তারা আমার দিকে তাকালে নিঃসন্দেহে বুঝতে পারি, কেউ-ই অকৃতজ্ঞ নয়।

আমার ছায়া ক্ষুদ্রতর হতে থাকলে গোলাপ ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। তার শাসনের ভ্রূভঙ্গি পরম রমণীয় বোধ হলে যুগপৎ আমার মনে বেদনার সঞ্চার হয়।

আমি তাকে চিত্র-কাহিনীর পিতার মতো করে বললাম, গোলাপ, তুই চলে গেলে আমায় কে দেখবে।

সে তো নায়িকা নয়, অতএব, মনি, তুমি পাগল হয়ো না, আমি আছি, এই কথা বলে না। সে বলে, আমি গেলে তোমার আর কেউ থাকবে না। তার জন্যে এখন থেকে ভেবে লাভ কি? বরং তুমি উঠে এসে তৈরী হয়ে নাও।

আমি লক্ষ করলাম, কথাগুলি উচ্চারণকালে তার সমগ্র অবয়ব দ্রব হয়ে স্বচ্ছ কুলুকুলু তটিনীর মতো বহতা হতে চায়।

ধ্রুপদী গানের মতো তার ব্যবহার আমায় আদৌ বিস্মিত করে না। আমি কেবল তার সম্মুখে স্বরলিপির পাতা উল্‌টে সমগ্র রাগিণীকে প্রস্ফুট করে তুলতে সাহায্য করি।

বাগান থেকে উঠে এসে ঘরে ঢুকলাম। সেখানে ক'জন লোক বসেছিলো, তারা আমার ভব-বৈতরণীতে গাভীর গুচ্ছ। সিনিয়র চৌধুরী এঁদের

পাঠিয়েছেন, যেনো আদালতে বেরুনোর আগে নথিগুলো আর একবার দেখে নি।

চৌধুরী স্থির করেছেন, আমাকে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে দেবেনই। এবং যোগ্য সহকারী এই খ্যাতিতে আমি শীর্ষনিম্নে প্রায় পৌঁছেই গেছি, এখন কেবল আরোহণ বাকি। এই অবসরে ফেলে আসা পথ ইত্যাদি জরিপ করে ফেলবার চেষ্টা করি।

অখিলবাবুর কথা স্মরণে আনা যায়। মলিন বস্ত্র, জীর্ণ ছাতা ও উকিলের পোশাক এবং তাঁর সারা মুখে ঘামের প্রসাধন আমতলায় আনন্দ সঞ্চার করতো, আর নবীনদের জন্তে ভীতি ও সংশয়। অথচ আমরা জানতাম দশ হাজার টাকার বিনিময়েও তিনি দত্ত এ স্টেটের পিতৃব্যপক্ষকে সন্তুষ্ট করতে রাজি হন নি; নাবালক উত্তরাধিকারীর স্বার্থহানির ভয়ে।

যাই হোক, এ-সমস্তই আমার জন্তে খুব সাধারণ কথা। আমি স্থির করে নিয়েছিলাম যে, অখিলবাবু না হয়েও অখিলবাবুই থাকবো। গোলাপকে আমি বাঁচাবোই, তাকে কখনো শুকিয়ে যেতে দেবো না!

রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিলাম। গোলাপ আবার বাইরে দাঁড়ালো, সে আমার যাওয়া দেখতে চায়। দূরে একদল দেখে বুঝলাম, গোলাপও এখুনি বেরিয়ে যাবে। ওর সহপাঠিনীদের সকলকে আমি চিনি না। তবুও কাউকে কাউকে চেনার চেষ্টা করতে হয়। সবাই গোলাপের সতীর্থ, আমার আদরের।

খানিক দূর হেঁটে এলাম। আগের রাতের সেই যে মাতালের দল—লক্ষ কোটি কোটি মাতালের দল শুঁড়িখানায় জায়গা না পেয়ে পথের নীচু জায়গা-গুলোতে পড়ে আছে। সামান্ত স্পর্শেই তাদের বেসামাল অবস্থা। কোনো ভারী যানের চাকা তাদের অঙ্গশায়ী হলে তারা এমন ছোটাছুটি করে যে, পথ চলা ভার। তাই আমায় সাবধানে এগুতে হয়।

মোড়ে এসে দেখলাম তারা সবাই দলে দলে দাঁড়িয়ে আছে। আমার কৈশোরের প্রতিমূর্তি সব। তেমনি রুখু চুল হাওয়ায় ওড়ে—ওমনিবাস সাহিত্যিক-রচিত উপন্যাসের নায়কের মতো। তাদের অযত্নপোষিত বেশ, বেপরোয়া গতিভঙ্গি সব আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু আমার সান্ত্বনা যে, গোলাপ আছে, সে এদেরই একজন।

ওরা ক্রমে সংঘবদ্ধ হতে থাকে। অধিক লোকের সমাবেশ ঘটলেই বুঝি সমুদ্রের সংগে তুলনা দেওয়া হয়—জনসমুদ্র। সে সবখানেই—এখানেও জন-

সমুদ্র আর বিমানবন্দরে কোনো গরিনসীন নেতার অভ্যর্থনাকালে অর্থবশ দরিদ্র সমাবেশও জন-সমুদ্র।

আমি প্রতিদিনই কিছুক্ষণ দাঁড়াই এখানে। সিনিয়র চৌধুরী একটু ঘোরাপথে হলেও আমায় তুলে নিয়ে যান এবং আমি শীর্ষে আরোহণের আশায় মোটে বাক্যব্যয় করি না। যদিও এইসব সময়ে হীনমন্যতা পীড়িত করলে গোলাপের কথা স্মরণ হয়।

চৌধুরী ওদের সমাবেশ দেখে পথে আমায় কিছু কথা বলেন, যেমন অনুন্নত দেশে ছাত্র-আন্দোলনের অনিবার্যতা, রাজনীতিতে তাদের স্থান এবং সমগ্র অবস্থার ফলশ্রুতি। তিনি জনসমাজে এই উচ্ছৃংখল পরম বিবেচক দরদী দুলালদের দুঃখের অংশভাগী বলে পরিচিত এবং আমার সন্দেহ, তাঁর শীর্ষারোহণের জন্যে এরাই দায়ি।

আমি সকালবেলার কাগজের খবর উল্লেখ করে বলি, শান্তিপ্রাপ্ত সতীর্থদের জন্যে এদের ভালোবাসাই তখনকার সমাবেশ। এরা স্পষ্ট জানে, মৃত্যুকে সকলে ভাগ করে নেবো, অতএব, সুখ অথবা দুঃখ সকলের। বিতাড়িত বন্ধুদের জন্যে এদের চক্ষু সজল।

সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে আমি যোগ করি, আইনের আশ্রয় এ-ক্ষেত্রে নেয়া চলে। আর ওদের তা করা উচিত।

তিনি অন্যমনস্ক স্বরে বলেন, হ্যাঁ।

তাঁর ঔদাসীন্য আমায় বিস্মিত করলে বিগত কোনো বর্ষে অনুরূপ ঘটনার কথা স্মরণ করি। তখন কেবল মাত্র এঁরই উৎসাহে ওরা জয়ী হয়।

আমি বললাম, সম্ভবত ওরা আমাদেরই শরণ নেবে।

এই উক্তি তাঁকে উদ্বিগ্ন করেছে দেখা যায়, ওরা কি তোমার কাছে এসেছিলো?

আমার বুকে গভীর শব্দ হ'তে থাকে। সকালে গোলাপের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি স্মরণ হয়। তার বন্ধুদের জন্যে আমি সব সময় রয়েছি এই বিশ্বাসে তার বুক এখনো ভরে আছে স্মরণ রেখে বলি, না ওরা কেউ আসে নি, তবে এই সকলের ধারণা যে, আপনিই একমাত্র ব্যক্তি।

তিনি স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ বাইরে তাকিয়ে থাকেন, কিছুক্ষণ আমার দিকে। এই বয়সে তাঁকে গাড়ির চামড়া মোটা আসনের কোণ ছেঁড়বার বৃথা চেষ্টায় নিয়োজিত দেখে আমার প্রকৃতই মমতাবোধ হয়, না মনি, আমরা এবারে এ সবের মধ্যে যাচ্ছি না।

তাঁর সিদ্ধান্ত আমায় হতবাক করে দেয়, কিন্তু কতো আশা, কতো বড়ো বিপদ—।

না, বিপদ এমন কিছু নয়, তিনি বলেন, কিছু কষ্ট হবে ওদের। অ্যাড্‌ভোকেট আহমেদ বা খান রাজি হয়ে যেতেও পারেন।

কিন্তু ওদের অর্থবল তো—

চুপ করো। ওঁর করুণ অনুনয়ে আমায় থামতে হয়, তুমি তো জানো, বড় খোকা দু'বছর পরে বাইরে এসে কতো কষ্ট করে কাগজটাকে দাঁড় করালো—ওরও তো ভবিষ্যৎ চাই; বলো এমন অবস্থায়—

আমি কিছু না বুঝে তাঁর চোখে চোখ রাখলে তিনি বললেন, তুমি জানো না, লোক এসেছিলো এরই মধ্যে, আমায় তো কিছু করতে পারে না, বলছিলো স্যার, আপনার কাগজের জন্যে আমরা খুব ফীল করি স্যার, কিন্তু স্যার—, ইত্যাদি।

কিছুই আর অবোধ্য থাকে না। কিন্তু এ-আমি কি করে মেলাবো? গোলাপকে বোঝাবো কি দিয়ে? কোনদিন তার কোনো ইচ্ছা আমি অপূর্ণ রাখতে পারি না। যদি সে আমায় ঘৃণা করে।

প্রায় আগত শীত সকালে আমি দারুণ গ্রীষ্মে সরব উপস্থিতি অনুভব করি। তারা আমায় কি নির্যাতন শুরু করে। আমি প্রতিবাদে উচ্চকণ্ঠ হতে পারি না। আমার শৈশব, কৈশোর, যৌবন গোলাপকে পুরোভাগে রেখে মিছিল করে এগিয়ে আসতে থাকে।

প্রতি মুহূর্তে তাদের আগমন সম্ভাবনায় আমি সশঙ্কিত। এই সময় ক্ষেত্রে কার্যক্রমে ক্রমাগতই প্রমাদ ঘটা স্বাভাবিক। সিনিয়র চৌধুরী আমায় কেন্দ্রচ্যুত লক্ষ করে সে-দিনের জন্য বিশ্রাম নিতে পরামর্শ দেন। কিন্তু আমি কোথায় যাই? সর্বত্রই তাদের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হতে থাকে। যে কোনো গোপন স্থান থেকে তারা আমায় টুঁড়ে আনতে পারবে। কেনো না, গোলাপের সহোদর আমি কখনো আত্মবঞ্চনা বা প্রতারণা শিখি নি।

ভীতিকর সেই বিশাল ভবনের বাইরে এসে দেখলাম, বৃক্ষকুল আর ছায়া দিতে চায় না। তাদের ছায়া কেবল তাদের পদপ্রান্তে পড়ে থাকে। যদিও জানা আছে, ক্রমাগতই তারা বিস্তৃত হতে থাকলে আমার কোনো প্রয়োজনে আসে না।

এখানে-সেখানে ইতস্তত জনসমাগম কেবল আমার অনুসন্ধিৎসা বাড়িয়ে তোলে। অনুভূতি এতো প্রবল হয়ে ওঠে যে, বৃক্ষপত্র পতনের শব্দও মনে হয়, কান এড়াবে না।

দূর থেকে আমায় দেখতে পেয়ে ওরা দ্রুত এগিয়ে আসতে থাকে। প্রত্যেকের মুখে দুশ্চিন্তা এবং আশা পাশাপাশি রয়েছে। বর্ণময় গোলাপকে আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম। সে ওদের সঙ্গে আসবে আমি জানতাম। সেই মুহূর্তে আমার কেমন ক্রোধ হয়। কেন সে ওদের সঙ্গে আছে। এ কি আমাকে ঘৃণা করার, আমাকে ত্যাগ করার কৌশল মাত্র।

আমার বিবর্ণ মুখমণ্ডল তাদের কাছে কোন কথাই গোপন রাখে না। ফলে আমি যখন উৎফুল্ল হওয়ার চেষ্টায় বলি, মনে হয়, অ্যাডভোকেট আহমদ, তোমাদের আরো বেশি কাজে আসবেন, তখন সেখানে বিন্দুমাত্র আনন্দের সঞ্চার হয় না। আমি গোলাপকে লক্ষ করতে থাকি। সে বিস্মিত, বিভ্রান্ত চোখে আমার দিকে চেয়ে থাকে। আমি বুঝি ওর অপরিচিত অথবা এ আমার পরিহাস, সম্ভবত সে এ-সব কথাই ভাবে।

এমন করে চলে না, ওদের মধ্যে কে একজন বললো। আমি দেখি তাদের মুখে রক্তবর্ণ উঁকি মারে। আর সেই অগ্নির সম্মুখে দণ্ডায়মান আমি দগ্ধ হতে থাকি।

কিন্তু কেনো এমন হবে, আর একজন বলে।

তাদের প্রত্যেক চোখে অবিশ্বাসীর দৃষ্টি। ঘৃণাও বুঝি আছে। কিন্তু আমি সে-সব লক্ষ করি না, যেহেতু জানা আছে, ওরা কতো সংবেদনশীল অতএব আমি সব বুঝিয়ে বলতে থাকি।

অসন্তোষ নীরব হয়, ক্রোধ বিদূরিত। কেবল যোজনব্যাপী হতাশায় তারা আচ্ছন্ন হয়। কি উপায়!

গোলাপের মুখাকৃতিতে তখন আর কোনো বিস্ময় ছিলো না। বিষণ্ণ বদনে সে ধিক্কারে গ্লানিতে ক্রমে সকলের পিছনে সরে যায়। মনে হয়, আমার অগৌরব, অপমান, অক্ষমতা সমস্ত তাকেই বিদ্ধ করছে। সে যদি পারতো তাহলে এই মুহূর্তে আপন অবয়বকে ধূলিলীন করে দিতো।

অথচ তার এই ভাব আমাকে কেবলই প্রাণহীন করে দিতে চায়। সে যদি অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি আমার দিকে নিক্ষেপ করে ধিক্কার দিয়ে বলতো, ছিঃ মনি, তুমি এই। এই তোমাকে আমি আজীবন জেনেছি, এই তোমাতে আমি আশ্রয় খুঁজেছি! তাহলে বরং আমি তার হাতে হাত রেখে অনুনয় করে বলতাম, গোলাপ আমায় ক্ষমা কর ভাই।

কিন্তু সে তেমন কিছুই বলে না, কেবল বোঝা যায়, আমাদের মাঝে শূন্যতা দিগন্তবিস্তারী হচ্ছে যা কেবল বিচ্ছেদের ইংগিত বহন করে।

আমি বাইরে রয়ে গেলাম। গোলাপকে যতোবার চোখে দেখা যায় ততো বেদনা বাড়ে। সে এখন গমনোন্মুখ অতএব তার সঙ্গে এখানেই শেষ সাক্ষাৎ করা যাক। আমিও স্থির জানি যে, এই বিদায়কালে সে-ও কিছুতেই নিজেকে সম্বরণ করতে পারবে না। ফলে আমাদের আবাল্য অবস্থানের স্মৃতি উভয়কে বিমনা করে দিলে আপন অপরাধবোধ আরো তীব্র হবে।

আমি হৃদয়ে অনুভব করেছিলাম, গোলাপকে আর রাখা যাবে না। কেবল আত্মগ্লানির জন্যে নয়, তার বাসনা পূর্ণ করতে পারা যায় নি বলে নয়, প্রতিদিন তার সম্মুখে নিজেকে ধিক্কার দিতে পারবো না বলেই একটি সহজ বিচ্ছেদ অধিকতর সহনীয়, যদিও জানা আছে গোলাপহীন আমার পরিচয় জনসমক্ষে উচ্চারণ করা যাবে না।

আমি এ-ও জানতাম, যদি ইচ্ছা করি গোলাপ আমার ভালোবাসার জন্যে নিজের অবয়ব বদলাবে, বাসনার পরিবর্তন ঘটাবে, পরিবর্তিত অবস্থার দাসত্বেও সে আমার মানসপ্রতিমা থাকতে পারে, কিন্তু আমি তা চাই না। অক্ষুণ্ণ, অখণ্ড, অপরিবর্তিত গোলাপ যেনো অপরেরই মনোলীনা হয়, সে যেনো অন্যের হৃদয়ে বাস করে।

লৌকিক অর্থে এ-আমার, কর্তব্যও ছিলো যেহেতু সকলেই স্বীকার করেন, গোলাপরা চিরকাল থাকে না, কোনো এককালে অপরের হস্তগত হয়ই।

সে-জন্যেই আমার এই উদ্যোগ এবং তখন আমি তার পদধ্বনি শুনে চকিতে ফিরে দাঁড়ালাম। সখিজনপরিবেষ্টিতা গোলাপ আমার সম্মুখে আসতে থাকে। তার পদক্ষেপ অসমান এবং বিলম্বিত। জলন্ত প্রদীপশিখা বায়ুতাড়িত হয়ে আপন অঙ্গকে অনবরত অত্যাচারীর ইচ্ছার অভিমুখে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ধরলে সেখানে যেমন এই আলো এই আঁধারের সৃষ্টি হয় আর পরস্পরের মুখমণ্ডল বিস্মৃতি ও স্মরণের পারে এসে খেলা করতে থাকে, এখন এখানেও তেমনি ঘটে চলে।

তাকে আমি দেখলাম বিষাদময়ী প্রতিমা; যদিও নবসাজে সজ্জিতা তাকে রাজেশ্বরী মনে হয়। সে সাশ্রু, কম্পিতা, নিরালম্ব, আর আমার কণ্ঠ শেষ তীক্ষ্ণ আর্তনাদ প্রস্তুত করতে চায়, আর আমি পারি না, গোলাপ ক্ষমা কর, গোলাপ যাস্ না।

সে আমার কাছে এলে আমি তাকে বক্ষে ধারণ করি। সেই ক্লান্ত, প্রভাহীন মুখশ্রী আবার আমাকে অস্থির করে তোলে। আমি আবেগে, দুঃখে, স্নেহে, ভালোবাসায় তার মস্তকে আপন কপোল ন্যস্ত করি।

কিন্তু তখন আর ফেরার পথ নেই। সে অপরের মনোবাসিতা। আমি ধিক্কৃত। আমি অস্ফুট, অব্যক্ত, ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করি, আর দেখা হবে না গোলাপ!

যাওয়ার মুহূর্তে, আমার বক্ষ ত্যাগ করে সে দাঁড়ালো, আর আমি হাহাকারের মতো শুনতে পেলাম, মনি, তুমি কি আমায় নির্বাসনে পাঠাচ্ছো?

আমি বললাম, না, গোলাপ, বনবাসী হলাম আমি। এই মরুময় উদ্যানে একটি মাত্র পুষ্প বিকশিত ছিলো। তার অভাবে উদ্যান এখন অরণ্যে পরিণত হলো; আমি অরণ্যবাসী হলাম। কেবল ভয়াল শ্বাপদ আর স্থবির বৃক্ষের রাজত্ব স্থাপিত হলো এখন।

তবে গোলাপ, যদি কখনো আকস্মিক এক ঝড়ের শেষে বৃক্ষপত্রের অন্তরাল থেকে সুনীল আকাশ মুখ বাড়ায়, তখন মনে পড়বে, তুমি ছিলে!

রসবতী

আবদুর রশীদ ওয়ালেকপুরী

সংসারে আমরা ছিলাম মাত্র তিনটি প্রাণী—আম্মা, আব্বা ও আমি। দিন এক রকম ভালই যাইতেছিল; কিন্তু বিধি বাম। গত দুর্ভিক্ষে আম্মা মারা গেলেন। জয়ীফ আব্বা দ্বিতীয়বার আর পাণিগ্রহণ করিলেন না। অথচ সংসারে রান্নাবান্নার ও দেখাশোনারও কেহ নাই। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, দাদার আমলের সম্পত্তির কিছুটা বিক্রয় করিয়া আব্বা একদিন আমাকে বিবাহ করাইলেন।

স্ত্রীর নাম বাহারউন-নেসা। আমি পেয়ার করিয়া ডাকি 'রসবতী'। রসবতীর দৌলতে আব্বার অজুর গরম পানিটা, জায়নামাজটা, সময় মতো খাওয়াটা, এমনকি, খাওয়া-দাওয়া শেষে হামান-দিস্তাটাও মওজুদ থাকিত। দিন গড়াইয়া চলিল।

এই গড়ানির মধ্যেই আব্বা একদিন তলাইয়া গেলেন। রহিলাম—আমি, রসবতী ও অভাব মিঞা। বড় মিঞা, ছোট মিঞা—সকল মিঞার অন্ন-বিস্তর পরিচিত এই অভাব মিঞা কি করিয়া আমাদের দুইটি প্রাণীর ক্ষুদ্র সংসারে ঢুকিয়া পড়িলেন, টেরও পাইলাম না। ঢুকিয়া যখন পড়িলেন, তখন আর কি করি! ভদ্রলোককে তো মুখের উপরে বলিয়া দিতে পারি না—"জনাব, এবার পথ দেখুন!" ভাবিলাম, আজ না হোক, দুইদিন পরে হইলেও তিনি চলিয়া যাইবেন। কিন্তু না, অভাব মিঞা গেলেন না। দিন দিন আমরাই শুধু কাহিল হইয়া মউতের পথে আগাইয়া যাইতে লাগিলাম। তিনি পুষ্ট হইয়া শিকড় গাড়িতে লাগিলেন। এই দিকে রসবতীরও ঘ্যানর ঘ্যানর ভাল লাগিতেছিল না। একদিন রসবতী রাগিয়াই বলিল: "অভাব মিঞাকে তাড়াবার মুরোদ নেই, তিনি আমার মরদ!"

রসবতীর কথায় রীতিমত অপমান বোধ করিলাম। পৌরুষে লাগিল আমার। উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসা অভাব মিঞা বেটাটাকে তাড়াইতেই হইবে; এবং রসবতীকে দেখাইয়া দিতে হইবে—তোমার স্বামী-পুরুষ মরহুম দিলদারাজ খানের পুত হায়াতদারাজ খান্ যেমন তেমন পুরুষ নয়, ইচ্ছা করিলে শুধু অভাই মিঞাই নন, তাঁর চেয়েও বড়বড় মিঞাদের তাড়াইতে সক্ষম।

অবশেষে অভাব মিঞাকে তাড়াইবার প্রতিজ্ঞা করিয়া গাঁও-গেরাম ছাড়িয়া একদিন সদর্পে নগরে আসিয়া উপনীত হইলাম। প্রথম কয়েকদিন ঘুরিয়া ফিরিয়া নগরীর শান-শওকত দেখিলাম, বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইলাম। কল্পনা করিলাম, রসবতীকে লইয়া যদি নগরীতে নীড় বাঁধা যাইত, কি আনন্দই না হইত!

একদিন দুইদিন করিয়া মাসগুলি টপকাইয়া বছর অতিক্রম করিলাম। আজ এই অফিসে, কাল ঐ অফিসে, আজ এই সাহেবের বাসায়, কাল ঐ সাহেবের বাসায় গিয়া গিয়া ধর্ণা দিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যেই পায়জামায় তালি পড়িয়াছে, পাঞ্জাবীতে ফাটল ধরিয়াছে, জুতাহীন আল্লা-প্রদত্ত পায়ের পাতা ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, চোখে দুই-একটি শর্ষেফুলও জাগিয়াছে। ট্যাঁকে পয়সা নাই বলিয়া পেট খালি হইল; কিন্তু এত ঘুরাঘুরি করিয়াও কোথাও 'কর্মখালি' দেখিতে পাইলাম না বা কেহ আমাকে দিয়া কোনো খালি-ই পূরণ করিলেন না। আশায় আশায় বৈরাগীর নাচ শেষ হইল। একদিন চলৎ-শক্তিও হারাইয়া ফেলিলাম।

এককালের সুহৃদবরদের আত্ম-কেন্দ্রিকতাও লক্ষ্য করিলাম। দুই এক জনের সাথে কালেভদ্রে পথে-ঘাটে যদিও বা দেখা হইয়া যায়, কিছু বলিবার পূর্বেই নিজের রাজ্যের অভাব-অভিযোগের ফিরিস্তি বর্ণনা করিয়া দেয়। তারপর হাত ঘড়ির দিকে তাকাইয়া "অফিসে লেট হয়ে যাচ্ছে, এখন চলি, বাসায় দেখা করিস"—এক সঙ্গে এতগুলি কথা বলিয়া ব্যস্ততা সহকারে চলিয়া যায়। এমন কি, কোথায় তার বাসা, নম্বরই বা কত, কিছুই বলিয়া যায় না বা টুকিয়া নিবারও ফুরসুত দেয় না! বন্ধু-বান্ধবদের এবম্বিধ ব্যবহার দেখিয়া আমার নীরব হাসিই পাইত; কিন্তু যখন বত্রিশ নাড়ী বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া দিত, তখন অসহ্য হইয়া প্রায় কাঁদিয়াই ফেলিতাম!

সেইদিন কি ভাবে যে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, বুঝিতেই পারিলাম না। রমনা রেসকোর্সের মাঠের মন্দির বাড়িটার সম্মুখস্থ পুকুরটির পাড়ে বসিয়া আছি। ভরা জ্যোৎস্না। চাঁদের রুপালী আলোয় প্রকৃতি হাসিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে দেশের কথা, রসবতীর কথা আমার মনে পড়িয়া গেল। আজ পুরা একটি বছর বেচারী দেশের বাড়িতে কি ভাবে, কি খাইয়াই না আছে! তার কথা স্মরণ হইতেই মন আমার হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বেচারীর কোনো সাধ-আশাই মিটাইতে পারিলাম না। বড়ই 'কোমলপ্রাণ'। আসিবার দিন আমাকে ধরিয়া সে কি কান্না! আমি তার কথা চিন্তা করিতে

করিতে তন্ময় হইয়া গেলাম। হঠাৎ অদূরে কোন্ এক বিদেশী কোম্পানীর ম্যানেজার দম্পতির হাসিতে আমার তন্ময়ভাব কাটিয়া গেলো। দেখিলাম, তাদের ছোট্ট ছেলেটি কালো কুচকুচে 'ক্যাডিলাক' গাড়িটাতে হাত রাখিয়া চাঁদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ইংরাজিতে ছড়া কাটিতেছে। বোবা চোখে ছেলেটির পানে তাকাইলাম। মনে পড়িল আমার ছেলেটির কথা। আজ পর্যন্ত যদি ছেলেটি বাঁচিয়া থাকিত তা' হইলে ঠিক অত বড় ডাগর হইত। অশ্রুতে দুইচোখ ঝাপসা হইয়া গেলো। সেই ঝাপসা চোখেই একসময় দেখিতে পাইলাম, ক্যাডিলাকখানা ছুটিয়া চলিয়াছে। কানে শুনিলাম, ক্যাডিলাকের সাথে ফিট্ করা রেডিও হইতে—'কাম এণ্ড এনজয় দি লাইফ' ইংরাজি গানের সুর জাগিতেছে।

আমার অলক্ষ্যেই একটি উষ্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

অনেক কোশেশ করিলাম, তবুও চাকুরি হইল না। শুভাকাঙ্ক্ষী ও প্রবীণ চাকুরেদের কথায় বুঝিলাম, যার মুরুব্বী নাই, তার চাকুরিও নাই। দুই-একজন বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াই ফেলিলেন: 'কোনো বড় অফিসারের বা মন্ত্রীর শালা সমুদ্ধি হবার চেষ্টা করুন, চাকরির জন্য ভাবতে হবে না।'

বিগত এক বছর ধরিয়া এই প্রহসনই দেখিয়া আসিতেছি। সুতরাং বিদ্রূপ করিয়া বলিলেও, কথাটা আমার মনে ধরিল। নূতন করিয়া ভাবনায় পড়িয়া গেলাম। চিন্তা করিলাম, কাহাকেও মামা, ফুফা, চাচা, খালু বা শালা-দুলাভাই বানানো যায় কিনা! মামা প্রায় সবাইকেই বানানো যায়; কিন্তু কেহ আমার আব্বার শালা হইতে রাজি হইবেন না। প্রস্তাব করিতে গেলে উলটা মার খাইয়া ফিরিতে হইবে। তাছাড়া আম্মা-আব্বাও তো বাঁচিয়া নাই। অতএব মামা বানানো সম্ভব নয়। বিবাহ আমি করিয়াছি। ঘরে তিলোত্তমা রসবতীও রহিয়াছে, এমন বউ রাখিয়া বিবাহ করিয়া কাহারো দুলাভাই হইতে ইচ্ছা হইল না। আর ইচ্ছা হইলেও কেহ কি—অতএব, উহা হইতেও বিরত রহিলাম। মনে মনে এই ভাবে কত সম্বন্ধই না পাতাইতে চাইলাম; কিন্তু কোনটাই আমার অনুকূলে আসিল না! বুঝিলাম, কেহ হয়তো বড়জোর আমার 'দুলাভাই' হইতে পারেন! চিন্তা করিয়া দেখিলাম আমার বোনই নাই। সুতরাং দুলাভাই বানাইব কি প্রকারে? চাকরি পাইতে হইলে দুলাভাই বনাইয়া শালা হইতে হইবে। অতএব, শালা হইবার অদম্য স্পৃহা আমাকে

পাইয়া বসিল। ভাবিলাম, রসবতীকে কিছুদিনের জন্ত বোন বানাইলে একেবারে মন্দ হইত না; কিন্তু রসবতী কি রাজি হইবে? না হইবেই বা কেন? সেতো আর আজীবন বোন হইয়া থাকিতেছে না আমার। সামান্ত কয়েকদিনের জন্ত মাত্র। তারপর—

আর চিন্তা করিতে পারিলাম না। রসবতীকে বোন বানাইয়া কোনও বড় অফিসার বা মন্ত্রীর কাছে কিছুদিনের জন্ত বিবাহ দিয়া শালা হইবার শেষ সিদ্ধান্ত করিয়া বাড়ির উদ্দেশে ছুটিলাম!

বাড়িতে আসিলাম। এক বছর পর্যন্ত বিদেশে থাকিয়া দীনবেশে আসিবার জন্তই হোক বা অভিমান করিয়াই হোক রসবতী কোন কথাই বলিল না। রসবতীর এই-দর্শনে রীতিমত বিস্মিত হইয়া গেলাম।। বাড়ির অন্যান্য বউরা যেমন তাদের স্বামীকে বাড়িতে আসিতে দেখিলে আহ্লাদে আটখানা হইয়া যায়, তাদের অষ্ট-অলঙ্কারের অকারণ রুনুঝুনু আওয়াজ স্বামীকে খুশি করার কাজে অতি ব্যস্ততার পরিচয় দেয়, আমার উপস্থিতিতে রসবতীর মধ্যে তেমন কিছুই দেখিতে পাইলাম না। শোবার ঘর হইতে এক সময়ে উঁকি মারিয়া দেখিলাম, রান্নাঘরের ঢেঁকিতে রসবতী বিমর্ষ হইয়া বসিয়া আছে। তার পরনের কাপড়খানা শতচ্ছিন্ন, দেহ অস্থিচর্ম সার, হাড়গুলি পরিষ্কার গনা যায়। বুঝিলাম, অভিমানে নয়, নিদারুণ ব্যথায় এবং আমার অক্ষমতার জন্তই রাগিয়া গিয়াছে। তাই হাসিয়া কথা বলা তো দূরের কথা—কুশল সংবাদও জানিতে আসিতেছে না। সারাটি দিন এই ভাবেই কাটিয়া গেল।

রাত। বিছানা নিলাম। চোখে ঘুম আসিল না। তবুও ঘুমের ভান করিয়া চোখ বুঁজিয়া পড়িয়া রহিলাম। ঘুমের মানুষ যেমন আশ-পাশ ফিরে আমিও বার দুই তাই করিলাম। এক সময় রসবতী শুইতে আসিল। আমি বোজা চোখেই মিটিমিটি চাহিলাম। দেখিলাম, সে এক দৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া কি যেন ভাবিতেছে। তার দুই চোখে শ্রাবণের অজস্র ধারা। রসবতী বিছানায় বসিল, আমাকে ঘুমন্ত মনে করিয়া বার-দুই শরীর ধরিয়া ডাকিতেই আড়মোড়া ভাঙিয়া চোখ মেলিলাম। রসবতী আমার একখানা হাত তার দুই হাতের মুঠায় চাপিয়া ধরিয়া ধরা গলায় বলিল: "তুমি আমাকে মাফ করে দাও।" বুঝিলাম, সারাদিনেও আমার কুশল সংবাদ না জানায় এবং এড়াইয়া চলার জন্ত সে অনুতপ্ত। বড্ড মায়া হইল। বলিলাম: "কি সব ছেলে-মানুষি করছো?" তার দুই চোখ মুছিয়া দিলাম।।

এ-কথা সে-কথার পর দুইজনই স্বাভাবিক হইয়া গেলাম। ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়া চাঁদের আলো ঢুকিয়া ঘরখানাকে হাস্যোজ্জ্বল করিয়া তুলিল। সেই চাঁদের আলোয় লক্ষ্য করিলাম, রসবতীর দেহে রসের বান ডাকিয়াছে। তার কঙ্কালসার দেহে কোথা হইতে এই বান আসিল ভাবিয়া পাইলাম না। বান আসিলই যখন, তখন আশ্বস্ত হইলাম। কারণ, রসের বান ডাকিলে রসবতী সব দুঃখ-বেদনার কথা ভুলিয়া যায়। যা' বলি, হাসিয়া হাসিয়া তা-ই করে। সুতরাং মনে মনে ভাবিলাম, এইতো সুযোগ। কথার ভিতর—'ওগো আমি যে তোমার' ভাব ফুটাইয়া যে উদ্দেশ্যে দেশে আসা, উহা বিবৃত করিলাম।

আমার প্রস্তাব শুনিয়া রসবতী প্রথমত হাসিয়া ফেলিল। বুঝিলাম, সে সম্মত আছে। বড্ড খুশি হইলাম। খুশির আবেগ থামাইতে না পারিয়া বলিলাম: 'তা হলে কাল ৯টার ট্রেনেই, কি বলো?'

—'৯টার ট্রেনে!'

—'হ্যাঁ, ৯টার ট্রেনে।'

রসবতী কথাটি বিশ্বাস করিতে পারিল না। সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া বলিল: 'তুমি সত্য বলছো?'

—'কেন, অবিশ্বাস হচ্ছে!'

ওর কথার ধরন দেখিয়া আমিও বিস্মিত হইয়া গেলাম।

এতক্ষণ ইহাকে একটা নিছক হাসি-মস্‌কারার ব্যাপার বলিয়াই মনে করিয়াছিল রসবতী। যখন সে বুঝিতে পারিল যে, না, ইহা নিছক হাসি-মস্‌কারার নয়, তখন তার বান ডাকা দেহ-নদীতে হঠাৎ ভাটা পড়িয়া গেলো। এক ঝটকায় আমাকে ঠেলা দিয়া পাশ ফিরিল এবং ফোঁপাইতে লাগিল। আমি হতবাক।

অতি প্রত্যুষেই ঘুম ভাঙিয়া গেলো। দেখিলাম, রসবতী বিছানায় নাই। ভাবিলাম, আমার পূর্বেই ওর ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে, বাহিরে হয়তো হাত-মুখ ধুইতে গিয়াছে, এক্ষুনি ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু না, তাকে আর আসিতে দেখা গেলো না। গোয়াল ঘর হইতে গাভীটি হাম্বা রবে ডাকিয়া উঠিল। রাত্রির কথা মনে করিয়া কেমন যেন সন্দেহ হইল। তাড়াতাড়ি এ-দিক সে-দিক খুঁজিয়া গোয়াল ঘরের দিকে ছুটিলাম। সেখানে গিয়া যা দেখিলাম, তাতে আমার চক্ষুস্থির! দেখিলাম, গরু বাঁধার একগাছি দড়ি গলায় বাঁধিয়া রসবতী গোয়াল ঘরের 'ভুতুরের' সাথে ঝুলিতেছে। তার মুখের

দিকে তাকাইলাম, দেখিলাম, জিহ্বাটা অস্বাভাবিক রকম বাহির হইয়া আসিয়াছে। মনে হইল, সে যেন আমাকে ব্যঙ্গ করিতেছে।

আমি সেখানেই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম। রসবতী মরিয়াছে, তার জন্য আমার এতটুক দুঃখও নাই। সে কিছু দিনের জন্য বোন হইয়া আমাকে শালা বানাইয়া গেলো না বলিয়া হৃদয়-মন আমার দগ্ধ হইতে লাগিল॥

অন্ধকার

ওয়াজেদ মজনু

মৌলভী সাব নসিয়ত করলেন: "হবে না আল্লার গজব। সারা দুনিয়া ভরে গেছে পাপে। আল্লার আরশ কুর্শি পাহারাদার, আজ্ঞাবাহক, নূরের পয়দা ফেরেস্তার চেয়েও পিয়ারা ইনসান সব হয়ে গেছে বেইমান।" তারপর তিনি বয়ান করলেন, যুগে যুগে ধর্মের সোপান বিচ্যুত মানুষ কতো কষ্ট পেলো আল্লার কহরে পড়ে। নুহ নবীর আমলের প্লাবন কাহিনী বর্ণনা করলেন তিনি মর্মান্তিক ভাষায়। সভাশুদ্ধ শ্রোতারা নীচু মাথা আরো নীচু করে 'সোবহান আল্লা,' 'সোবহান আল্লা' বলে সমস্বরে রব তুললো ভীতকণ্ঠে।

মৌলভী সাব জানালো: কিয়ামত নজদীগ; হুঁসিয়ার মিয়ারা। বাকী বেড়ার আড়ালে বসে নায়েবে রছুল গ্রামের মৌলভী আফাজউদ্দিন সাহেবের ওয়াজ শুনে অন্তর-মন বিগলিত হলো রূপজানের।

বাপমা মরা আনছুর বৌ রূপজান। চার বছর আগে শ্রীঘর হাটে গরুর ব্যবসা করতে গিয়ে ওখানকার নাম করা পাইকার-বাড়ি থেকে বিয়ে করে এনেছে আনছু রূপজানকে। আনছুর মতো-ই বাপ-মা হারা অনাথা মেয়ে রূপজান। নামকরা পাইকার শহর আলীর ভাইঝি। সুন্দর আঁট-সাঁট ফরসা দেহের গঠন। শুধু রূপের মোহই রূপজানের সহিত আনছুর বৈবাহিক সম্বন্ধের কারণ নয়। আনছুর ভরসা ছিলো চাচা-শ্বশুর তার ওস্তাদ পাইকার, তার উপর ওই এলাকায় পথে-হাটে তার দোহাইও চলে মন্দ নয়। বেশ শক্তিশালী চাচা-শ্বশুর তার শহর আলী। আদর এবং ইচ্ছে করেই তার হাতে রূপজানকে তুলে দিয়েছিলো। বিয়ের পর প্রাণ ঢেলে ভালবাসে আনছু রূপজানকে। তাই রূপজান যা আবদার করে তাই মেনে নিতে রাজি হয় আনছু। মৌলভী সাবের উক্তি মতে অদূরে ভয়াল কিয়ামতের চিন্তায় থর থর করে কাঁপতে থাকে রূপজানের মন। ভীত মনে ভাবে রূপজান, কখনো সে কাজের বাহানা করে নামাজ কাজা করবে না। আনছুকেও রীতিমতো নামাজ পড়াবে তাগাদা করে।

রূপজানের তাগিদে বে-নামাজী স্বামী আনছুর মনের মোড় ঘুরলো। রীতিমতো দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে শুরু করলো আনছু। ছোট-

বেলা পাড়ার ক্বারী সাবের কাছে সকালে হোগলার চাটাইয়ে বসে কোরাণ-তেলাওয়াতের রেওয়াজটা ফিরিয়ে আনলো। এতদিন ধরে না পড়ায় পরিচিত হরফগুলোর অনেককেই তার চোখে যেনো কেমন নতুন মনে হয়। কল্পনায় ফিরিয়ে আনে আনছু সেই শৈশবের প্রাতঃকাল। আস্তে আস্তে পরিচয় পায় এঁদের স্মৃতির ফলকে। কষ্ট হয় না আর পড়তে আনছুর। শুনতে সাধ জাগে রূপজানের। পড়তে জানে না রূপজান। হাসরের ময়দানের চিন্তায় অবশ্য মনে সে ভাবে কোরাণ-তেলাওয়াত সে শিখবেই।

আনছু শিখালেই সে পারবে শিখতে। পড়া শেষ করে রূপজানের মুখের দিকে চেয়ে আনছু হাসে। জিজ্ঞাসা করে: "ভাল লাগে?" কাপড়ের বাড়তি আঁচলটাকে টেনে তার আড়ালে মুখ লুকোয় রূপজান। নাকের নোলকটাও ঢাকা পড়ে যায়। বড় বড় কালো চোখ দুটোতে ফুটে ওঠে তার সরমের জ্যান্ত ছবি। বুঝতে পারে আনছু। কাছে বসিয়ে আদর করে। কোরাণ শরীফখানা বন্ধ করে হাত বুলায় রূপজানের মাথায়। বলে: "তুমি পড়তে জান না তাই এত দুঃখ করো? জানো মৌলভী সাবের কাছে শুনছি খসমের ছওয়াবের অর্ধেক ভাগ পায়; আর ইস্ত্রির বেলায়ও খসম অর্ধেক ভাগ পায়। তার উপর আবার যদি কেউ কোরাণ পড়ার সময় মন দিয়া শুনে তো কোরাণ শরীফ পড়ইয়ার মতোই ছওয়াব পায় সে। তুমিতো এমিই আমার অর্ধেক পাইবা। তার উপর শুইন্না শুইন্নাও আবার ছওয়াব লইতেছো।" আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে রূপজানের মুখ। : "হেছা কথা? মৌলভীসাব কইছে? কবে, কোথায়?" : "হেইদিন কইছে না বুইল্যা; কতো বড় বড় মফিলে শুনলাম কতো কতো আলীমদের মুখে। না শুইন্যা কি কেউ আল্লা-তাল্লার এই গায়বী ব্যাপারে মিছা কয়? বিশ্বাস না করো তো আরেক দিন মৌলভীসাব আইলেই জিজ্ঞামু শুইননো তো।" বিশ্বাসে উৎফুল্ল হয় রূপজান।

সারা রাত মুসলধারে বৃষ্টি পড়লো তাদের বারো হাত ঘরের টিনের চালে ঝনঝন আওয়াজ করে। অল্প শীতের আমেজে একটিমাত্র কাঁথাকে টানাটানি করে ঘুমোল ওরা দু'জন। অঘোরে ঘুম। ভোরে বৃষ্টির বেগ কিছু কমতেই ভেজা ডালে কাকের ডাক শুনে ঘুম ভাঙলো আনছুর। সুপ্তোত্থিত বাসি চোখ রগড়াতে রগড়াতে মৃদু একটা ধাক্কা দিলো রূপজানকে। টের পেয়েও অঘোরে ঘুমের ভান করলো রূপজান। এক দৃষ্টে চেয়ে রয় ঘুমন্ত রূপজানের মুখের দিকে আনছু। মনে তার বিয়ের পর ফেলে আসা দিনগুলোর প্রচ্ছন্ন ছবি শতদলের ন্যায় ভেসে উঠতে লাগলো।

হাত পা ধুয়ে নিঃশব্দে তাড়াতাড়ি নামাজটা আদায় করে নেয় আনছু। অন্যদিনের মতো তার কোরাণ পড়ার সুর না শুনতে পেয়ে মাথা তুলে চায় রূপজান, কই নামাজের চাটাইটা ঝুলছে বেড়ায়। উঠে পড়ে রূপজান। আনছু হয়তো তার সঙ্গে রাগ করেছে। তাই আজ আর ডাকেনি তারে নামাজ পড়তে। রূপজান ঠিক করলো আনছু ফিরে আসবার আগেই সে নামাজ শেষ করবে, আর হাত ধরে তার কাছ থেকে মাফ লইবে। ওয়াদা করবে কখনো সে অন্যায় করবে না আর।

নামাজ শেষ করে ছোট চাটাইয়ের বিছানাটায় বসে নীরবে ভাবতে থাকে রূপজান। বেচারা আনছু তার স্বামী : একমাত্র সংসারের ভরসা। সীমাহীন রৌদ্রে তপ্ত মরু-বিয়াবানে একমাত্র ছায়াপ্রদ স্নেহ করুণায় পল্লবিত মহীরুহ। বিয়ের পর থেকে দেখে আসছে রূপজান বেচারা আনছুর কতোই না খাটতে হয়, অল্প পরিসর পরিবারটিকে রক্ষা করতে।

পিছনে আনছুর পায়ের শব্দে চমক ভাঙলো রূপজানের। শঙ্কিত ভীতা শশকিনীর মতো ফিরে চায়। বিমর্ষ মুখ আনছুর উঠে কাছে যেতেই একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়লো আনছু। বুঝতে পারে না কিছুই রূপজান। বিমূঢ় বিস্ময়ে কেবল চেয়েই রইলো। তবুও নির্বিকার আনছু। সারাটা বছরের পরিশ্রমের আশা ভরসা তার মাত্র কতকতারা ধানের এক বিঘে ক্ষেতটা। কি সুন্দরই না হয়েছিলো একেকটা ধানের গাছ! পাকতে মাসেক লাগবে। সবে মাত্র শিষ ছেড়েছে। সারা রাত্রের অঝোর বৃষ্টিতে মাঠের যেখানে ছিলো হাঁটু পানি, সেখানে কোমর ছেড়ে উপরে উঠছে। ভাবতেও অবাক লাগে একরাত্রের বৃষ্টিতেই···। চরম নিরাশায় ভরে উঠে আনছুর মনটা। আষাঢ় মাসের আউশ ধানের জমিটা তার কতো উঁচুতে—একেবারে গাঁয়ের সমতলে। দুঃখে গুম হয়ে রয় আনছু। নিরুপায়ের প্রকট মূর্তিটা জীবন্ত হয়ে উঠে তার ঝাপ্‌সা দৃষ্টির সম্মুখে।

বারটা মাসই চা'ল তাদের খেতে হয় কিনে কিনে। আকাশ ভেঙে পড়ে রূপজানের মাথায়। রূপজান তার গলার কবজ ছড়াটা এবং কানের মাকড়ী জোড়াটা সেধেই দিয়েছিলো আনছুকে বিক্রি করে টাকা দিয়ে জমি রাখতে তকী। বিয়ের সময় রূপজানের চাচা শহর আলী মিয়া এই গহনাগুলি দিয়েছিলো অনাথা ভাইঝিকে ভবিষ্যতের সম্বল করে দিতে। চাচার অজ্ঞাতেই স্বামীর সংসার বাড়াতে বেচে ফেললো সেই গহনা কটি। গহনা বিক্রির টাকায় নেওয়া ক্ষেতের ধান আজ পানিতে লুকালো। রূপজান তার গহনা-

গুলোকে যেনো নিজ হাতে পানিতে ফেলে দেওয়ার মতই অপকর্ম মনে করলো।

চিন্তায় অসাড় হয়ে পড়ে রূপজান। অথৈ যৌবনের টুলটুল মুখ তার শুকিয়ে যায় মুহূর্তে। রূপজানের ব্যথা ভারাক্রান্ত চেহারাটার দিকে চেয়ে রইলো আনছু। রূপজান আনছুর নির্নিমেষ দৃষ্টির ঘায়ে সজাগ হয়ে পড়ে। টের পায় আনছু রূপজানের বিমর্ষতার কারণটা, শ্বাসটা আরো লম্বা করে বলতে থাকে: "দেশের দুর্দিন বুঝি আর যাইবো না। এম্নি বিপদের উপর বিপদ আইলে আর টিকন যায় কতো?"

একটা চড়া গলার শব্দ শুনে আনছু। কি কথা কে কার সঙ্গে আলাপ করছে শুনবার তার ইচ্ছা হলো প্রবল। উঠে বাইরের দিকে যেতেই রূপজান ডাকলো: "তামুক খাইল না।"

: "তুমি জ্বালাও। আইতাছি এক্ষুনি। হেরা আবার কিএর কথা কইতাছে। শুইন্না আই"—বলে একটু এগিয়ে দেখলো আনছু তার তালাতো ভাই উত্তর পাড়ার করিম এদিকে আইছে। করিম আর আনছু সমান বয়সী। কয় বৎসর যাবৎই দুইজনের একত্রে বেশ মেলা-মেশার ভিতর দিয়ে গরুর ব্যবসা করছে। রূপজানকে আনছুর সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাবটা পয়লা করেছিলো এই করিমই। আনছু থেমে যায়। করিম ডেকে উঠে আনছুর দিকে চেয়ে: 'হুনছো ভাই! দুনিয়াডা যে শেষ অইয়া গেছে। আর বেশি দিন নাই বুঝি।"

রূপজান এখনো দরজায় সাজানো কলিকায় তামাকের উপর জলন্ত টিকাটায় ফুঁ দিতেছিলো। করিমের কথা শুনে পিছিয়ে আসার পথে ধরে বলে আনছু: "আরে কও না কি অইছে?"

: "কওন লাগবো কেরে? তুমি বুঝনা রাতারাতির মেঘের পানিতে দেশটা কি অইয়া গেছে?"—বলতে বলতে আসে করিম। সুর ধরে জওয়াব দেয় আনছু: "অ।"

করিম আবার বলতে থাকে: "শুনলাম কৈবর্তরা মেঘনা থেকে জাল বাইয়া ফিরা যাইতে কইয়া গেছে মেঘনাতে নাকি পানির অবস্থা খুবই খারাপ। আগের চাইতে দুই হাত উঁচা অইয়া পানির স্রুত যাইতেছে। উজানে আর নাও ধরা যাইতেছে না। দেখলে ভয় লাগে। পাহাড়ে নাকি বন্যা অইয়া পাহাড় পর্যন্ত ডুবাইয়া ফেলাইছে। হেই পানির ঠেলা পড়লে তো আর আমরা থাকতে পর্যন্ত পারমু না। ভাইসা যাব না হয়—ডুইব্যা মরমু।" ভয়ে মনটা কাঁপতে থাকে রূপজানের।

করিম আর আনছু কলিকায় সাজানো তামাকটাকে ছাইয়ে রূপান্তরিত করে পালাক্রমে নারিকেলের খোলে তৈরী হোক্‌কাটায় একরোখা চুমু দিতে দিতে রূপজানকে ডাক দিয়ে করিম বলে ওঠে: "শুনো ভাবী, এইতো আল্লাতালার কিরামত; এর জন্য দুঃখ কইরা কোন ফল অইত না। আল্লা যা করেন ভালোর জন্যেই।" রূপজানের দুঃখের উৎসটা করিমের ভালো করেই জানা আছে। আল্লার দোহাই দেওয়াতেই সাময়িক ভাবে আশ্বস্ত হয় রূপজান। আনছুর ইঙ্গিতেই নতুন তামাক দিতে হোক্‌কাটা নিয়ে যায় রূপজান।

চার দিন আগে ধান ক্ষেতে পানি উঠে সমস্ত ধান তলিয়ে নিলো। এই নিয়ে দুঃখ করছিলো আনছু আর রূপজান মিলে। আজ ঘরে পর্যন্ত শোবার বিছানা পাতবার জন্যে একটু জায়গাও শুকনো নেই। "এই দেশটাতো এদের একার নয়। দেশজোড়া আল্লার এই গজব নাজেল হয়েছে। ওঃ কি যে হবে! কোথায় যাবে এতো মানুষ! সকলেরই মনে একই প্রশ্ন। সারাটা দুনিয়া যেন পানির রাজ্য হয়ে গেছে। সীমাহীন মাঠ জুড়ে পানি, কেবল স্রোত—আর ঢেউ। বেসুমার কলেবরে উত্তরোত্তর ফুলেই চলছে পানি। দুপুরের ঠিক আগেই ঘরটায় চার ইঞ্চি পানি হয়ে গেছে। দেশ শুদ্ধ লোকের সকরুণ হাহাকার স্রোতের স্বরকে আরো তীক্ষ্ণ করে তুলছে। ভয়ে রূপজান আর আনছু দু'জনেরই বুক দুরু দুরু করছে।

পাশের বাড়িতে আসবাব পত্রের নাড়াচাড়ার আওয়াজ শুনে পরনের লুঙ্গিটা গুছিয়ে পুরা এক হাঁটু উঠানের পানি ঠেলে আস্তে আস্তে অতি সাবধানে পা টিপে চলে যায় ওদিকে আনছু। ঘরে থেকে বেড়ার ফাঁকে শুদ্ধ নীল আসমানের খণ্ড বিখণ্ড এলোমেলো মেঘের দিকে চেয়ে রয় রূপজান। বড় অদ্ভুত লাগে তার কাছে আজকের এই দুনিয়ার বিচিত্র পরিবেশটা। বিস্ময় দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো রূপজান।

বাইর থেকে আনছুর ডাকে ধ্যানের খেই হারায় রূপজান। : "আরে হুনছনি, হেই বাড়ির তারা কি করতাছে? এরা নাকি হুইন্যা আইছে পর্তিকার খবর, দেশে নাকি আরো পানি অইব। এর লাইগা পোলাপান মাইয়ালোক সব পাঠাইয়া দিতাছে ছোট মিয়ার হউর বাড়িতে।"

রূপজান দুর্বল রোগিণীর মতো পা টিপে টিপে এগিয়ে আসে দরজায়। মুখটা তার বিবর্ণ, মলিন, চিন্তাক্লিষ্ট। : "সারাদেশ পানির তলে পইড়া গেছে আর এরা ঐ গেরামে গেলেই কি অইবো?" ধরা গলায় জওয়াব

দেয় রূপজান। : "আরে তুমি জানো না হেই কও। ছোট মিঞার হউক বাড়ি বাড়াইল গেরাম কত উঁচা দেশ। এক একটা ঘরের ভিটা কতো খাড়া। আবার কিনা একটা দালানও আছে দুইতালা।" বলে আনছু। আশ্বস্ত হলো শুনে রূপজান। তাহলে দুনিয়ায় এখনো শুকনো জায়গা আছে। রূপজানের বিবর্ণ মুখটা একটু ফরসা হতে দেখে আনছুর মুখে একটা স্বস্তির আভা নামলো।

উঠানের কোণে আধমরা শিমের লতায় ভরা মাচায় আশ্রিত মোরগগুলি হঠাৎ একসাথে 'সোরগোল' করে উঠে মাচাটাকে ভেঙে ফেলার উপক্রম করলো। আনছু এবং রূপজান সেই দিকে চোখ দেয় একসাথে। মর্দা মোরগটা অল্প পরিসর জায়গায় মুরগীটাকে তাড়া করেছে। আত্মরক্ষার চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত মুরগীটা···। লজ্জা পায় রূপজান। প্রসন্ন মুখে এগিয়ে আসে আনছু। স্বামীর মনের গোপন গহন থেকে উঁকি দেওয়া বাসনার প্রতিচ্ছবিটা প্রচ্ছন্ন হয়ে ওঠে রূপজানের মনে। আনছুর কামনাময় ইঙ্গিতের জওয়াবে রূপজান জানায় তার অক্ষমতা। ঘরের মেঝে ভরা পানিতে চোখ পড়তেই কামনা উত্তপ্ত আনছু হয়ে যায় শান্ত; বরফে রূপান্তরিত পানির মত। চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে যায় আবার আনছুর মনটা। মাচা একটা তৈরী করতেই হবে। নইলে ঘরে আর থাকা যাবে না যে।

দুই হাত উঁচু মাচার উপর একপাশে শোবার বিছানা করেছে ওরা দুইজনে। একপাশে চুলোটা রেখে তাতে কোনমতে রান্নার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। দিনগুলো কোন রকমে আলাপ-আলোচনায় কাটায় দু'জনে ওরা। পাশের বাড়ির মেয়েলোকেরা সব চলে গেছে। আছে ওই বাড়িতে জনকয় পুরুষ। বার্ষিক মুনিষ তারা, বাড়ি পাহারা দেয়। শক্ত মোটা গজারী গাছের তৈরী উঁচু মাচার উপর রক্ষিত গরু বাছুর দেখে। সন্ধ্যা না হতেই ঘরের মেঝে ভরা পানিতে দাঁড়ানো চৌকির উপর শুয়ে ঘুম যায়।

রাত্রিটা এলেই কেমন যেনো মনে হতে থাকে রূপজানের। হালকা বাঁশের খুঁটি দেওয়া মাচায় শোয় ওরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনে। পানিতে কোন কিছুর শব্দ হলেই শংকিত হয়ে ওঠে ওরা ভীরু শশকের মতো। বুঝি সাপ—। পানিতে বাতির আলো দেখলেই নাকি সাপ আসে, দু'মুখো সাপের নাকি এটা স্বভাব। তাই সন্ধ্যা না হতেই বাতি নিভিয়ে অন্ধকার ঘরে মাচার উপরে শুয়ে আলাপ করে আনছু আর রূপজান। আরো যদি পানি বেড়ে ওঠে, মাচাটা তল করে দেয়, ওদের গন্তব্য হবে কোথায়? ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে ওঠে রূপজান। আরো

পানি! ভীত আলাপের প্রসংগটা চলতে থাকে মশার উপদ্রবের সাথে পাল্লা দিয়েই। আনছুর নিশ্বাসগুলি দীর্ঘ শোনা যাচ্ছে। বুঝতে পারে রূপজান আনছু ঘুমাচ্ছে।

চোখে ঘুম আসে না রূপজানের। কতো চিন্তা এসে ভিড় জমায় তার মনে। সত্যিই তো পানি আরো বাড়লে কি করবে। ওরা নিঃসহায় মানুষ। চালে বৃষ্টির আওয়াজ শুনে চোখ মেলে রূপজান। অন্ধকারটা গাঢ় হয়ে সমস্ত কিছুকে যেনো কোথায় নিশিহ্ন করেছে। বাঁশের ক্ষুদ্র চাকায় ঘেরা নেকড়া-কাপড়ে তৈরী মশা তাড়ানোর এবং ঠাণ্ডা পাওয়ার উদ্দেশ্যে ঘুরানো পাখাটা একপাশে রেখে আনছুকে জড়িয়ে ঘুমবার চেষ্টা করে রূপজান। আনছু তখনো ঘুমুচ্ছে। অঘোরে ঘুম! দিনের পরিশ্রান্ত দেহ তার ঘুমের আমেজে অবশ। সারাটা দিন পরিশ্রম করেছে আনছু। পানি ঠেলে ঠেলে ও পাড়ার করিমদের বাড়ি থেকে চারটা মোটা কলাগাছ এনে কি খাটুনিটাই না খেটেছে বেচারা ভেলাটা তৈরী করতে। দিনে ভেলা তৈরী করবার সময় আনছু ভরসা দিয়েছে রূপজানকে; পানি যদি এদের মাচাতক উঠে যায় তো নৌকার বদলে এই ভেলাই হবে এদের আশ্রয়। রূপজানও জওয়াব দিয়েছিলো পানিতে পাওয়া গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র যেখানে শুকনো মাটি আছে সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিতে অন্যদের মতো। আনছু শুনালো রূপজানকে ওদের পাশের গ্রামের কারা-না-কি পানি-ওঠা বাড়ি ফেলে দূরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলো। বাড়ি শুদ্ধ নির্জনতার সুযোগ নিয়ে চোরেরা রাত্রির অন্ধকারে ঘরের চালের টিনগুলি খুলে নিয়ে গেছে। চোরদের হীন মনোবৃত্তির কথাটা মনে হতেই রূপজানের ঘুমের কস্‌রতটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। ভাবতে থাকে রূপজান। এমন দুর্দিনে তবুও চোরেরা এ জঘন্য কাম করলো? এদের প্রাণ নেই। চোর ডাকাতরা সব—হাসরের মাঠে আল্লা এদেরকে কি-যে সাজা দেবেন ভাবতে গা কাঁটা দিয়ে ওঠে রূপজানের।

ঘরের কোণে পানিতে কিসের শব্দ শুনে ঘুমন্ত স্বামীকে জড়িয়ে আরো চেপে ধরে রূপজান। টের পায় আনছু। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে মাচায়। কাঁপতে থাকে। ব্যস্ততার সুরে প্রশ্ন করে: "কি অইছে অ্যাঁ—অ্যাঁ?" ভীতিপূর্ণ কণ্ঠে জানায় রূপজান,: "ঘরের কোনায় বেড়াটায় কিডা জানি পানিতে আওয়াজ করে।" : "অ্যাঁ-কও কি? তাইলে তো হাপ নিচ্চয়ই। বাতিটা জাইল্লা কুপিটায় আগুন দাও দেখি!"

রূপজান দেশলাইয়ের কাঠি খুঁচিয়ে আগুন জ্বালাতেই অন্ধকার ঘর হেসে উঠলো আলোতে। মাচার একপাশে রাখা লাঠিটা হাতে নিয়ে আনছু তাকায়

ঘরের সন্দিগ্ধ কোণটার দিকে। কুপিতে আগুন দিতেই শলতের মুখের জমা কালির গুটিগুলো ফট্‌কট্‌ করে ছিটতে থাকে। থতমত খেয়ে যায় আনছু। কি জানি ওদিক থেকেই বুঝি……। মচ্‌মচ্‌ করে মাচাটা কাঁপতে থাকে আনছুর শরীরের কাঁপুনির তাল সামলাতে না পেরে। দেখতে পেলো আনছু বাঁশের খুঁটিটাকে আশ্রয় করে কি যেনো একটা রঙিন ডোরাকাটা—ঠিক মেঘ-ডম্বুর সাপটার মতোই দেখা যাচ্ছে। লাঠিটা সেদিকে বাড়িয়ে আনছু ইশারা করে: "কৈ।" খপ্‌ করে একটা লাফ দিয়েই মস্তবড় কোলা বেঙটা এসে পড়ে মাচায়। চিৎকার করে উঠে একসাথে আনছু আর রূপজান দু'জনেই। আর একটা লাফ দিয়েই সরে পড়ে বেঙটা দূরে পানিতে ডুবে যায়। তাদের আর্তনাদে ঝাঁপ বেড়ার ওপাশে মাটির খোপরীর উপর বসা মোরগগুলিতে সাড়া পড়ে যায়। কক্‌ কক্‌ করে ডেকে উঠে মোরগগুলি সব এক সাথে। বুঝলো আনছু ওটা সাপও নয়—গুইও নয়—দুষ্ট কোলা বেঙটা। হাসতে হাসতে রূপজানের হাতে ধরে প্রবোধ দেয়: "আরে ডরাইও না, হুনো এইডা বেঙটা এ্যানা।" আধা মূর্ছিত রূপজান মুখ তুলে; : "হ্যাঁ-হ্যাঁ বেঙ?" "আরে দেখ না হালারটা কৈত্তেনে আইয়া এই ডরটা না—লাগাইয়া গেলো। তোমারেই আর কি কমু, আমি পর্যন্ত ডরাইয়া গেছলাম গ্যা! যাক একটা টিক্কা দেও তামুক খামু।"

মাচার কোণে নারিকেলের মালাটাতে তামাক এবং টিকা রেখেছে। রূপজান হাত বাড়াতে টের পেলো পানি মাচা অবধি উঠতে মাত্র অল্প একটু বাকি। : "পানি কইতক উঠছে দেখছো নি?" বলে রূপজান। আনছু মুখটা ঘুইয়ে নীচের দিকে চেয়ে বলে: "অ—দেখছিতো, আর মাচায়ও টিকোন যাইব না। রাইতটার মধ্যে এমন কাণ্ডডা অইয়া গেছে। বিয়ানও তো অইতে দিব না দেখছি। খোদার আলামত বুঝবার ক্ষেমতা কেউরই নাই। জানি না পানিতে ডুইব্যাই মরতে অয় নাকি? কিয়ামুত ঐ অইয়া যাইবো। গজব অইছে। গজব ছাড়া আর কি কও?" কেয়ামতের নামে রূপজান কাঠ হয়ে যায়। প্রাণহীন একটা মূর্তির মতো মাচার উপরটায় বসে রইলো। মাথা গুঁজে একটানা দম দিয়েই চলছে হোক্‌কায় আনছু। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির ফোঁটা পড়াটাও থেমে গেছে। চারিদিক নিবিড় নিস্তব্ধ। মাঝে মাছে আনছুর হোক্‌কা টানার নেশায়িত কাশির আওয়াজ এই সুপ্তিহীনতাকে দ্বিখণ্ডিত করছে। আকাশে একটি তারাও নেই। যুক্তি করেই যেন ওরা লুকিয়েছে এক সাথে।

হঠাৎ নিস্তব্ধ আকাশে মেঘের গুরু গর্জনের সাথে কড়া একটা বিদ্যুতের ঝিলিক নিবিড় প্রকৃতিকে একবার ঝলসিয়ে গেলো। দক্ষিণ দিকে কিসের যেনো আওয়াজ, শব্দটা খুবই পাশবিক মনে হতে লাগলো। বাতাসের সোঁ-সোঁ রবটা যেনো কোটি কোটি নাগিনীর তপ্তশ্বাস বয়ে আনছে। লোকজনের মর্মান্তিক চিৎকার শুনা যাচ্ছে। মেঘনায় ভাঙনের আগে তারা যে গ্রামের বসতি ছিলো সেই উলুকান্দি গ্রামের লোকদের কান্নার আওয়াজ। পরনের কাপড়টা গুছিয়ে নেমে পড়ে পানিতে আনছু। বাঁশের খুঁটির সাথে বাঁধা বাইরে কলাগাছের তৈরী ভেলাটায় যেতে যেতে ডাকলো আনছু রূপজানকে, "আইও তাড়াতাড়ি; এখন ঘরে থাকুন যাইবো না। থাক মাচায় সব কিছু। যেই তুফান আইতাছে ঘর পইড়্যা যাইবারও ডর আছে। থাকতো না আজকা আর কিছু। পরনের কাপড় ভিজিয়ে রূপজান গিয়ে উঠলো ভেলাটাতে স্বামী আনছুর পাশে। ভয়ে কম্পিত কণ্ঠে কতো দোয়া দরুদই না পড়তে চাইলো রূপজান। আনছু শুরু করলো দোয়ায়ে ইউনুছ পড়তে। দোয়াটা নাকি বিপদের একমাত্র কবচ। ইউনুছ নবী (দঃ) মাছের উদর হতে রক্ষা পেয়েছিলেন এই দোয়া একনিষ্ঠ মনে পড়ে।

ছ্যাঁত ছ্যাঁত করে বৃষ্টি এবং বাতাস শুরু হলো। আনছু ভেলাটা ঠেকিয়ে বাঁধলো উঠানের কোণে প্রায় গলা পানিতে দাঁড়ানো নারিকেলের গাছটাতে। অসহ্য বৃষ্টির কড়া ছাঁট পর্যন্ত সহ্য করলো তারা সকাল অবধি বৃষ্টি না ছাড়াতে।

ঘরের মাচার উপরে পানি উঠেছে। এক হাত পানি। কলাগাছ দিয়ে বানানো ভেলায় চাটাইয়ে ছৈ বেঁধে আনছু আর রূপজান। পানি কিছু কমবে। আনছু বুঝায় রূপজানকে : "বন্যার পানি এই রকমই! বেশিদিন থাকব না। হুনছি সিলেটের লোকেরা কইছে তা'গোর দেশে নাকি একদিনেই বন্যা আইয়া পানি আবার একদিনে হুকাইয়া যায়। আমাগোর এইখানে তো তবু বেশি দিন রইলো। যাইবো গা—আর কতদিন? আল্লায় কি মারবো আমাগরে?" ভরসা পায় রূপজান। চোখে তার ভেসে উঠে আবার শুকনো ঘরে বাস করার একটা জীবনের জলন্ত ছবি নতুন রূপ নিয়ে। ভুলবে না সে এই দুঃখময় দিনের কথাগুলি।

ঘন ঘন কাশে রূপজান। গলার আওয়াজও তার যেন কেমন হয়ে গেছে। গায়ে তার জ্বর উঠেছে। ভীষণ জ্বর। চুপ করে পড়ে রয়। কেবল ভাবে মনে মনে সে ঘরের পানি শুকাবে কবে? এতো কষ্টে পড়ে থাকতে তার আর সয় না। তবুও মুখ খুলে বলে না সে। আনছু দুঃখ পাবে মনে।

ঔষধের চেষ্টা করতে চাইবে। গায়ে হাত দিয়ে আঁতকে উঠে আনছু: "এতো জ্বর?" রূপজান মামুলী গলায় বলে উঠে: "সর্দি অইছে। কয় রাত ভিজাতে ইমুন সর্দি অইছে।" মাথাটা তার ধুইয়ে দেয় আনছু। জিজ্ঞাসা করে, কপাল ব্যথা করে কি-না। হাতে ইশারা করে জানায় রূপজান: "না"।

সন্ধ্যার শুরুতেই নামতে থাকে কাকের পাখার মতো কালো অন্ধকার। রূপজান কথা কয় না। প্রশ্ন করলেও ঠাহর করতে পারে না। দুঃখে বেহুঁশ হয়ে যেতে চায় আনছু। 'না, নিয়ে যাক চোরে ঘরের চলের টিন খুলে, থাকুম না আর এই নির্জন বাড়িতে। এই ঘরের মায়া করেই আজ রূপজানের এই···।' খেদ করতে থাকে আনছু।

নিউমোনিয়া হয়েছে রূপজানের, বুঝতে পারে আনছু। খোদাকে ডাকতে থাকে, রাতটা পার হয়ে গেলেই নিয়ে যাবে সে রূপজানকে ভেলাটায় করে ছলিমগঞ্জের বাজারে সরকারী ডাক্তারখানাতে। কোন কথাই বলে না রূপজান। সোজা হয়ে পড়ে আছে। মনে ভয় পায় আনছু। ঘরের আড়ালে ভেলাটা নিয়ে কুপিতে আগুন দিয়ে রূপজানের মুখের কাছে মুখ নিতেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায় আনছু। রূপজানের শরীরটা হিম শীতল হয়ে গেছে। হয়তো অল্পক্ষণ পরেই···।

কাঁথার ভাঁজের নীচে রূপজানের শিয়রে ছিল দেশলাইটা। অনেক খোঁচা-খোঁচির পর আগুন দিলো কুপিতে আনছু। ওহ্: হতভাগিনী অন্ধকারের সুযোগে··। বজ্রাঘাত হলো আনছুর মাথায়। কাঁদতে থাকে সে নিরুপায়ের মতো। বুক ফাটা কান্নার মর্মান্তিকতায় প্রাণ তার বের হয়ে যেতে চায়।

নিঃসহায় কর্তব্যজ্ঞানহীন আনছু ভেবে কোন পথ পায় না। কেয়ামতের ভয় করতো রূপজান। আজকেতো কেয়ামত। এ কেয়ামত কেন দেখে না রূপজান। এর চেয়েও জটিল কেয়ামত কি আবার হবে? বিশ্বাসটা নষ্ট হতে চায় তার। মৃত রূপজানের মুখটা ঢেকে দেয় সে রূপজানেরই পরনের শাড়ির বাড়তি আঁচলটা টেনে। রূপজানের মৃত-দেহকে দিন এলেই বা কি করবে সে! কবর দেওয়ার জায়গা নেই কোথাও, তার উপর কাফনের খরচা। পয়সা কড়ি তার হাতে নাই। চিন্তা এবং ভয় দুই তার মনকে ঘিরে ফেলেছে। বাইরে কি যেনো একটা ছায়ার মতো দেখতে পেলো আনছু। মুখটা বের করে দেখে নিলো সে। কোথাও একটা শব্দ পর্যন্ত নেই। সব নীরব।

স্থির করলে আনছু ভেলাটা সহ রূপজানকে ছেড়ে দিবে মেঘনার স্রোতে। পাষাণ আনছু স্বামী হয়েও। তবু ইচ্ছা হয় তার শেষবারের মতো একবার

রূপজানের মুখটা দেখতে। মনে পড়ে তার শরীয়তের বিধান—ধর্মের নিয়ম : মৃত স্ত্রীর মুখ দেখা জীবিত স্বামীর জন্য নিষেধ।

প্রমত্ত মেঘনা সাঁই-সাঁই রবে ছুটে চলেছে। এক একবার পাক খাওয়া পানিগুলি মনে হয় যেনো মাথা উঁচিয়ে উঠেছে। ভয়হীন মনে আনছু নেমে পড়ে ভেলাটা ছেড়ে মেঘনার পাড়ে। মাটিতে পা ঠেকতেই দেখলো আনছু গলা পানি তার। কলেমা পড়তে পড়তে ঠেলে দিলো ভেলাটাকে সে নদীর দিকে। অল্পক্ষণেই কোথায় যেনো ভেলাটা দূরে চলে গেলো—আর দেখতে পায় না আনছু। চোখে তার গাঢ় অন্ধকার॥

আশ্চর্য প্রতিমা

হুমায়ুন কাদির

বাইরের দরজাটা তখনে খোলা। আর ঘরের মধ্যে তখনো একা বসে আছে হালিমা। শীর্ণ, সরু সরু হাত দুটো টেবিলের ওপর রেখে ঘাড় নিচু করে তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টিতে। একটা নিশ্বাস সে ফেলছে না। দূরে যে দরজাটা খোলা রয়েছে—এখানে বসে যেদিকে তাকিয়ে বাড়ির উঠোনটা দেখা যায়, একবার সেদিকে তাকিয়ে পর্যন্ত দেখছে না। মাঝে মাঝে কালো চুলগুলো সে সরিয়ে দিলো মুখের ওপর থেকে। শাড়ির পাড় দিয়ে ঘাম মুছে নিলো কপালের। তারপর দেয়ালের একদিকে রাখা সুটকেশটাকে টেনে তুলে রাখল টেবিলের ওপর। বাঁ হাতে শাড়ির আঁচলটা চেপে সুটকেশের ওপর তার স্পর্শের স্বাদ বুলিয়ে দিলো।

আধ ঘণ্টা কেটে গেছে, তবু জামানের দেখা নেই। একা এতক্ষণ বসে থাকায় যেন শূন্যতার পরিধি আস্তে আস্তে আরো বেড়ে গেছে। এতক্ষণ একটি কথা পর্যন্ত না বলে সে যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। কিন্তু মনের ভেতর কোন মনস্তাপ লুকিয়ে এখানে আসেনি হালিমা। হালিমা শুধু আজ রাত্রির মতো একটু আশ্রয় চায়। পুরনো সম্পর্ক সে স্বীকার না করে নিক্, এক রাত্রির আশ্রয় প্রার্থনা করবার মতোও অধিকার কি আর তার কাছে নেই?

বাঁ হাতে কোমরটা চেপে ধরে উঠে দাঁড়ালো হালিমা। ছিপছিপে সবুজ একটি গাছের পাতার মতো নড়লো তার শরীর। তারপর আস্তে আস্তে মনে সাহস সঞ্চার করে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। ঘরের শূন্যতার মতো বাইরের উঠানেও শূন্যতা। ফিরে এসে আবার চেয়ারটায় বসে পড়ল হালিমা।

শেষ পর্যন্ত জামান এলো। হালিমার মনে কোন ইচ্ছার সবুজ আলো জ্বেলে দিতে না ক্ষীণতম সম্ভাবনার কণ্ঠরোধ করতে তা সে বুঝলো না।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল হালিমা। সরু সরু মোমের মতো আঙুলগুলো মটকাতে মটকাতে ফিরে তাকালো জামানের মুখের দিকে। তার সে দৃষ্টিতে যেন কেমন অসহায়তা ফুটে উঠতে চায়। যেন সমস্ত তরলতা ছলছল করে উঠতে চাচ্ছে হালিমার মনে এখন জামানকে দেখে। কালো কঠিন মুখে হালিমার দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে জামান বলল, তুমি! কখন এলে—

সেই কখন এসে বসে আছি। তোমার চাকর ছোকরাকে দিয়ে খবর দিলাম, সে যে গেলো আর ফিরে এলো না।

জামান কোন কথা বলল না। একটা কঠিন রুক্ষতায় মুখের রেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠল তার। টেবিলের উপর রাখা সুটকেশটার দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। কেউ দেখলে ভাববে, যেন দুজন অপরিচিত যাত্রী হঠাৎ কোন ছোট্ট স্টেশনের অপরিসর একটি ওয়েটিং রুমে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। কোন কথা তাদের বলার নেই।

পাথরের মত নিঃশব্দ মুখ তুলে আবার তাকালো হালিমা। সে মুখের ছলছলে ছায়ায় করুণ বিলাপ যেন অশান্ত হয়ে উঠেছে।

সুটকেশের উপর কাঁপা কাঁপা হাত দুটো রেখে বলল, কথা বলছনা যে?

হঠাৎ কি মনে করে এলে, আমিতো কিছুই বুঝতে পারছি না—জামানের গলার স্বর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে ওঠে।

আমি এলাম, আসতে হোল বলে, আর পারলাম না, তাই। নিজের মনের সঙ্গে যেন যুদ্ধ করে আর পারলো না হালিমা। তরল একটা গ্লানিতে তার কণ্ঠরোধ হবার উপক্রম হোল। এত ক্ষীণস্বরে তার কথা উচ্চারিত হোল যে জামানও তা ভাল করে শুনতে পেলো না।

কি বললে?

হালিমার মনের বাতিটুকুও যেন এবার নিবে যাবে। একটা দমকা আশঙ্কার প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে কাঁপা কাঁপা গলায় তবু বলল হালিমা, আমাকে আসতে হোল, না এসে আমি পারলাম না। কিন্তু তোমার কাছে আর কিছু আমি চাই না। চাই শুধু আজকের রাত্রির মতো একটু আশ্রয়। তারপর কাল সকালে যেদিকে দুচোখ চায় সেদিকে চলে যাব। আমার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।

তার মানে? আমি এখনও কিছু বুঝতে পারছি না। অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল জামান হালিমার মুখের দিকে। ছিপছিপে সবুজ একটি গাছের পাতার মতো নড়লো আবার হালিমার শরীর। আর বাইরের পৃথিবীতে বিকেল ফুরিয়ে না যেতেই হঠাৎ-নামা অন্ধকার তাদের ঘরকে পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে ফেললো।

নিঃশব্দে কোন কথা না বলে জামানের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দিলো হালিমা। শাড়ির আঁচলটা সরিয়ে নিলো। তুষার শুভ্রতা ঝিলিক দিয়ে উঠলো সেখানে। কে যেন সেখানে হিংস্রতার আঁচড় কেটেছে।

দেখেছ? এই পিঠের ওপর আমার দাগগুলো দেখেছ। এগুলো কিসের দাগ বুঝতে পার? অনেক সহ্য করেছি, আর আমার শক্তি নেই। যতবার সে আমাকে চাবুক মেরেছে, ততবার আমি আমার মনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। কিন্তু আমার মনের সঙ্গে আমি হেরে গেলাম জামান।, তোমার কাছে অবশ্য আমার কিছু চাওয়ার নেই। আজ রাত্রির মত একটু আশ্রয় চাই—

মুখ কালো করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল জামান, কিন্তু এটা কি তুমি ভাল করলে হালিমা। সহ্যের গুণে অসাধ্য সাধন করা যায় তা তো তুমি জান। নাহয় আরো কিছুদিন দেখতে? কিন্তু—

কোন চিন্তা আর নয়, আমি এখন অটল আমার স্থির বিবেচনায়, কেউ আর আমাকে মত থেকে টলাতে পারবে না।

বেশ।

জামান তাকিয়ে দেখলো সেই সন্ধ্যার ক্ষীণ আলোয়, বাঁকা ছায়ায়, একটা নিশ্বাস উঠল হালিমার ভেতর থেকে।

নিশ্বাসের স্বরে সে আবার বলল, আজ রাতটা এখানে কাটিয়ে কাল সকালে চলে যাব।

কোথায় যাবে?

জানি না।

তারপর আর কোন কথা হোল না তাদের। ঘরের বাইরে এসে অনেকক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল জামান। তারপর জানালা দিয়ে উঁকি দিলো পাশের ঘরে। ছোট একটি ছেলে শুয়ে আছে। নবজাতকের কান্না থেমে গেলে যে ভাবে শিশু ঘুমিয়ে থাকে বিছানায় মায়ের কোলের পাশে, ছেলেটিও তেমনি যেন শুয়ে আছে বিছানায়। আস্তে আস্তে কিছুক্ষণ পরেই চোখ খুলে গেল ছেলেটির। মস্ত বড় হোল তার চোখদুটো, উন্মাদের মতো ঘুরে ঘুরে স্থির হলো জামানের মুখের ওপর।

গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুলো তার, আব্বা?

এই যে আমি, মণি। বিছানার কাছে এসে মাথার ওপর হাত রেখে জামান আবার বলল, এই যে এখানে আমি, আব্বা।

আমার ভয় করে আব্বা।

ভয়, কিসের ভয়? আমি তো এখানে আছি, সান্ত্বনার স্বরে বলল জামান, কোন ভয় নেই আব্বা।

ছেলেটি আবার আস্তে আস্তে চোখ বুজলো। কি রকম ভাষাহীন

বিবর্ণতা তার সে চোখে। যেন এইটুকু কান্নাতেই আবার সে স্তব্ধ হয়ে গেলো। জামানের প্রতিটি কথার স্নিগ্ধতায় ছেলেটির প্রাণে যেন উল্লাসের বিদ্যুৎ চমক দিয়ে উঠছে। আস্তে আস্তে হাত দুটো সরিয়ে নিলো জামান। ধীর মন্থর পায়ে সেই দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেলো। যেখানে চোখদুটো স্থির হয়ে আছে তার দিকে তাকিয়ে। সে চোখের ভাষা ছিল এককালে তার কাছে কত জানা। এখন আর নিশ্বাসের পতন নেই সে শরীরে। তার মুখের সেই একটি মাত্র ভঙ্গিই আজ শুধু স্মৃতি হয়ে ঝুলে আছে দেয়ালে। ছবিটার দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললো জামান। এখন শুধু স্মৃতি আর হতাশা। শুধু স্মৃতি নিয়ে কি মানুষ বেঁচে থাকতে পারে? মনে মনে জামান উচ্চারণ করলো: পারে। পারে। এ সংসারটাই স্মৃতি-মাত্রে পরিণত হবে একদিন। যে মানুষের অতীত নেই, তার বর্তমানও নেই। কিন্তু সে রকম মানুষ কে আছে এ সংসারে?

রাহেলার ছবির দিকে যতবার তাকাচ্ছে জামান, ততবার যেন তার সেই অতীতটা ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো তাড়া করে আসলো তাকে। একবার অসাবধানেই, নিজের অজ্ঞাতেই মনে মনে বিড় বিড় করে বলল, রাহেলা, তোমাকে ভালবাসবার আগেই আরো একজনকে আমি ভালবেসেছিলাম। তা কি আমার অপরাধ ছিল? ভালবাসার অর্থ কি আমি তা বুঝতে পারিনি তোমাকে ভালবাসবার আগে। তোমাকে দেখার আগে আমার ভালবাসার কোন অস্তিত্বই ছিল না, বিশ্বাস কর। বিশ্বাস কর, তুমি যেরকম যুদ্ধ করেছিলে মৃত্যুর সঙ্গে, কিন্তু মৃত্যু তোমাকে টেনে নিয়ে গেছে ঘুমের মতো, আমাকেও কি আবার কেউ সেরকম—

ছেলেটি আবার আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকালো। মস্ত বড় হোল তার চোখ দুটো, উন্মাদের মতো ঘুরে ঘুরে স্থির হোল আবার জামানের মুখের ওপর।

গলা দিয়ে তার আওয়াজ বেরুলো, আব্বা।

কি মণি।

আমি কবে ভাল হব আব্বা? কবে আমি হাঁটতে পারব?

এই তো আর বেশি দেরি নেই। শিগগিরই তুমি ভাল হয়ে যাবে মণি।

মুহূর্তের জন্যে বোধহয় মণির চোখ উজ্জ্বল হোল। ইচ্ছে হোল তার সে কথা বিশ্বাস করতে। ভাল হয়ে ওঠার সেই আশ্চর্য অপার্থিব মুহূর্তের কথা ভেবে হেসেই ফেলল মণি। মণির ঠোঁটে হাসি দেখে চোখ ছলছল করে

উঠল জামানের। অব্যক্ত যন্ত্রণায় ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল তার। সে মিথ্যে কথা বলেছে। কোনদিন আর ভাল হবে না মণি। আর কোন-দিন সে হাঁটতে পারবে না। এই পঙ্গু, ভারাক্রান্ত জীবন নিয়ে তাকে চিরকাল শুয়ে থাকতে হবে বিছানায়। শুয়ে থেকে তাকে চিরকাল ক্ষীণ আলো-জ্বলা একটি নৌকোয় ভেসে বেড়াতে হবে অন্ধকারের সমুদ্রে।

রাতে অন্ধকারে বারান্দায় বসে জিজ্ঞেস করল হালিমা, রাহেলা মারা গেছে আজ কত বছর হোল ?

চার বছর।

আচ্ছা, মণির চিকিৎসা করেও কিছু হোল না ?

না।

আমার ভীষণ দুঃখ হচ্ছে। ছেলেটি কত অসহায়, মা-মরা সন্তানের কি যে যন্ত্রণা, সে যন্ত্রণা তুমিও বুঝতে পারবে না। তুমি আবার কেন বিয়ে কর না ?

বিয়ে ? কে যেন একটা উত্তেজনা আবার ফিরিয়ে দিলো তার বুকে। ফিরিয়ে দিলো আশ্চর্য অপার্থিব সেই মুহূর্তকে, মনের ভেতর তাকে চলাফেরা করতে দেওয়ার ফুসলানিতে।

ঠোঁটের ফাঁকে একটু আলোর ক্ষীণ আভা ফুটিয়ে জামান বলল, বিয়ে, কাকে বিয়ে করব। বিয়ে করে আবার কি হবে ? বরং এই ভাল আছি। আমার জন্যে কেউ প্রতীক্ষা করে নেই। এই ভাল আছি। মণি আর আমি। মণিকে আমি প্রাণের চেয়েও ভালবাসি হালিমা।

যেটুকু রঙ আবার হঠাৎ লেগেছিলো জামানের মনে, তা মিলিয়ে গেলো। চোখের পলকে আবার ছায়া এসে পড়লো তার মুখে বিষাদের মেঘের। আস্তে আস্তে সে ছায়া ছড়িয়ে পড়লো মুখের ওপর। আর হালিমা, যে হালিমাকে একদিন নাকি ভালবেসেছিল জামান, এখন তার দিকে ফিরে তাকাবার মতো মনের অবস্থা তার আর নেই। এ যেন নববধূর মতো ঘোমটা টানা ছোট একটি মধ্যরাত্রির স্টেশনে হঠাৎ-দেখা তাদের পরিচয়। চোখের সামনে কাঁপতে কাঁপতে তারার ঝাঁক মিলিয়ে যাবে। মাঠে মাঠে গাছপালার চেহারা ফুটে ওঠার আগেই তাদের কথা শেষ হয়ে যাবে। এ অসহ্য রাত্রিকে ধরে রাখতে পারবে না হালিমা।

হাত দুটো শূন্যে তুলে একটা অশুভ সম্ভাবনাকে তাড়ানোর ভঙ্গি করে সে বলল, বিয়ে না কর আমার কি! সকাল হোলেই আমার সঙ্গে

শেষবারের মতো দেখা হবে। তারপর দুজন দুদিকে চলে যাব। আর কোনদিন হয়ত দেখা হবে না। হঠাৎ-নামা এক স্টেশনে ক্ষণিকের যাত্রীর মতো তোমার সঙ্গে দেখা হোল, অনেককাল পরে, তারপর আবার ছাড়াছাড়ি—

আমরা কত অসহায় হালিমা। পৃথিবীর কাছে যেন আমরা আর্ত শিশু। আমাদের ভাগ্যে যা আসে তা অমোঘ নিয়মে আসে। তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে কার সাধ্য আছে। যে ভাবে তুমি এসেছ সে ভাবেই তোমাকে চলে যেতে হবে, হালিমা।

আমি কোন নিয়ম মানি না, ভাগ্যের আস্ফালনকে আমি স্বীকার করি না। একটা অনুচ্চারিত উত্তেজনায় গলা কেঁপে কেঁপে উঠল হালিমার, নিয়ম মেনে চল্‌লেই আমার ওপর জুলুম করা হচ্ছে বলে আমি মনে করি নিয়ম মেনে চল্‌লেই আমি অস্থির হয়ে উঠি, আতঙ্ক, ভয়, ঘৃণা জড়িয়ে ধরতে চায় আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে, তা তুমি জান না?

জামান যেন বসে আছে তার অদৃষ্টের মুখোমুখি। গলা দিয়ে তার আর কথা উচ্চারিত না-হোক, সে যেন কিছু অনুমান করতে পারে। অনুমান করতে পারে তার আর এক লগ্ন আসন্ন। সেই অলৌকিক লগ্ন আবার একটি স্থির রাত্রির বুকে এসে থমকে দাঁড়াতে চায়। হাতদুটো দিয়ে একটা খস্‌খস্ আওয়াজ করল জামান। সামনে বসে থাকা অন্যমনস্ক কাউকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে লোকে যে ভাবে শব্দ করে, তেমনি হাতদুটো দিয়ে চকমকির মতো ঠুকলো। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তা তো তুমি ভাল করেই জান—

এই হালিমার কথা বলতে গেলে কোন কথাই শেষ হবে না। কি করে এই হালিমাই একদিন তার নিজের আয়ত্তের বাইরে আস্তে আস্তে চলে গিয়েছিল তা জামানই আজ ভুলে গেছে। হয়ত হালকা রংদার তুচ্ছতা নিয়েই তার জীবনে একদিন এসেছিল হালিমা। তখন জামানের বয়স আর কত হবে। যে বয়সে একটি পুরুষ কোন একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ থাকাকেই প্রেম বলে ভুল করতে চায়, সে বয়সেই তার জীবনে এসেছিল হালিমা। কিন্তু কি আশ্চর্য, জামান নিজে ভেবেই আশ্চর্য হয়, হালিমাকে সে কি করে সেদিন ভালবাসতে পেরেছিল। হালিমার জীবনে যা একমাত্র ছিল, তা তার রংদার তুচ্ছতা। হালিমার জীবনে কতবার প্রেম এসেছে আবার তা ফিরে গেছে আষাঢ়ের মেঘের মতো। জামানের

জীবনের তটভূমিতে রেখাপাত করতে পারে নি সে প্রেম। যখন সে প্রায় হালিমাকে ভুলতে বসেছে, যখন হালিমা প্রায় স্মৃতিতে পরিণত হতে চলেছে আর জামান উঠে এসেছে সমাজের সেই ছোট্ট সরু চূড়ায়, তখন রাহেলাকে বিয়ে করে বসল সে।

কেউ কেউ সেদিন করুণার চোখে দেখেছিল হালিমাকে। সবাই আশ্চর্য হয়ে বলাবলি করেছিল; কি করে জামান পারল তা, হালিমাকে কাঙাল করে দিতে কি করে সে পারল। কিন্তু জীবনের মুঠো যে তাতে শিথিল হয়ে যায় না, বরং প্রেমের উন্মেষ হয় নতুন নতুন, রহস্যপুরীতে, তা জানত হালিমা। শুধু কৌতূহল বাড়িয়ে দেয়ার চাবিকাঠিটি বের করে নিতে হয় সন্তর্পণে, তারপর সেই রুচি, সেই আশ্চর্য ভঙ্গির কলা-কৌশলের অভাবনীয়তা দিয়ে মন্ত্রের মতো কাছে টানতে হয়। কেন না, প্রেম খানিকটা তুচ্ছ, কিছুটা মহান। তার আকর্ষণ চুম্বকের মতো তাদেরই কাছে টানে বেশি যারা ভীরু, অসহায়, বয়স না বাড়তেই যারা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক পাকাপাকি করে ফেলতে চায়। হালিমা সে রকম কাঙাল তাই কোনকালেই ছিল না। বরং জামান সেদিন তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেলতে যেন সে নিশ্বাস ছেড়েই বেঁচেছে। অন্তত সেদিন তার মনে হোয়েছিল তা-ই।

তারপর একদিন হালিমা প্রায় নিঃস্ব হয়ে গেলো। তা সে নিজেই ভাল করে জানত। জানত সবাই শেষ হয়ে যায়, প্রতিদিন বেঁচে থেকে আর প্রতিদিন নতুন জন্মলাভ করে, সবাই শেষ হয়ে যায়। আর একদিন সে জানল, তার আর কিছু দেয়ার নেই অথচ আত্মা তার তখনো অশান্ত। আর যখন সে প্রায় ফুরিয়ে গেছে, কেউ আর তাকে নিয়ে কানাঘুষা করছে না, তখনো হালিমা ভেবে আশ্চর্য হয়েছে। স্মৃতি বলতে তার কিছু নেই। জীবনের খাতা তার শূন্য। শেষ পর্যন্ত এটাই তার জীবনের বড় সত্য হোল জীবনে যা কিছু করা যায়, যা কিছু ভাবা যায়, তার সবই অর্থহীন। তারপর নিঃসঙ্গতা যখন আরো নিবিড় হোয়ে উঠতে লাগল, শেষবারের মতো হালিমা পড়লো প্রেমে। রুটিতে শেষবারের মতো কামড় দেয়ার মতো। সে প্রেম তাকে একেবারে আশ্রয়ের সপ্তম স্বর্গে পৌঁছে দিলো। কিন্তু এই বারো বছরে যেন হালিমা আরো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অদ্ভুত দ্বীপান্তরে তার জীবনের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে আছে বলে সে ভেবেছে। বারোটি বছর। বারোটি বছরে যেন তার অস্থির

সোনালী সুখ পালিয়ে গেছে একেবারে তার জীবন থেকে। হালিমা প্রায় বিশ্বাস করে ফেলেছিল, তার জীবনে আর কোন উত্তাপ নেই, আশা নেই, স্পন্দনও নেই।

আমি প্রায় মরে যাচ্ছিলাম, ফিস্ ফিস্ আওয়াজে কথাগুলো মনে মনে বিড় বিড় করে, আমার দ্বিতীয়বার মৃত্যু হোক্ সে-ই আমার ভাল।

দরজা খুলে পা টিপে টিপে অন্ধকারে পাশের ঘরে গেলো হালিমা।

নিঃশব্দ অন্ধকার ঘর, আর জানালার ফ্যাকাশে নীল আলো। মণি অঘোরে ঘুমুচ্ছে বিছানায়। এত নরোম, এত সুক্ষ্ম এই রাত্রি যে হালিমার মনে হোতে লাগল সে যেন তা অনুভব করতে পারছে। দিনের আলো যেন তার জন্যেই কেবল অপেক্ষা করে আছে, কখন সকাল হবে, আর শেষবারের মতো হবে তার সঙ্গে দেখা। দীর্ঘ রাত্রি যেন কুঁকড়ে শুয়ে আছে এই ঘরের অন্ধকারে। কিন্তু এই অন্ধকারকে যদি হাতের মুঠোয় ধরে রাখতে পারতো হালিমা। অন্তত কিছুদিনের জন্য তারপর আবার যদি সে তাকে ছেড়ে দিতে পারতো। রাত্রি শিরশির করছে হাওয়ায়। জানালার আলোতে মণির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো হালিমা। যেন একটি সুখে-ভরা মুহূর্ত, হালিমা একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলো।

সুক্ষ্ম চেতনাময় আঙুলগুলো দিয়ে মণির দেহ সস্নেহে অনুভব করে সে দেখতে লাগল। রুদ্ধশ্বাস হয়ে গেলো হালিমা সুখে। তারপর মণি যখন ঠোঁট কথা বলতে খুলছে সেই অন্ধকারে কারো অন্তরঙ্গ স্পর্শে, হালিমা তাকে তার শরীরের সঙ্গে মিশিয়ে ধরে বলল, মণি আমি তোমার মা, আবার ফিরে এসেছি।

বাইরে তারপর ধীরে ধীরে অন্ধকারের পাতলা ঘোমটা খুলে যেয়ে বের হোয়ে এল আরামের উষ্ণতা। এই অসহ্য রাত্রিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলো না হালিমা।

ঘরের ভেতর ঢুকে প্রথমে একটু চমকে উঠলো জামান।

ভুরু কুঁচকে বলল, একি, তুমি এখানে ?

দুহাতে মণিকে জড়িয়ে ধরে হঠাৎ আনত শরীরে হালিমা বলল, মণির জন্য আমার ভারি কষ্ট হচ্ছে। আর থাকতে পারলাম না। ওর কষ্ট আমার বলে মনে হচ্ছে। হালিমার চোখে হঠাৎ আত্মপ্রসন্ন হাসির চমক মনের যন্ত্রণাকে আরো নিবিড় করে দিলো জামানের।

হাত দুটো শূন্যে তুলে রেখা আঁকার ভঙ্গিতে সে ভ্রুকুটি করলো। যেন সে কোন অশুভ সূচনা দেখে ভয় পেয়েছে।

বিছানার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলল, মণি মণি, আব্বা।

আস্তে আস্তে মণিও চোখদুটো মেলে তাকালো। মস্ত বড় হোল তার চোখদুটো, শান্ত আর নীল, গভীর সমুদ্রের মতো। উন্মাদের মতো নয়, এবার সুখ-মগ্নতায় ঘুরে ঘুরে স্থির হোল তার চোখদুটো জামানের মুখের ওপর।

বলল, কি আব্বা?

জামান কি বলবে হঠাৎ ভেবে পেলো না। মণির চোখদুটো দেখে সন্দেহের আর্তনাদ মনের ভেতর গুমরে মরতে লাগল তার। কি বলবে জামান সে মুখকে? এ মুখের যেন কোন অতীত নেই, স্মৃতির ভারে কোন-কালে পীড়িত ছিল না ছেলেটি। ছেলেমানুষ তাই ওদের লোকে বলে।

হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে জামান বলল, ঘুম ভাঙল আব্বা?

হ্যাঁ। এই ছাখ আব্বা; এ কে। আমাকে এ খুব ভালবাসে। রাত্রে আমাকে কত আদর করেছে এই মা। জান ও কি বলে, আমি নাকি ভাল হয়ে যাব, যদি ওকে মা বলে ডাকি। আমারও মনে হয়, আমি ভাল হোয়ে গেছি, তাই না আব্বা?

জামানের হৃৎপিণ্ড যেন আরো সঙ্কুচিত হোয়ে গেল। বিস্ফারিত হোয়ে রক্ত যেন ছড়িয়ে পড়লো তার চোখে। প্রতিটি মুহূর্তের পদধ্বনি যেন শুনতে পাচ্ছে জামান। অলস একটা ভঙ্গিতে হালিমার দিকে তাকিয়ে বলল, সকাল হোয়ে গেলো। এবার তোমার ছুটি হালিমা। সকালের ট্রেনই তোমাকে ধরতে হবে বোধহয়। তোমার দেরি হোয়ে যাচ্ছে।

কোথায় যাবে বাবা? মৃদু নরোম চোখে তাকালো মণি একবার হালিমা আর একবার জামানের দিকে।

জামান শান্ত গলায় বলতে চেষ্টা করল, কোথাও না।

ছেড়ে যাবার মুহূর্তটি নিষ্ঠুর! এই অসহ্য রাত্রিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলো না হালিমা। তাকে যেতেই হবে, ছেড়ে যেতেই হবে শেষ পর্যন্ত তাকে। আর তার পরাজয়ের বিভীষিকা দেখতে হবে চোখে। জীবনে জামান আর একবার তাকে ঠকালো, এবার চিরকালের মতো। কঠিন, নিষ্ঠুর অন্ধকারের বুকে তাকে ঠেলে দিয়ে জামান এবার তাকে ঠকালো। হালিমার সমস্ত শরীরটা যেন ঠাণ্ডা হোয়ে জমে গেল সে কথা ভাবতেই। একটু সে নড়তে পারলো না, উঠে বসতে পারলো না, নিঃস্বতায় অন্তর ভরে গেলো তার।

নিঃস্ব, করুণ, অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, যেতে আমাকে হবেই।

আর হয়ত কিছুক্ষণ, আধ ঘণ্টা কিংবা এক ঘণ্টা। তারপর ছাড়াছাড়ি। তারপর দুজন আবার দুদিকে। কিন্তু আমার শুধু ভাবনা এই মণির জন্যে।

উঠে শাড়ির ভাঁজটা ঠিক করে নিতে নিতে মণির দিকে ফিরে তাকালো হালিমা। আর মণি ফিরে তাকালো হালিমার দিকে। মণির চোখে যেন খুশি ঝিলিক দিয়ে উঠছে। আশ্চর্য উজ্জ্বল চুলের ভার নিয়ে হালিমা হাঁটু ভেঙে মণির পাশে বসে পড়লো। দুই দীর্ঘ বাহু বাড়িয়ে দিলো মণির দিকে। মণি জড়িয়ে ধরলো তাকে। স্তব্ধ বিস্ময়ে জামান তা তাকিয়ে দেখলো।

মনে মনে হালিমা ভাবল, কতক্ষণ আর, এবারই শেষ। এবার বিচ্ছেদ শেষবারের মতো। বাইরে শীতের হলদে রদ্দুরকে মনে হোল যেন কালির আঁচড়, কালো। যেন বিশাল অন্ধকারের কেন্দ্রে সে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ তার মনে হতে লাগল সে মূর্ছা যাবে। আর ঠিক সময়ই জামান এসে দাঁড়াল তার পাশে। তাকে প্রায় ধরে ফেললো। তাকে বাঁচালো। সরু সরু আঙুলগুলো নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে এনে চাপ দিলো। হালিমা ফিরে পেলো স্বর্গের নিশ্চিত আভাস। অনুভবের পূর্ণতা যেন সে ফিরে পেলো আবার।

তোমার যাওয়া হবে না, হালিমা। কি জাদু করলে তুমি মণিকে। মণি ভীষণ কাঁদছে। এ অবস্থায় কিছুতেই তোমার যাওয়া হতে পারে না। তুমি জান ওকে আমি প্রাণের চেয়ে ভালবাসি। জামানের মুখ ফ্যাকাশে ম্লান, মোমের মতো। কপালে এসে ছড়িয়ে পড়েছে চুল, চোখ তার স্থির যেন একটা ভয়ের কিছু দেখে ফেলেছে।

ম্লান হেসে বলল, হালিমা। মণির জন্যে দেখছি তোমার চোখে ঘুম নেই—

সত্যি জামানের চোখে ঘুম নেই, ঘুম এলো না। একি হোল তার? রক্তের বীজে আবার কোন কামনা উত্তপ্ত হয়ে উঠতে চাচ্ছে তার? কঠিন নিষ্ঠুর উত্তপ্ত ঘৃণা জন্ম কেন নিতে চাচ্ছে তার মনে? কেন? দরজা ঠেলে ভেতরে গেলো জামান। ঘরে নিঃশব্দ অন্ধকার, উত্তাল সমুদ্রের মতো। সমস্ত শরীর তার কামনায় কেঁপে কেঁপে উঠল। হালিমার সত্তা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে বিছানায়। সমস্ত শরীরটা ঠাণ্ডা হয়ে আবার জমে গেলো জামানের। হালিমা কি সত্যি তাকে ভালবাসে? মিথ্যে কথা, প্রতারণা, চিরকাল সে প্রতারণা করে এসেছে সকলের সঙ্গে। একটা কঠিন নিষ্ঠুর ঘৃণা জন্ম নিলো জামানের মনের ভেতর। ভালোবাসা কিছুটা তুচ্ছ, কিছুটা মহান

তার কাছে। তার সত্তা সম্পূর্ণভাবে কাউকে ভালবাসে না। নিঃশব্দে হালিমার বিছানার কাছে এসে দাঁড়াল জামান। ঘুমন্ত শরীর নিশ্বাসে ওঠা-নামা করছে হালিমার। জামানের মনে হোল হালিমার প্রতিটি নিশ্বাসে ছলনা আর অবিশ্বাস, ঘৃণা আর নিষ্ঠুরতা। তার মুখ সে স্পষ্ট দেখতে পেলো। একটা ক্ষুধিত যাতনা সে দেখতে পেলো রহস্যময় সৃষ্টির অন্তরে। তার মাথার ওপর হাত রাখতেই জেগে গেলো হালিমা।

বিস্ময়ের স্বরে শুধাল, কে ?

আমি। আমাকে তুমি টেনে আনলে, এই রাত্তিরে। আমাকে তুমি না এনে ছাড়লে না।

হালিমা হাসলো, অন্ধকারেও বোঝা গেল তার হাসি।

বলল, সত্যি, আমি জানতাম তুমি আসবে।

চোখের ভুরু দুটো কুঁচকে গেলো জামানের। তবু সে জড়িয়ে ধরলো হালিমাকে, ঠিক যে ভাবে একটি নেকড়ে তার শিকারকে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে। তারপর শান্ত, স্নিগ্ধ গলায় বলল জামান, তোমার মনে পড়ে হালিমা সেই দিনগুলোর কথা। আর সেই রাত্রিগুলোর—যে রাত্রিগুলো ঠিক আজকের এই মুহূর্তের মতোই নিবিড় ছিল।

সব মনে পড়ে। সব আবার আমার মনে পড়ছে। আমি আবার ফিরে পেতে চাই হারানো স্মৃতিকে।

জামান জিজ্ঞেস করলো, স্মৃতি বলতে তোমার কিছু আছে হালিমা ?

ছিল। এখনো আছে। তা তুমি জান না। কোনদিন জানতে না। এখন বললেও আর তা বিশ্বাস করবে না। তবু আমি বলছি, আমার স্মৃতি আছে, বিশ্বাস কর।

হালিমা নিজের হাত দুটো দিয়ে আরো জোরে চেপে ধরলো জামানকে। যেন একটি অন্ধ অনুভূতি কেবলি যাতনাকে পরাস্ত করতে চাচ্ছে। আচ্ছন্নের মতো হাত দুটো দিয়ে জামানও তাকে সুখের ভারে তন্ময় করে দিলো। হাত দিয়েই সে অনুভব করল হালিমার চোখ, ঠোঁট, চিবুক আর চুলের বিস্তৃতিকে।

আস্তে আস্তে ফিস্‌ফিস আওয়াজে আবার সে বলল, আমার কাছেই আবার কেন এলে হালিমা ?

বিশ্বাস কর আমি ইচ্ছে করে আসিনি। আমাকে যে আসতে হোল, না এসে আমি পারলাম না—বলতে বলতে যেন আবার চোখের পাতা কেঁপে উঠল হালিমার। গভীর তন্ময়তায় সে উষ্ণতা অনুভব করতে লাগল জামানের।

আর জামানের কঠিন আঙুলগুলো খুঁজে বেড়াতে লাগল হালিমার চিবুক, ঠোঁট, তারপর হাত দুটো স্থির হয়ে গেল এসে গলার কাছে। নিঃশব্দ, শান্ত মুহূর্তের উদারতা দিয়ে তার সেই হাত দুটো স্থির করে দিলো হালিমার হৃৎপিণ্ডকে।

আর একবারও হালিমা নড়লো না, হেললো না। নিশ্বাস ওঠা-নামা করল না তার। বিস্ফারিত হালিমার চোখ দুটো কী বিকৃত এখন!

হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে দাঁড়াল জামান। যেন এক বিরাট যুদ্ধে সে জিতেছে। দেয়ালের কাছে ছবিটার দিকে সরে দাঁড়াল সে। তার মুখের সেই একটি মাত্র ভঙ্গিই আজ শুধু স্মৃতি হয়ে ঝুলে আছে দেয়ালে। যে রাহেলা যুদ্ধ করেছিল মৃত্যুর সঙ্গে, কিন্তু মৃত্যু যাকে টেনে নিয়ে গেছে ঘুমের মতো। অথচ সে আশ্চর্য প্রতিমার আকর্ষণ এখনো কি অনিবার্য? প্রশ্নের দৃষ্টিতে অন্ধকারেই ছবিটার দিকে তাকালো জামান।

হালিমার সমস্ত কৌশলকে জামান আজ ব্যর্থ করে দিয়েছে। মণি আর তাকে মা বলে ডাকতে পারবে না॥

নশ্বর স্রোত

হুমায়ুন চৌধুরী

১

কোথাও যেনো একটা ষড়যন্ত্র হয়। আর তার ধ্বনিগুলো দূর থেকে কানে আসে। ভাসমান কখনও বা সমুদ্রে, উড্ডীন কখনও বা গগনে, কভু বা নক্ষত্রের চোখে ধিকি ধিকি অঙ্গারের সমতুল। মাঝে মাঝে হাওয়া এসে বেসামাল করে, খণ্ডিত অস্পষ্টতায় মাঘ নিশীথের কুয়াশা যেনো বা, ধ্বনি তখন আড়াল হয়ে বহতা নদীর গান হয়ে যায়। সমস্ত চেতনা জুড়ে পাক খাচ্ছে ঘোলা জল। তেষ্টায় একচণ্ড দগদগে একটা দুপুরের সূর্য গলা দিয়ে একবার নামছে বুকের কাছটায়, উঠছে, আর পচা বাসি কালচে হয়ে যাওয়া রক্তের ছোপমারা হাড়িকাঠের মতোন ভর সন্ধ্যের বাঁকানো পথটার ওপর ছুরি শানাবার শব্দ উঠছে ক্রমাগত। একটা রেল চলে গেলে পর লাইনের ওপর থেকে কাটামুণ্ড ছাগল ছানার আর্তনাদ, ধোঁয়া ওঠা উষ্ণ রক্ত, খাবলা খানেক মাংস গড়িয়ে ঘাসের চাতালে পড়ে লালে এবং সবুজে একটা জীবনের ছবি আঁকে। মড়কের মতোন স্তব্ধতা ঝুলছিলো এতোক্ষণ এবং লাল সবুজের সংকেত ওধারে ট্রাফিকের মাথায় রদবদল হলে পর কাহিনীর নায়ক পথ পেয়ে যায়। অগণন জনস্রোতে একটা হাহাকার প্রবাহিত, বিপন্ন বধির অন্ধকার পরস্পরকে আহত করে জিন্না এভেন্যুর দেয়ালে মাথা ভাঙছে। এইভাবে একটা কোলাহল জন্ম নেয়।

২

চব্বিশ বছরের পদচারণার ধূলি মার্কারীর আলোয় ফুটপাত ছেড়ে প্রসাধন বিপণির প্রাঙ্গণে দু'খণ্ড বিবর্ণ ভূর্জপত্রের মতোন যুবকের পায়ে শোভা পায়। ভূর্জপত্রের মোড়ক খুলে অতঃপর প্রতিধ্বনিত হয় দ্বাদশ শতকের বাঙ্গালা দেশ —তো বিনু তরুণী নিরন্তর নেহেঁ। বোহি কি লত্তই এণ বি দেহেঁ। হে তরুণী তোমার নিরন্তর স্নেহ বিনা কি এই দেহে বোধি লাভ হয়। বোধি থেকে বোধিসত্ত্ব এবং শুদ্ধোধন কপিলাবস্তু গোপা ইত্যাদির চতুর্মাত্রিক ঘ্রাণ মনপবনের নায়ে ভেসে এলে পর মাথার ওপর থেকে নক্ষত্রের আকাশ

প্রদোষ দ্বিপ্রহর এবং অপরাহ্ণ কালের তাবৎ পাপ নির্মুক্ত হয়ে একটুকরো ধ্যানের অমল স্তব্ধতা হয়ে নেমে আসে পদতলে। একটা শেতল পাটি বিছিয়ে যায় এবং এতোক্ষণে ষড়যন্ত্রের দূরাগত ফিস্‌ফাস্‌ ধ্বনি পা টিপে টিপে হেঁটে এসে ক্রমশ প্রখর হয়।

৩

হে শহর! হে মা! তুমি আমায় ধারণ করো—সোচ্চার চিৎকারের কথাগুলো তখন অতিক্রান্ত ছাব্বিশ বছরের শোকের আড়ালে চাপা পড়ে যাচ্ছিলো, যে বেদনা জন্ম নেয় ক্রমাগত শৈশবের অর্ধশায়িত স্মৃতিকে ছাড়িয়ে কৈশোরের টিফিন পিরিয়ডের ঘণ্টার বিলীয়মান কান্নায় এবং কপালকুণ্ডলার বনমধ্যে তারুণ্য পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ এই অকলঙ্ক কৌমার্যের গান এবং গান থেকে লাফিয়ে ওঠা প্রেমের তুরঙ্গে। পঁচিশতম জন্মদিনটি রোববার ছিলো বলে রেসকোর্সের মাঠে বাজীর ঘোড়া পা' ফস্‌কে রক্তবমন করে এবং ফক্কিকার জুয়োড়ী ঈশ্বরকে রক্ষিতার মতোন গালাগাল দেয়।

৪

নগরীতে প্রলম্বিত রাত ক্রমশ দ্রৌপদীর শাড়ি হয়ে যাচ্ছে। আমার রক্তাভ হৃদয়ের বিচ্ছুরিত আভা একটি রোমশ হাতের মুদ্রায় লম্বমান আর তাতে হত্যাজনিত রক্ত ত্রাস স্বেদ ইত্যাদির বিভিন্ন নখর বঁড়শির মতন ক্রমাগত টানছে, নিশীথের বস্ত্রকে কেবলি হরণ করছে, আর উন্মোচিত চিৎকারে এক একটি আকস্মিক ফেটে পড়ছে পথচারী কুকুরের সিক্ত লালায়। গোলাকার চক্র আঁকছে কালো রাস্তার বধ্যভূমিতে আর তা মুহূর্তে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে মোহিনী-রজ্জুর ফাঁসে—এই মতে আঁকা হচ্ছে হত্যার নিপুণ চিত্র। ভয় নামক একটা শত্রুকে নাম ধরে ডাকতে গিয়ে যুবার তৃষ্ণার্ত কণ্ঠ শূন্য গেলাসের মতোন ফেটে চৌচির হয়ে যায়। কয়েকটি নিঃশব্দ উপমা অতঃপর প্রিয়নাম ফোটাতে চাইলে সেই সব শত্রু নগরীর শীর্ষে শীর্ষে প্রেক্ষাগার থেকে বিপণিতে বহুবর্ণে জ্বলে নিবে নীলকান্ত স্বপ্নের স্তম্ভে রক্তপাত ঘটিয়ে শেষতক কোকা-কোলার বিজ্ঞাপন হয়ে ঝুলে রয় সারারাত।

৫

আমার পঁচিশ বছরের শোক আমার দিকে তাকিয়ে আছে অবৈধ শিশুর মৃত চোখে। সমস্ত সন্ধ্যার প্রান্তরে শেষহীন শত্রুর ভয়ে ভীত যুবক পায়ে

আত্মরক্ষার ঘুঙুর বেঁধে ক্লান্ত নটরাজের মতোন হা হা শ্বাস তুলে ধাবমান হতে চেয়েছে দৃশ্য এবং ধ্বনির আড়ালে, অঙ্গ থেকে ঝরাতে পারেনি ভূর্জপত্রের খোলস আর নিষ্ঠুর ঔদাস্যে গলায় পা চেপে হত্যা করেছে তোমাকে, হে সন্তান তোমাকে। নিরপরাধ শৈশব অর্ধনিমীলিত ঘুলঘুলিকে সশব্দে বন্ধ করে দেয়, শিশু ভোলানাথ কেঁদে ওঠেন মা গো বলে। দিগন্ত থেকে দিগন্তে, ধ্বনিপুঞ্জে, স্পন্দনে একি আকুলতা ভুবনে ভুবনে, বেত ঝোপের মাছরাঙা থেকে করমচার ডাল বেয়ে কেয়া বনতুলসীর সমস্ত ঘ্রাণ সবুজে হরিতে লালে লোপাট হয়ে যায় অশ্রুতে। নদীটা আড়াল হয়ে মুছে যায় কুয়াশায়। আমার স্কুল বাড়িটা ফাকা মাঠের মধ্যিখানে ভাঙা খিলান ঝড়ে ওড়া দরমার বেড়া ইত্যাদি নিয়ে মাথাখারাপ বাংলার মাস্টার কানাইবাবু হন্যে ভাঁড়া দাঁত নিয়ে হি হি করে হাসে। হাওয়ায় হিক্কা তুলে ঝন ঝন শব্দে বেজে ওঠে রবিঠাকুরের ছবিটা, বুকে তোকোনো কাচের ছুরি বসিয়ে মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান গায়। পত পত করে উড়ে যায় রাশি রাশি পোকায় কাটা পৃষ্ঠা। বাঙ্গালা দেশের বিশালপুথি যুবককে উত্তরিত করে ভক্তিমার্গ থেকে জ্ঞানমার্গে। অতঃপর চরাচর বিবস্ত্র হয়ে তাকে বক্ষ নীবি নাভিমূল ইত্যাদি গোপন প্রকোষ্ঠ প্রদর্শন করে। উনিশ শো একষট্টি মাইনাস কৃত্তিবাস কাশীদাস চণ্ডীদাস অতঃপর খঞ্জনী বাজিয়ে নাম শোনায় দ্বাদশ শতক।

৬

ধনুকের ছিলায় এইবার টঙ্কার উঠছে। স্কুল বাড়িটা মুহূর্তে খান খান হয়ে যায় সাজানো দৃশ্যের মতোন। দামাল দুরন্ত কয়েকটি নষ্টইচ্ছা রক্তের কোষ থেকে জন্ম নেয়া—দল বেঁধে লাফিয়ে পড়ে জমজমাট সিনের মাঝখানটায় ছারখার হয়ে যায় পলাশীর আম্রকানন, দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে অশোকবনে। ঝুর ঝুর সমস্ত মুক্তো ঝরে যায় মুকুট থেকে, ভয় পেয়ে প্রাণপণে দৌড়ান হৃতরিক্ত বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব, ছিন্নচরণে রক্ত ঝরে, হায়রে শূন্য হয়ে যায় রামচন্দ্রের তূণ। পলকে দুখিনী সীতা মোহিনী হয়ে আড়াল থেকে ডাকে। জি. পি. ও-র পেটা ঘড়ির আওয়াজ শ্রুতিতে দমক তুলতেই নয়ানপুর সংক্রান্তির মেলার সমস্ত বেলুন একসাথে ফেটে যায়। আর ষড়যন্ত্রের দূরাগত ধ্বনি, হাওয়ায় হাওয়ায় এক সহস্র তাতার ঘোড়সওয়ার, এইবার শব্দ তোলে দ্রিমিকি দ্রিমিকি। চক্রাকারে একটা উন্মাদ বেগান্ধ নৃত্য সভাশেষে ক্লান্ত বক্তাকে ঘিরে। চারুদত্ত ভুলে যায়, সখী রদনিকে! বসন্তসেনা কই হে! প্রাণ কাঁদে রে।

৭

এ যাবৎ অন্ধকারের লালাসিক্ত আকাশে পিচ্ছিল খেয়ে ছিটকে পড়া চাঁদ খানিকটা জ্যোৎস্না বমি করে। অথচ এ রকম কথা ছিলো না, চন্দ্রিমা গলার মাদুলী এবং জ্যোৎস্না শরীরের জাদু, পৃথিবী ধরণী হয়ে যায়, ফুল কুসুম। মেয়েমানুষ রমণী। তবু যেহেতু চারিত্র্য দুর্বোধ্য উপমা এবং একটি অতিক্রান্ত সড়ক অকস্মাৎ আচ্ছাদিত তৃণগুল্মে, পরিব্যাপ্ত স্মৃতির সংসার অভাবনীয়ের জটাজালে ডাঙায় উঠে আসে পিতার ছিন্ন করোটির মতোন, সাগর শুকিয়ে জলকন্যার মেহগিনি-পালঙ্ক উঁকি দেয়, স্বর্ণ অঙ্গুরী দোলে থেকে থেকে, আর মায়ের নাম লেখা রক্তাক্ত শুশুকটা চড়ায় আটকে দিনভর শুকোয়। দুটো চোখ কেবল তাকিয়ে দেখে তলদেশে একটা বিরাট সুড়ঙ্গ, নীলাভ অগ্নি হু হু করে আহুতির স্বরে ডাকছে, ইড়া সুষুম্না পিঙ্গলারা জমে যাওয়া হাত পা সেঁকছে চুল শুকোচ্ছে, তার আঁচে। চরাচরে পানি নেই এক ফোঁটা, ফকির লালন মইল জল পিপাসায় থাকতে নদী মেঘনা। ঠা ঠা ডাঙায় নবকুমারের নৌকা ঝড়ে টালমাটাল যায়।

এই মতে কব্জি ঘড়িতে রাত ন'টা বাজার সময় সংকেত ধরা দেয়।

৮

একটা টাউন-সার্ভিস শুদ্ধ মোট সাড়ে তেরোটা স্টেট বাস কালস্রোতে ভেসে যায়। আমার ধন নেই, প্রাণ নেই, জীবন নেই, এমন কি যৌবন। দু'চোখের ঘুমের মতোন নেবে আসছে পরম লগ্ন।

বুড়ো দারোয়ানের হাতের পাঞ্জায় ন্যাশনাল ব্যাঙ্কটা ঝিমোয়। শান্তিনগর ভাঁটিখানা ফেরত দুই মহাপ্রাণ পরস্পর পিতৃ-সম্বোধনে তদগতচিত্ত এবং প্রেস ক্লাবের ফুটপাথে ভ্রাম্যমান বেসরকারী বেশ্যা।

আত্মপ্রতারণার বশংবদ পালায় অতঃপর সময় বুকে হেঁটে আহত সৈনিকের মতোন এগিয়ে আসে রক্তাক্ত। এ দিকে দ্বারে প্রহরী তূর্যনাদ তোলে।

দৃশ্যপট স্থির। আনুমানিক কয়েক হাজার দর্শক রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষায় ফুলে ফেঁপে সমুদ্রকে ডাকছে। আলোকিত নাট্যশালা বিদীর্ণ উৎকণ্ঠার পূর্ব-মুহূর্তে অবোধ্য নির্জনতায় মহাকালের মন্দির হয়ে যায় স্থির নিশ্চুপ স্মৃতিহীনতার হিম অন্ধকারে। একফালি রুগ্ন আলো ধমনী ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা বিবর্ণ রক্তের ফিনকিতে ছাদ থেকে নাটমঞ্চের ওপর আড়াআড়ি আছড়ে পড়ে

একটা লেজকাটা টিকটিকির মতোন গড়াগড়ি যায়, একটি অপগত বিকেলের কুটো মাত্র সম্বল করে ঐ একবুক অন্ধকার থেকে জন্ম নেয়া বিনষ্ট আলোক রশ্মিতে জিরাফের মতোন গলা বাড়িয়ে সাঁতার কাটে সূত্রধার। নিশ্বাস ভারী হয়ে আসছে, জমে আসছে হাত পা, প্রচণ্ড ভয়াল অনিকেত অস্পষ্ট তলদেশ তাকে টানছে স্রোতে পাঁকে আবর্তে। আর শেষহীন পাড়ির সর্বশেষ ভরা কটাল-কে চন্দ্র সূর্য মিলে বিপুল বিশ্বাসে সমবেত টান দেবার আগেই লোকটার স্বগত কণ্ঠ জানানি দিয়ে ওঠে, যেনো অনেক দূর থেকে পুথি পড়ার শব্দ আসে মধ্যরাতে, লক্ষ্মণ সেনের পরিত্যক্ত পথটায় দ্বাদশ শতকের বঙ্গদেশ পুনরায় স্ব-কণ্ঠে আবির্ভূত হয়। অতঃপর ধীরে সংহত মন্ত্রোচ্চারণে নান্দীপাঠ চলে।

৯

সমবেত সুধীবৃন্দ! এ নাটকের কাহিনী আপনাদের জানা। অতএব বাক্যক্ষেপ নিষ্প্রয়োজন।

কাল অধুনাতম। মূল চরিত্র একজন, চতুর্বিংশ বর্ষের নির্জ্ঞান যুবা, নায়িকা অনুপস্থিত এবং সে কারণেই নাটকীয় সংঘাত যথাসম্ভব বজায় রেখে বিভিন্ন পর্বে এসে একমার্গ থেকে অন্যমার্গে উত্তরণ বর্তমান নায়কের পক্ষে স্বাভাবিক না হলেও সম্ভব হয়েছে। আমি নাটকের সূত্রধার, আমার তিনকাল ডুবেছে, অবস্থা আপনারাই দেখছেন। অতএব শিঙা ফোঁকার আগে শেষবারের মতোন আমি পালাটা করে যেতে চাই। আগেই বলেছি কাহিনী আপনার জানা, সুতরাং গল্পের নির্দিষ্ট পথ ধরে এতে কোন ডেভেলপ্‌মেণ্ট নেই। তবে হাঁ, অ্যাকশন যাকে বলে, তা আছে বই কি, আর এই একটিমাত্র পরম অ্যাকশনের জন্যেই তো এতো পায়তাড়া। আপনারা আজ এখানে অনেক মানুষ জড়ো হয়েছেন, ফুটবল ক্রিকেটের সিজনে সচরাচর এতো মানুষ স্টেডিয়ামেও ধরে না। আর এ-ও আমার বিশ্বাস, অন্তত ঈশ্বরের একজন নষ্ট সন্তান হলেও এখানে আছেন যিনি ছুরি শানাবার শব্দ শুনেছেন, রক্তের লোহিত ঘ্রাণ যার নাকে এসেছে, বধ্যভূমিতে নিয়ে যাবার আগে ফাঁসির আসামীর চোখে যিনি শেষ রাত্রির লণ্ঠনের নিষ্প্রভ শিখা কাঁপতে দেখেছেন। তেমন একজনও কি নেই? জবাব দিন—নেই?

(অগণন জনতার ভিড় থেকে উঠে দাঁড়াবে একজন।)

আর কেউ? শীত-সন্ধ্যার পাতলা কুয়াশায় রেসকোর্সের মাঠে বাজীর ঘোড়াকে রক্তবমন করতে দেখে যিনি টের পেয়েছেন এবার অন্ধকার তলদেশের দ্বার উন্মোচিত হবে, মধ্যরাতের আকাশ থেকে একটা নক্ষত্রকে পালাতে দেখে যিনি মেলট্রেনের চাকার তলায় নৃমুণ্ড আঁচ করেছেন, নেই তেমন কেউ? একজন মানুষও কি অন্তত বাঙ্গালাদেশের শিরায় শিরায় একাকী একটি স্বরের নিঃসঙ্গতাকে আবিষ্কার করে অন্তিম চিৎকারের ভয়াবহ সংকেতে শিহরিত হন নি? একজনও?

(পাতলা বেঁটেখাটো দ্বিতীয় ব্যক্তির মাথা অনেক মানুষের অরণ্যকে ছাড়িয়ে দেখা দেবে।)

ব্যাস, এই শেষ? আমার সময় হয়ে এসেছে, এইবার আমি পুরোপুরি ডুবসাঁতার কাটতে শুরু করে দেব, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে জমে যাবে সমস্ত রক্ত, কাহিনীর মার্জিনে যে খরস্রোত অস্পষ্ট প্রবাহিত তার আড়ালে সূত্রধারের দেহটা শেকলে বাঁধা মস্ত একটা পেতলের ঘড়ার মতোন বাকি জীবন ধরে থেকে থেকে বাজবে আর কেবলি শূন্যতা ছড়াবে। কিন্তু তার আগে অন্তত আর একজন যে চাই, নিসর্গে বিভিন্ন উপমা ফুটতে দেখে যিনি হায় হায় করে উঠে স্টেটবাসের লাইন ধরে মোক্ষধামে পৌছুতে চেয়েছেন, বয়স্ক আত্মীয়ের কাছ থেকে নীতিকথা ধার এনে যিনি জ্যোৎস্নায় লাফ দেয়া ফড়িংটাকে শাসাতে চেয়েছেন, প্রচেষ্টা বেকার দেখে অতঃপর আবিষ্কার করেছেন রমনা মতিঝিল আর শান্তিনগরের মাঠে মাঠে কয়েক সহস্র গোর খোঁড়া হয়ে গেছে, চাপা পড়েছে বাঙ্গালী বিদেশী মিলে হাজার খানেক কবি। সেই তিনি কি নেই? এঁড়েগরু কেনার আগে তাঁত বোনা তাঁতীর গল্প শুনিয়ে শুনিয়ে যিনি গালব্যথা করে ব্যর্থ হয়েছেন?

(মোটা মানুষটা হাঁসফাঁস করে রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে সম্মতি-সূচক মাথা নেড়ে এক পা সামনে এসে দাঁড়াবে।)

সাধু! এক, দুই, তিন, সুধী হে—তিনজন মানুষকে সাক্ষী রেখে এইবার আবির্ভূত হবে চরমক্ষণ—এতোক্ষণ যে অ্যাকশনের কথা আপনাদের বলছিলাম, প্রচণ্ডতম একটি হত্যাকাণ্ড। কাহিনীটা আপনি তোতাপাখির মতোন আউড়ে যেতে পারেন, আর এই তার নৃশংস লীলা অন্ধকার নাটমঞ্চে। মুণ্ড খসে পড়েছে দেখছেন, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনে শ্রুতিগোচর একটি একটি প্রিয় নাম ধীরে ধীরে মরে আসছে, সমস্ত রক্ত আর অশ্রু একাকার

হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে কাহিনীর উপেক্ষিত মার্জিনে—আর তাতে এইবার ভেসে যাচ্ছে সোনার লখিন্দর, যায়রে ভেসে যায়।

১০

রুগ্ন আলোর ফালিটা সূত্রধারকে শুদ্ধ ডুবে যেতেই যুবক দেখলো তার ধড়টাকে বঁড়শিতে গাঁথা টোপের মতোন প্রবল নিম্নগামী আকর্ষণে উদ্দাম আবর্ত কেবলই টানছে—পরিচয়পত্রবিহীন তার কঙ্ককাটা দেহটা ভেসে যায়, অস্তিত্বের আড়াল থেকে কেবলই প্রহত হয় শেকলে বাঁধা শূন্য একটা কলস।

১১

মাসের পয়লা হপ্তা ছিলো বলে স্বভাবতই গাদা গাদা মানুষের ভিড়ে জিন্না এভেন্যু গুলিস্তানের পরিচিত এলাকাগুলোয় ঝাড়া তিন ঘণ্টা তিন বন্ধু মিলে তাকে খুঁজে খুঁজে হতাশ হয়েছে। অবশেষে স্টেডিয়ামের যেখানটায় একডজন বেকার মিলে চিনেবাদামের খোসায় সময়ের পরিমাপ নিচ্ছিলো তার কাছাকাছি একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা, পাঞ্জাবীর খালি পকেটে দু'হাত এবং স্ট্র্যাপ ছেঁড়া স্যাণ্ডেলের সাথে যুধ্যমান অবস্থায় চতুর্থ জনকে খুঁজে পেয়ে মহাউল্লাসে ঘাড়ে হাত রাখতেই চমকে ফিরে সে বললে, 'আমি নেই রে!'

জবাব না দিয়ে তৃতীয়জন বললো, 'উঃ চ' বাবা, খুঁজে খুঁজে একসা, যতো জ্বালা কি শালা আমাদের খালি'—যুবক চিৎকার করে বলতে চাইলো —'সুব্বৎ, তীরে দাঁড়িয়ে থাকা তোমার নাগাল আমি পাইনে, হাতটাকে অনেকখানি বাড়িয়ে ধরলেও না, নবকুমার সাগর সঙ্গমে যায়—'

কান না দিয়ে দ্বিতীয়জন বললে, 'আপিসে টেলিফোন করে পাত্তা নেই, রেস্তোরার খুপরিতে বসে বসে মেয়েটা এতোক্ষণে রোস্ট হচ্ছে—এমন করে কি লাভরে বাবা—'

মর্মভেদী চিৎকার এতোক্ষণে দুর্বোধ্য স্বগতোক্তিতে রূপান্তরিত,—ভেসে থাকতে থাকতে জীবনে সবাই কমবেশি ধ্বনিটা শুনেও ভুলে থাকতে চায়, অস্তিত্বের আড়াল থেকে শব্দটা এখন শ্রুতিতে বজ্রের মতোন নাম ধরে আমায় ডাকছে—।

তৃতীয়জন মৌনতা ভাঙলো, গলাটা তার খাদে—'বিশ্বাসইতো ভালোবাসা, মাটি কি সোনা কি, আসলে এক, ভাবনা নিয়ে কথা। যা চাঁইছি তা সব

সময় কাম্য নয়, কিংবা যা চাই নি তার সবটুকু মন্দও নয়। অতএব ফিরি চারজনা শোভাযাত্রা করে! তোর সুখের শুকপাখি সন্ধ্যে থেকে দাঁড়ে বসে আছে, চ'—'

১২

একটি রোরুদ্যমানা প্রতীক্ষিতা নারীর অভিমুখে চারবন্ধুর মিলিত আকর্ষণ তাকে ধাবমান করলেও সেই নিরুত্তাপ সন্ধ্যার প্রহরী বাঙ্গালা দেশের পথে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়ানো ক্লান্ত যুবা অনুভব করলো তার স্বরূপের স্কন্ধ আর অমোঘ অন্তরালের শূন্য ধ্বনিময় কলসিটা এক শেকলে বাঁধা, তার উদ্ধার নেই আর কেবলই তা' প্রয়াণের পথ ধরে ভেসে যাচ্ছে। মুদিত নেত্রের পল্লব ধারণ করে আছে একটুকরো অন্তিম নিঃসঙ্গতা, প্রতীক্ষমাণা মহিলারা যাকে সম্ভবত প্রেম বলে সনাক্ত করে॥

আত্মহত্যা-ব্যবসায়ী

আবদুল মান্নান সৈয়দ

সন্ধেবেলা, ফেরেশতারা যখন চারদিক থেকে আলো খেয়ে ফেলছেন, আমি সেজেগুজে প্রায় উদ্দেশ্যহীনভাবে সান্ধ্যভ্রমণের জন্য বের হ'লাম; যদিও আমি কাপড়-চোপড় পরেছিলাম, আয়নার সম্মুখে মুহূর্ত কয়েক দাঁড়িয়েছিলাম, এবং আমার চেহারা দেখে আমার হতাশা দ্বিগুণ বাড়লো, যে-হতাশা কিছুক্ষণ আগে আমাকে পাগল ক'রে দিচ্ছিলো। কিছুক্ষণ আগে ঘরের ভিতর জানলার সম্মুখে ব'সে আমি সূর্যের শেষ আলোয় ভদ্র-হ'য়ে-ওঠা লোকদের যাওয়া-আসা, ম্লান মোটরের ট্যাক্সির রিকশার যাওয়া আসার ছবি দেখতে-দেখতে অন্য কথা ভাবছিলুম; অর্থাৎ এসব দৃশ্য আমার চোখের সম্মুখে থাকলেও ভিতরে-ভিতরে একজন দাহন লকলকে জিভে ছুটছিলো; আমি সমস্ত পৃথিবীর উপর চ'টেছিলাম, আমার সমস্ত বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন পারিবারিক সদস্য সবাইকে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী মনে হচ্ছিলো, বাইরে তারা শার্ট-প্যাণ্ট পরা দিব্যি ভদ্রলোক, ভিতরে-ভিতরে হাজার বছর আগেকার আদিম মানুষ। বন্ধু-বান্ধবেরা একে অন্যের ছিদ্রান্বেষণে রত, আত্মীয়স্বজন সহানুভূতি দিয়ে আঘাত করতে চায়, এমনকি পারিবারিক সদস্যরা—যারা আকস্মিকভাবে আমার ভাই-বোন-আব্বা-আম্মা, যারা আমার শেষ নির্ভর—তারাও মনে হচ্ছিলো বিরুদ্ধে, তাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ যেন মমতার জায়গায় টাকায় বদলেছে: দুপুরবেলার ছোটো একটি ঘটনা অমন অনুভূতির জন্যে দায়ী, কেননা পরিবারের উপর বিশ্বাস পূর্ণভাবে আমি এখনো হারাইনি। আমার মাথায় বিষ-দড়ি-ছুরি স্বপ্ন-ঘুম-মোহের মতো ঘুরছিলো। আমি আত্মহত্যার কথা ভাবছিলুম সারাক্ষণ; আমি চেয়েছিলুম জানলা দিয়ে বাইরের দিকে কিন্তু কিছুই দেখছিলুম না। 'কেন আমি আত্মহত্যা করবো', নিজেকে আমি প্রশ্ন করলুম আরেকজন হ'য়ে। 'কেননা আমি কষ্ট পাচ্ছি।' 'বা! কি কষ্ট তোমার। তোমার আব্বা সরকারের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত, তুমি দারিদ্র্য কাকে বলে জানো না, তোমার পরিবারের সবাই তোমাকে ভালোবাসেন, তোমার মতো সুখে ক'জন আছে আমাদের দেশে, তুমি তোমাকে নিয়ে সারাক্ষণ ব্যস্ত, কেউ তোমাকে বাধা দিচ্ছে না। পৃথিবীতে কজনই বা এমন সুখ পায়?' 'তবু আমি কষ্ট পাচ্ছি, এটা সত্যি।'

'কি কষ্ট তোমার, স্পষ্ট ক'রে বলো।' এটা খুব সত্যি আমি কষ্ট পাচ্ছি, সারাক্ষণ. দিনে কি ঘুমের ভিতরে, সারাক্ষণ ঠাণ্ডা এক টুকরো বরফের অসহ্যতায় যেন কেউ আমাকে জোর ক'রে দাঁড় করিয়ে রেখেছে; অথচ কি সেই কষ্ট আমি কিছুতেই স্পষ্ট ভেবে পেলাম না এক মুহূর্ত—না স্পর্শপ্রবণতা, না যৌনতা, না দারিদ্র্য, না আদর্শ অথচ সবকিছুই মিলে এই কষ্ট। কিন্তু এটা কোনো উত্তর হয় না, এই নাস্তিময়তা, উত্তর তাই যা আঙুল তুলে বিশেষভাবে চিনিয়ে দিয়ে যায়, যা সবিশেষ। হাঁটতে হাঁটতে ভাবা যাবে ঠিক উত্তরটি কি,—এই ভেবে অন্যমনস্কভাবে আমি সেজেগুজে বের হ'লাম রাস্তায়—'কেন আমি আত্মহত্যা করবো', 'কাকে আমি কষ্ট ভাবছি।'

রাস্তা আমাকে বলের মতো লুফে নিলো; রাস্তার দু'ধার দিয়ে স্রোতের মতে যে-জনতা চলেছে মুহূর্তের ভিতরে আমি তার অন্যতম হ'য়ে গেলুম; স্রোতের মতো লোকজন, দুপাশের উচাটন দোকানগুলো, ঠোঁটে ঠোঁট বুজে বুজে মজবুত মহিলা, ট্যাক্সি-মোটর-রিকশার হ্রেষা ও টুংটাং; অথচ কিছুই আমার চোখে পড়ছিলো না, সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক থেকে আশ্চর্যভাবে কনুই চালিয়ে হাঁটু বাড়িয়ে জুতো গলিয়ে হাজার লোকের ভিতর দিয়ে পথ তৈরী করতে-করতে চলে যাচ্ছিলুম আমি। এবং সমস্ত শব্দকে পরাজিত ক'রে বুনোন চলছিলো প্রাক্তন ভাবনার, 'আমার কষ্ট স্পর্শপ্রবণতার যৌনতার আদর্শভঙ্গের; সবচেয়ে কষ্ট বুঝি খাপ খাওয়ানোর, "অ্যাডজাস্ট" করবার; যে-কোনো অবস্থা বা মানুষের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো বা মিলিয়ে নেয়া এটাই আমার আসে না, আমি আমার বন্ধুদের মতো আত্মীয়স্বজনের মতো চোখের আড়াল হ'তেই কারো নিন্দে শুরু করে দিতে পারি না এবং মানুষকে সরাসরি আঘাত দিলে আমি নিজে কষ্ট পাই অধিকতর; আমার কি উপায় হবে আত্মহত্যা ছাড়া, কেননা ঐ ভাবে বর্তমান জীবনের সঙ্গে সহবাস করা যায় না। এবং কেউ আমাকে আঘাত দিলে আমি আধুনিক মানুষের মতো সূক্ষ্মতার সহায়তা গ্রহণ করি না, বোকার মতো, একটি গেঁয়োর মতো তাকে খুন করতে চাই, যদিও শেষ পর্যন্ত পারি না; কথার চাবুকের বদলে সত্যিকার আহত বা নিহত করতে পারলেই আমি বেশি খুশি হই।' আমার ভাবনা যখন এইভাবে আবর্তিত হচ্ছে, কালো একটা চাদর ক্রমশ ধর্ষণে মিইয়ে আনছিলো সন্ধে ও তার অদ্ভুত রকমে নমনীয় মানুষগুলোকে, একটি চিৎকার উঠলো হঠাৎ, প্রবল ব্রেক কষে থেমে গেলো কোনো যান, মুহূর্তে মনে হলো বুঝি আমিই চেঁচিয়ে উঠেছি, পরক্ষণেই ভুল ভাঙলো, আভ্যন্তরীণ চিত্রমালা মুহূর্তে ঘরে

গেলো কিসের তাড়নায়, সম্মুখেই কৌতূহলের মৌচাক গ'ড়ে উঠতে দেখে আমি ছুট দিলাম সেদিকে।

যখন সেই ভিড়ে পৌঁছেছি, চারদিক ভেঙে মানুষ আসছে কেবলি, যান চলাচল বন্ধ; গোড়ালি উঁচু ক'রে পায়ের পাতায় ভর দিয়ে ঝুঁকে প'ড়ে মানুষের ব্যূহ ভেদ ক'রে দেখবার চেষ্টা করলাম বটে ভিতরে, কিন্তু কিছুই বোঝা গেলো না। 'কি হয়েছে?' সমুখের লোকটিকে জিগ্যেস করলাম, সে কোনো জবাব দিলোনা; পাশের লোকটি ধমক দিয়ে বললে, 'কি আবার হবে: অ্যাকসিডেণ্ট: যা হয় সব সময়! কিন্তু কি রকম লাগলো, লোকটি বেঁচে আছে না মারা গেছে বুঝছিনা কিছু।' আমি আরেকবার দেখবার চেষ্টা করলাম: স্পষ্ট কিছু বোঝা যাচ্ছে না; একটি মোটর সাইকেল কাত করা, মোটর সাইকেলের গায়ে হাত দিয়ে একজন দাঁড়িয়ে আছে, তার চুল থেকে পা অবধি ধনের সাক্ষ্য, ভয়ে তার প্রসাধন-করা মুখ ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে, ভিমের মত ভরাট মুখমণ্ডল নীলচে হ'য়ে গেছে, অক্ষিগোলক ঘূর্ণায়মান, দু'তিনজন মজুর শ্রেণীর ভদ্রলোক রুখে উঠেছেন তার বিরুদ্ধে, আমার কৌতূহল, বেশবাস, গম্ভীর অভিজাত মুখ ভিড়ের একটি অংশকে সরিয়ে দিলো, আমি ভিতরে ঢুকলুম, মোটর সাইকেল চালককে দেখেছিলুম এতোক্ষণ, তার কাছেই যে আরেকজন ছোটো ছেলে দাঁড়িয়ে আছে ভয়-ব্যাকুল দিশেহারা মুখে এবার সেটা নজরে পড়লো; বুঝলাম, এই ছেলেটিরই অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে মানে হ'তে যাচ্ছিলো, ভাগ্য ভালো, লাগেনি বোধহয়, যা দেখছি। আমার মুখ খুলতে হ'লো না; মজুর শ্রেণীর একজন ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমরা দেখছি, সব দোষ এই মোটরসাইকেলওলার। একটুর জন্য বাইচ্যা গ্যাছে ছোকরাটা।' মোটর সাইকেল চালকের মুখ বিবর্ণতর; তখন জিগেস করলুম, 'কি দেখেছেন আপনারা?' 'আমরা এই রাস্তা দিয়া যাইতেছিলাম, ছোকরাটা রাস্তার ওপার থেইক্যা এপারে আইতেছিলো, উনি যে স্পীডে আইতেছিলেন অ্যাকসিডেণ্ট তাতে হইতোই, ঐ ছোকরার না-হইলে আরেকজনের হইতো। সোজা রাস্তা, উনি তো বহু দূর থেইক্যাই দেখতে পাইছেন. কেন থামান নাই আগেই। আমরা দেখছি সব দোষ এই ভদ্দরলোকের। মিয়ার খুব টাকার গরম হইছে! তোমাগোই জান আছে, আমাগো আর জানের দাম ছায় কে!' 'পুলিশ আছে না ক্যান! পুলিশের হাতে দিলে……।' 'আরে পুলিশ কি করবো, দুটা ট্যাহা দিলেই রাস্তার ওধারে নিয়া কইবো যাওগা; আমরা ধোলাই দিমু।' দেখলুম এই লোকগুলো

রুখে উঠেছে প্রবলরকম, মারমুখো তারা; আমি মোটরসাইকেল চালকের মুখের দিকে তাকালুম, লোকটা পাতার মতো কাঁপছে, 'আরে ভাই কিছুই লাগে নাই তো এ ছেলেটির, আমারে সব দোষ দিচ্ছেন আপনারা। রাস্তার এদিক-ওদিক না চেয়েই পার হচ্ছিলো সে, দূর থেকে দেখেই আমি ব্রেক কষেছি, ঐ ওখানে', লোকটা আঙুল তুলে দূরে দেখাতে চেষ্টা করলো ভিড়ের মাথার উপর দিয়ে, 'একটা যন্ত্র তো মশাই, আমিই উল্টে যেতে পারতাম, ও-ও বেঁচে গেছে আমিও বেঁচে গেছি এই বলেন আল্লাহ্‌র দয়া।' নিজেকে ঐরকম ছেঁড়া শার্ট পরা, হাফপ্যান্ট-পরা খালি পা এই উশকো-খুশকো চুলের ছেলের সগোত্রে ফেলতে কিছুমাত্র দ্বিধা করলো না লোকটি—খাদে পড়লে সব মানুষেরই এই অবস্থা হয়। 'আচ্ছা, ছেলেটির তো লাগেনি কিছু', আমি এবার একপাশে মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে-থাকা ছেলেটির দিকে তাকালুম, 'কি, কোথাও লেগেছে নাকি তোর?' প্রথম কোনো জবাব এলোনা, আরো অনেকে তখন ছেলেটিকে জিগেস করলো, ছেলেটি মাথা নিচু ক'রে বললে 'পায়ে'। আমি ছেলেটির পায়ের দিকে তাকাতে চেষ্টা করলুম, 'কই কিছুই তো লেগেছে ব'লে মনে হচ্ছে না, হাঁটতো, হেঁটে ছাখ'; ছেলেটা হাঁটতে চেষ্টা করলো, খোঁড়াচ্ছে, একটু খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটছে, পায়ের ভিতরে হাড়ে লেগেছে হয়তো। 'ওদিকে একটি ডাক্তারখানা আছে, ছেলেটিকে ওখানে নিয়ে যেতে হবে, বেশি লাগেনি, সামান্য লেগেছে', কারো খুব আগ্রহ দেখা গেলো না, দু-একটি কথাই শোনা গেলো শুধু, 'পয়সাটা কে দিচ্ছে?' 'মোটরসাইকেলওলা! সে ছাড়া আবার দেবে কে!' 'পকেটে পয়সা আছে তো! এদের তো বাইরে বাহাদুরি, ভিতরে ছুঁচোর কীর্তন!' 'তা বলেছেন, ঢাকা শহরে হাঁটা যায়না মশাই, এই স্কুটার মটর সাইকেলের দৌরাত্ম্যে।' 'নতুন পয়সার মুখ দেখেছে এরা উঠতি বড়োলোক, ধরাকে সরা জ্ঞান করছে।' এই যারা কথা বলছেন, এরা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের লোক হয়তো। আমি একটু দিশেহারা বোধ করছি; চারিদিক থেকে সবাই মোটর সাইকেলওলার বিরুদ্ধে চ'টে গিয়েছে, লোকটি হয়তো মার খাবে সমবেত জনতার কাছে, আর তাহ'লে এই ধনীর দুলালের নরম চামড়ার নতুন একটি অভিজ্ঞতা হবে। এইবার সেই মজুর ভদ্রলোকেরা এগিয়ে এসেছেন লোকটির কাছে, 'ওকে আপনি চাপা দিতে চাইছিলেন।' 'বা, তাহ'লে আমার জেল হবেনা, ওকে চাপা দিয়ে আমার কি লাভ।' অনেকগুলো উপচে-পড়া ঠাট্টার মুখ: 'চাপা দেয়াই লাভ তোমাদের।' 'জেলের ভয় থাকলে আর এতো স্পীডে কেউ

চালায় না। আরে মার লাগা শালাকে, আমাদের মানুষই মনে করেনা ওরা। কয়েকজন তাড়া ক'রে এলো মোটরসাইকেলওলাকে; সে হ'টো গেলে একদিকে, তার মুখ নীল, চোখ বিস্ফারিত, মোটরসাইকেলটি ঠেলতে-ঠেলতে চ'লে সে অন্যদিকে, ভিড় তাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে ঐদিকে। আমি লোকটিকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু ভিড় যখন তাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে আমি যেতে পারিনি, পেছিয়ে গেছি; লোকটিকে বাঁচানোর বেশি চেষ্টাও আমি করতে পারিনি, আমার চোখের সম্মুখে ব্যাপারটি ঘটেনি, কার দোষ আমি জানিনা, লোকটিকে বাঁচাতে গেলে আমাকেও মার খেতে হ'তো হয়তো। আমি কিছু ভাবতে পারছি না, এখন আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে ভিড় ফাঁকা হ'য়ে গেছে, একটু দূরে সেই ভিড়, চিৎকার, লোকটি হয়তো মরে যাচ্ছে, তার নরম চামড়া, দামি শার্ট, ডিমের মতো মুখ হয়তো লাল হ'য়ে উঠছে।

কয়েকজন উদ্‌ভ্রান্ত যুবককে ভিড়ের দিকে ছুটতে দেখলাম, 'একটি নিরীহ লোক পাবলিকের হাতে মার খাচ্ছে ভাই।' লোকটাকে বাঁচাতে তারা ছুটে গেলো। আমি একবার ভাবলাম চ'লে যাই, এই ভিড় লোকজন চিৎকার বিদ্রূপ বেগামাল ক'রে দিচ্ছে আমাকে; তখনো লোক আসছে ভিড় লক্ষ্য ক'রে, 'কি হয়েছে?' আমাকে জিগেস করছে, আমি কোনো জবাব দিচ্ছিনা, তারা ভিড়ের দিকে ছুটে যাচ্ছে। লোকটির কি হ'লো, আমার কৌতূহলও হচ্ছে, পায়ে-পায়ে আবার আমি ভিড়ের দিকে এগিয়ে গেলাম উত্তেজিতভাবে।

বিশাল একটি ভিড় গ'ড়ে উঠেছে ইতিমধ্যে; আমি অনেক কষ্টে ভিড়ের মাথার উপর দিয়ে ভিতরে দৃষ্টিপাত করলাম: মোটর সাইকেলটি একপাশে কাত হ'য়ে রয়েছে, আর সেই মোটর সাইকেল চালক খাড়া দাঁড়িয়ে তার পাশে: তার চুল এলোমেলো, শার্টের বোতাম খোলা, প্যান্টের ভাঁজ নষ্ট, শখের জুতোয় কাদা। মুখ-চোখ সন্ধের এই অন্ধকারে লণ্ঠনের মতো লালচে হ'য়ে উঠেছে—দেখলেই বোঝা যায় তার উপর দিয়ে একডজন ঝড় ব'য়ে গেছে। উৎসাহী সেই যুবকের দলকে দেখলুম কি ক'রে ভিড় ভেদ ক'রে একেবারে মাঝখানে গিয়ে উপস্থিত। যার অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে গরিব সেই করুণ ছেলেটিও একপাশে দাঁড়িয়ে—কি ক'রে এলো ও ওখানে? লোকটিকে যখন মারতে-মারতে এদিকে তাড়িয়ে এনেছে কৌতূহলে সেও কি খোঁড়াতে-খোঁড়াতে এসেছে সঙ্গে? আমি ভেবে পেলাম না কিছু; কেননা আমার মনোযোগ কেড়ে নিয়ে যাচ্ছিলো আমার পাশ কেটে বেরিয়ে যাওয়া উদ্ধার-

ব্রতী সেই যুবকের দল এবং একজন প্রৌঢ় মানুষ তারা ঝগড়া করছিলো দাঁড়িয়েথাকা জনতার বিরুদ্ধে, প্রৌঢ় লোকটির পাঁজরের হাড় উঁচিয়ে আছে, শার্ট ঠেলে লোমে ভর্তি তার মুখটা কিসের অসংখ্য দাগে চিত্রিত, তার শার্টের ঝুল হাঁটু পর্যন্ত ঠেকেছে—দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো শার্টটি অন্য কারো; সেই প্রৌঢ় লোকটা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছিলো, 'খুব চিনি ওরে। এই ছোকরারে আমি এর আগেও দেখেছি পথে।' ভিড়ের ভিতর থেকে কে একজন বললে, 'আমিও দেখেছি মনে হচ্ছে সদরঘাটে কোনো একদিন।' তার দিকে চেয়ে সোৎসাহে মাথা নেড়ে প্রৌঢ় বললে, 'দেখবেনই তো, বলছিনা যে ব্যবসাই এদের এই। শহরে এই একটি নতুন ব্যবসা বার হইছে গাড়ির সামনে পইড়া দু দশ টাকা আয় ক'রে নেয়—একেক দিন একেকজন করে। জনসন রোডে এই ছোকরা একবার ধরা পইড়া গিছলো।' আমার খুব আশ্চর্য লাগছিলো, আমি এ ধরনের কোনো ব্যবসার কথা স্বপ্নেও ভাবিনি, আমি ছোকরাটির দিকে তাকালাম: এককোণে করুণভাবে দাঁড়িয়ে, হাতে দুটো টাকা যে রয়েছে তা আমার এতোক্ষণে চোখে পড়লো, এতো সোরগোল চতুর্দিকে তবু ছেলেটা কারো দিকে তাকাচ্ছেনা, তার ঘাড় নিচু, চোখ হাতে-ধরা টাকার উপরে, যেন চোখ দিয়ে সে টাকা খাচ্ছে। প্রৌঢ়টি তখন তার বক্তৃতার উপসংহার টানছে 'তবে সচরাচর ওরা নির্জন জায়গায়ই অ্যাকসিডেণ্টের চেষ্টা করে, মানে জখমের ভান করে, তাতে ভয় পেয়ে দুচার টাকা দিয়ে গায় চাপা যে দিয়েছিলো, ভাবে অল্পের উপর দিয়ে গেলো। কী বদমাশ দেখছেন ওরা; সুযোগ-সুবিধা পেয়ে এখন প্রকাশ্য রাজপথে হানা দেয়া শুরু করেছে।' ছেলেটির অবস্থা বুঝতে অসুবিধে হয় না: একটু আগেই জনতা হয়তো কোনো মীমাংসায় পৌঁছেছিলো, লোকটা দুটো টাকা দিয়ে নিস্তার পেয়েছে ছোকরাটাকে, ছেলেটা যাবে এমন সময় মূর্তিমান দুঃস্বপ্নের মতো প্রৌঢ় ঐ লোকটা ও সেবাব্রতী যুবক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব।

তখন হাওয়া সম্পূর্ণ উল্টো দিকে ব'য়ে গেলো: সবার লক্ষ্য হ'য়ে উঠলো সেই ছেলেটি, মন্তব্যের বান ডাকলো আবার, 'এক নম্বরের বদমাশ হবে, তা নাহ'লে কথা বলে না একটাও।' 'ঠকবাজ!' 'পয়সার অভাবে কতো চালাকিই যে বেরোয় এদের মাথা থেকে।' 'তাই তো; বাইরে থেকে ওর পায়ে তো একটু আঁচড়ও দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু হাঁটতে গিয়ে খোঁড়াচ্ছে। খোঁকা দিয়ে টাকা আদায় করার তালে ছিলো।' 'এক সন্ধ্যেয় বিনা খাটনিতে দুটাকা আয় কম কথা না।' 'না না অতোটা রসিকতা করতে হবে না।

প্রাণ বিপন্ন ক'রে দুটাকা আয় করেছে যদি সত্যিই হয়।' 'কেন? তাই বা করবে কেন? খেটে খেতে পারে না? বাড়িতে বলে একটা চাকরের জন্যে দিনরাত পাগল ক'রে দিচ্ছে বৌ।' 'হয়তো অভাবে প'ড়ে আত্মহত্যা করতে গেছিলো' গম্ভীরে নয় একজনের সরস হাসির ঝর্না ছিটকে বেরোলো চৌদিকে; আমি তখন বললাম, 'ওরা আত্মহত্যা করতে পারে না; আত্মহত্যা করতে পারে সেই, যার কোনো জ্ঞান আছে। পশুকে কোনোদিন কেউ আত্মহত্যা করতে দেখেছে! ছাখেনি, কেননা পশুর সে বোধ নেই। এর যদি কষ্টের বোধ থাকতো, তাহ'লে ও আত্মহত্যা করতো; কিন্তু সে আত্মহত্যা করার আগেও এ কষ্টের তাড়নায় খেটে খাবার চেষ্টা করতো। কিন্তু ও কিছুই করছে না।' অনেকের নজর পড়লো ওর হাতে-ধরা দুটো টাকার দিকে: ছেলেটা মাথা নিচু ক'রে আছে। কয়েকজন তাকে ধ'রে পড়লো, কোথায় থাকে, কি করে, বাপ-মা আছে কিনা, তারা কি করে। আর সেই যুবা সম্প্রদায় নিরীহ এই ভদ্রলোকটিকে যারা মেরেছিল তার তল্লাশ নিতে নামলো: আর চালক, তার লালচে মুখ ক্রমশ আবার ফরসা হ'য়ে গেলো। 'ছেড়ে দিচ্ছি আমরা তোকে, পুলিশে দিচ্ছি না, কিন্তু ফের যেনো এসব করবি না; যা—টাকাটা দিয়ে যা ভদ্রলোককে।' কয়েকজন বললে 'ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেই তো ওর কি রকম লেগেছে সেটা ধরা পড়বে। হয়তো সত্যি অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে; কাজেই টাকা ওর প্রাপ্য।' 'না, ফাঁকিবাজি ক'রে কেন টাকা নেবে?' 'সাহেব, ফাঁকিবাজি না। যদি সত্যিও হয় প্রাণ বিপন্ন করে তো দু'টাকা আয় করেছে। একটি মানুষের প্রাণ আর দুটো টাকা কোনটির দাম বেশি।' মোটর সাইকেল চালক উপসংহারের ভঙ্গিতে বললেন, 'অনর্থক এ নিয়ে আর গোলমাল বাধাবেন না। টাকা আমার লাগবে না। যা তুই চ'লে যা; হঠাৎ ব্রেক কষায় দেখছেন এটা চলবে না, একশোটি টাকা ঢালতে হবে এর পিছনে।' তখন লোকটা মোটর সাইকেলটা ঠেলতে-ঠেলতে স্টার্ট নেবার জন্য দৌড়ে গেলো; পিছু-পিছু কিছু লোক। আমি কয়েক কদম এগিয়ে এসে নতমাথা ছেলেটার ঘাড়ে একটা হাত রাখলুম, তারপর তার গালে একটা চড় বসিয়ে দিলুম, 'বেশ ব্যবসা পেয়েছো, না? আত্মহত্যার ভান ক'রে অথমের ভান ক'রে খুব মৌজে আছো তুমি—যতসব ভণ্ড, বদমাশ। সত্যি-সত্যি আত্মহত্যা করতে পারবি তুই? খুন হ'য়ে যেতিস যদি আজ—যা—বেরো এখান থেকে।' কে একজন মন্তব্য করলে না গম্ভীর না কৌতুকের গলায়, 'তা হ'লেও ক্ষতি ছিলো

না ; বাপ-মা কিছু টাকা পেত অন্তত।' ছেলেটার মুখটা বেঁকে গেলো, কোনো কথা বললেনা, টাকাটা মুঠোয় পুরে কুকুরের মতো বেরিয়ে গেলো কোথায়। ভিড় ভেঙে আস্তে- আস্তে লোকরাও ছড়িয়ে পড়ছিলো নিজ-নিজ গন্তব্যের দিকে।

তারপর আমি বিজয়ীর মতোন হাঁটতে শুরু করলাম : একটা সমস্যার সুন্দর সমাধান হ'য়ে গিয়ে আমার ভিতরে ঈশ্বরের আলো এসে পড়েছে। আমার ভিতরটা ভারি খুশি হ'য়ে হ'য়ে উঠছে, অথচ কিছুক্ষণ আগে ছিলুম ভারাক্রান্ত, বিষণ্ণ, ক্লান্ত। আমি তখন আত্মহত্যার ভাবনায় অধীর ও অসুখী, একরোখা ; ভিতরটা এখন সুন্দর ঠেকছে অথচ জনতার ভিতর দিয়ে আনমনে পথ তৈরী করতে করতে নিজেকে আমি গাল দিচ্ছি, 'আসলে তুমি অন্য লোকের কষ্ট দেখতে চাও, কষ্ট দেখে সুখী হ'তে চাও, কষ্ট দেখার যে আনন্দ সেই আনন্দের স্বাদ পেতে চাও—তাই না? তা না হ'লে কেন তুমি আত্মহত্যার ভাবনায় এতোক্ষণ ভারাক্রান্ত ছিলে; অথচ এখন ছেলেটাকে দেখে—ও যে নিজের প্রাণ বিপন্ন ক'রে আত্মহত্যা করে টাকা আয় করতে চায় তাই দেখে—তুমি ভাবলে "যাক আমার চেয়ে আরো অনেক দুঃখী মানুষ আছে পৃথিবীতে।" আর সেজন্যেই তোমার যতো আনন্দ। কিন্তু ছাখো মানুষ যে কোনো অবস্থায়ই আনন্দ নিংড়ে নিচ্ছে, হয়তো তাকে দুঃখও বলা যায় ; যেমন ঐ ছেলেটা : ও প্রত্যেক গাড়ির সম্মুখে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে ভাবে, "যদি বেঁচে যাই তবে কিছু টাকা রোজগার করতে পারি হয়তো, যদি চাপা পড়ে মরেই যাই তাহলে তো ভালোই, কষ্ট করে এইসব করতে হবে না আর." এ একরকম অদ্ভুত আনন্দ ; যে কোনো অবস্থায়ই পড়ুক ছেলেটা আনন্দ পাচ্ছে ; কিন্তু তুমি ভাবছো কষ্ট। হয়তো বা কষ্টই, যে-কষ্ট অদৃশ্য সেইতো সবচেয়ে বড়ো দুঃখ, ছেলেটির সবচেয়ে অশান্তি কি জানো?—অস্থিরতা, অজানা, ছেলেটি যে জানেনা তার মৃত্যু হবে কিংবা জীবন থাকবে এটাই সবচেয়ে বড়ো কষ্ট ; যদি সে কোনো রকমে জেনে ফেলতে পারতো যে তার মৃত্যু হবে কিংবা কিছু টাকা নিশ্চিত রোজগার হবে তাহলে সে গাড়ির সম্মুখে ঝাঁপ দিতে পারতো না। আচ্ছা, ছেলেটি যদি আত্মহত্যা না-ই করতে যায়, যদি তার টাকা রোজগারের উপায় হয় ঐ প্রাণ বিপন্ন করা—যে কথা বলে তুমি ধমকে কিছুকাল তাকে ধমকিয়েছো—তা'হলে নিজের জীবন মৃত্যু ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ঐ ভীষণরকম "অজানা"ই কি আত্মহত্যার শামিল নয়? তুমি যে আত্মহত্যার কথা ভাবো রোজ—যখনই প্রতারিত হও বন্ধুবান্ধব

আত্মীয়স্বজন কারো কাছে—তার চেয়ে কি মারাত্মক যন্ত্রণাদায়ক নয় এটি?—কেননা সেখানে স্বেচ্ছামৃত্যু, আত্মহত্যা করলেই চুকে যাচ্ছে সব; কিন্তু এই, এটি, ছোকরার এই ভীষণ ব্যবসা, এটাকে স্বেচ্ছামৃত্যু বলা যায় না, কেননা শরীরের আয়ু সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না এখানে, এটা ঠিক স্বেচ্ছামৃত্যু নয় আবার আত্মহত্যাই বটে, আত্মহত্যার চেয়ে ভীষণ।' আমার ভাবনা প্রবাহ যখন এইভাবে আবর্ত তুলছিলো তখন নিজেকে আলাদা একটি মানুষে বদলে দিয়ে গাল দিলুম যেন, 'এ কী বিলাস তোমার? কোথায় আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলে, অন্য একটি ছেলের দৃষ্টান্তে তা থেকে রক্ষা পেলে, অনেকদিন পর একটু খুশি হয়েছো, হাল্কা হ'য়ে থাকবে, তা না আবার জিজ্ঞাসার শিঙে-শিঙে জট পাকিয়ে তুলছো। শখ। তুমি একজন দুঃখবিলাসী ছাড়া আর কিছুই নও; এবং এরকম গাধা যে আজকের দিনটি সেলিব্রেট করতে ভুলে যাচ্ছো; আজ কি তোমার অন্তর্মুক্তির দিন না, একজন—সে যেই হোক, যেভাবেই কালাতিপাত করুক, টাকা উপার্জন করুক, জীবন বিপন্ন করুক; তুমি সেসব ভেবোনা, অতো ভাবলে বেঁচে থাকা যায় না—তোমার চোখ খুলে দিয়েছে সুখের দিকে, একজন আমার চেয়ে দুঃখী এই সুখটাও আছে যখন, তখন সেটা, মূর্খের মতো বরবাদ ক'রে দিতে পারো না—সেই আনন্দের প্রকাশের চেষ্টা করো।'

রাত তখন নটা, গ্রীষ্মের রাত, বায়ুমণ্ডল দ্যুতিমান, আকাশ স্বচ্ছ। কোথায় আমার সে পুরোনো বন্ধুরা, যাদের ছদ্মবেশ খ'শে পড়তে একেকজন করে আমি সঙ্গ ছেড়েছিলুম, একই শহরে থেকেও যাদের সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি, দেখা হ'লে এড়িয়ে গেছি, কিম্বা দায়সারা গোছের 'ভালো আছো-ভালো আছি' বলে পালিয়েছি, আজ বিকাল অবধি যাদের আমি ঘৃণা করেছি; তাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য, পুরোনো আড্ডার সংস্পর্শ পাবার জন্য আমার এক মুহূর্ত যেন হৃৎপিণ্ডে নেশা লেগে গেলো, যে-নেশাকে আমি ভিতরে ভিতরে দমন করে রেখেছি এতোকাল। চোখ থেকে কুয়াশার পরদা সরিয়ে আমি স্বচ্ছদৃষ্টিতে তাকালাম চারদিকে; আমার সুমুখ দিয়ে এক পাঞ্জাবী তরুণ ও তরুণী যাচ্ছিলো, কাঁটা বাদ দিয়ে মাছের মতো পার্শ্ববর্তীকে বাদ দিয়ে পাঞ্জাবী তরুণীটিকে আমি চোখ দিয়ে স্বাদ নিতে লাগলাম।

মনটা বড়ো খারাপ হ'য়ে গেলো, যখন নিউমার্কেটে, পুরোনো আড্ডায়, বন্ধুদের কাউকে পাওয়া গেলো না। ওরা কি আড্ডা বদলেছে? কী জানি,

কতোদিন তো ওদের সঙ্গ বর্জন করেছি। কিন্তু আমার ভিতরে একটা জেদ প্রবল অভিঘাতে বেড়ে উঠছিলো: এতোদিন পর বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, না দেখা পেলে কিছুতেই সোয়াস্তি পাবো না। ভিতরকার চিরকালের রাখালটিকে আমি গাল দিচ্ছিলাম ভয়ানক: কেন সে আমাকে এম্নি ক'রে খেপিয়ে তোলে, নাজেহাল করে, বেসামাল করে। কিন্তু বন্ধুদের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে কি লাভ হবে কোনো? কাউকে পাওয়া যাবেনা এখন একলা; সবাই মিলে জমিয়ে তুলেছে কোথাও। আবার ক্লান্ত, বিষণ্ণ, ভারাক্রান্ত মনে বাড়ি ফিরছি; নীল হাওয়া চারদিকে আঁচল ছড়িয়েছে, রাস্তা নির্জন, কেল্লার মতো পশ্চিমে উঁচিয়ে আছে চাঁদ; দূরে-দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ল্যাম্পোস্টগুলো মনোযোগ দিয়ে নিজের-নিজের পায়ে প'ড়ে থাকা আলোর খবরের কাগজ পড়ে যাচ্ছে।

সমস্ত রাস্তা মাতিয়ে তুলে হট্টগোল করতে-করতে কয়েকজন এগিয়ে আসছে, দেখছি। কাছে আসতেই আমার বন্ধুদের চিনতে পেরে আমি সোল্লাসে চিৎকার করে উঠলুম, 'আরে! কি ব্যাপার! তোমরা কোত্থেকে আসছো।' 'এই তো এদিকে গিছলাম আমরা বেড়াতে; আসতে-আসতে রাত হ'য়ে গেছে। তা তোমার ব্যাপার কি?' 'তোমাদের খুঁজছিলুম।' 'আমাদের!' ওরা একটু আশ্চর্য হলো; কতোদিন ওদের খোঁজ খবর নিইনি, ভালো করে কথা বলিনি মন খুলে, আমার একটু লজ্জা লাগলো। 'চলো, ও দিকে একটা ছোটো রেস্টুরেণ্ট আছে ওখানে।' এই বলে আমরা কাছের রেস্টুরেণ্টটায় গিয়ে বসলাম।

চায়ের কথা ব'লে আমি তাকালুম সবার দিকে: হাবিব, সুশান্ত, রহমান ও করিমের দিকে; প্রত্যেকেই কেমন যেন বদলেছে, বদলেছে, যেন বিমূর্ত শিল্পে তৈরী সবাই, কিংবা হয়তো গরিব রেস্টুরেণ্টের টিমটিমে আলোয় অমন না চেনা না অচেনা মনে হচ্ছিলো তাদের; ওরা ছাড়া আরেকজন ছিলো ব'সে, তার দিকে আমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে সুশান্ত ছেলেটার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলে, 'আমাদের নতুন বন্ধু, এর নাম কায়সার'। কায়সার আমার দিকে চেয়ে হাসলো একটু, আমিও; কথা বললেনা সে।

আমরা চা খেতে-খেতে একথা সেকথা অনেক গল্প করেছিলাম; ছোটো সেই রেস্টুরেণ্টে রাত দশটায় আর লোক ছিলোনা; ওদিকের টেবিল থেকে ছজন রিকশাওয়ালা ভাত খেয়ে উঠে চ'লে গেলো। এ-ও-তা গল্প করতে-করতে

কোথা থেকে সময় উড়ে যাচ্ছে খেয়াল ছিলোনা। হাবিব তার ঘড়ি দেখে শুধু বললে, 'রাত দশটা কিন্তু বেজেছে।' সে কথা ভেসে গেলো। কিছুক্ষণ পরই অন্যকথার তোড়ে: সুশান্ত বললে, 'কেমন আছে হে তোমার প্রেমিক? অনেকদিন তো কথা-বার্তা বলোনা তেমন—কিছুই জানলাম না।' বললাম, 'ওর সঙ্গে আমার আর এখন সদ্ভাব নেই।' 'আহা! বড়ো দুঃখজনক ব্যাপার!' সহানুভূতিসূচক অর্থাৎ আঘাতোন্মুখ কণ্ঠস্বর আর সেই মুখগুলোকে চাপা দিতেই বললুম, কেননা আবার আমি প্রাক্তন ভয়ংকরে ডুবে শহীদ; বললুম, 'একদিন ওর শরীর আমাকে ব্যবহার করতে দিয়েছিলো', চেঁচিয়ে উঠলো ওরা, 'তাই নাকি? সত্যি। যাক ভাই বল এক্সপেরিয়েন্সটা বল।' অনেকগুলো উৎসুক মুখ চার দিকে জ্ব'লে উঠলো; কেবল নতুন বন্ধু কায়সার ঠোঁটে একরকম অদ্ভুত হাসি মেখে, হয়তোবা আলোর প্রভাবে অমন মনে হচ্ছিলো আমার, ব'সে রইলো; তাকে আমি একটিও কথা বলতে শুনিনি এখনো, লোকটি সারাক্ষণ একটু দূরের চেয়ারে আমার ঠিক উল্টোদিকে ব'সে ছিলো; কথা বলছিলোনা, কিন্তু গম্ভীর নয় তাই ব'লে, মুখে তার একটি হাসি লেগেই ছিল; রাতে ঘুমের বিঘ্ন হ'তে পারে—এই কথা বলে চা-ও খায়নি; কোনো আলোচনায় যোগ দ্যায়নি, অথচ যে-কোনো আলোচনায় তার সম্মতি আছে চেহারা দেখে সেটা বোঝা যেতো। আমি কায়সারের দিকে তাকিয়ে আছি দেখে সুশান্ত বললে, 'আরে বলোনা। ও আছে তাতে কি। এরকম আলোচনা তো আমরা সব সময়ই করছি। এসবে ও কিছুই মনে করেনা।' লোকটার চেহারায় সম্মতি থাকলেও তার গাম্ভীর্য আমার ভালো লাগছিলো না; আমি ভাবছিলুম, যে-আনন্দ আজ পাচ্ছি, যে-চিন্তাহীন মুখ তাতে প্রত্যেকই অংশ নিক, যে-কোনো কথাই বলছি সেটাই আমাকে আঘাত দিচ্ছিলো, আমি ভিতরে-ভিতরে অস্বস্তি বোধ করছিলুম হয়তো লোকটা অগ্নি। অন্যান্য বন্ধুরা অবিরাম আমার অভিজ্ঞতা জানবার জন্য করাঘাত ক'রে চলেছে, 'বলো না। আহ্, বলতে কি। আমরা তো আর ভাগ বসাতে চাচ্ছিনা।' ওদের একটু অতৃপ্তির, আমার সৌভাগ্যের শাস্তি দেয়া দরকার, এই ভেবে আমি বললাম আস্তে আস্তে, 'ছাখো, কি আর বলবো, এখন তো ওর সঙ্গে আমার তেমন সদ্ভাব নেই। কিন্তু একদিন মানে একরাত্রি, যেদিন ও নিজেকে সমর্পণ করেছিলো, ঐ একটা রাত্রি আমি কখনো ভুলতে পারবোনা, কোনোদিন না।' তারপর একটু হেসে বললাম, 'যেন ওর শরীরে একখণ্ড হাড় নেই, ও যখন ও নিজেকে বাঁকিয়ে মুচড়িয়ে দোলাতে পারে, ও এমন

সুন্দর পাছা দোলাতে পারে না-দেখলে বিশ্বাস হয়না।' জীবনের উপভোগ, কালগত একরাত্রি, যেন শত আলো জেলে ফিরে আসছে আবার; আমি খুশি হ'য়ে-হ'য়ে উঠছি, যে-আমি আত্মহত্যা করতে চাচ্ছি, চেয়েছি বহুদিন, একটা মিথ্যে দিয়ে সেই আমাকে বাঁচিয়ে তোলবার চেষ্টায় আছি যেন। ওরা অনেকক্ষণ ধ'রে হাসলো, দু-একটা মন্তব্যও করলো।

যে-আমি কয়েকদিন ধ'রে আত্মহত্যার পরিকল্পনা করছি, এবং আগেও যে করছি অলীক একটি রাত্রির উপর ভর ক'রে আমি জীবনের স্বর্গের লোভে গ্রীবা রেখেছি বাড়িয়ে। ওদের হাসির বান থামলো; আমি আজকের সন্ধের অ্যাক্সিডেন্টের ঘটনাটি বললাম পুঙ্খানুপুঙ্খ, না-ব'লে পারলাম না। ঘটনাটি ছবির মতো ওদের চোখের সম্মুখে বর্ণনা ক'রে আমি চেয়ার একটু পেছন দিকে কাত করলাম। ওরা একে একে ঐ ঘটনার ওপর মন্তব্য করলো; আমি ঐ ঘটনাটিতে যে-অনুভূতি পেয়েছি তা যেন ওদের ভিতরেও সঞ্চারিত করতে পেরেছি, এমনি মনোময় কণ্ঠস্বর ছিলো ওদের।

'টাকা আয়ের জন্য মানুষ কী না করছে।' হাবিব বললো। 'ছেলেটি নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে এভাবে টাকা আয় করেছে আশ্চর্য। এরকম অদ্ভুত ব্যবসা আমি শুনিনি। তোমরা কেউ শুনেছো নাকি?'

'না,' সুশান্ত বললে, 'কিন্তু আত্মহত্যাও হ'তে পারে। ছেলেটা আত্মহত্যা করতে চাচ্ছিলো হয়তো এভাবে। ছেলেটা কিন্তু চমৎকার একটি প্রতীক মনে হচ্ছে আমার কাছে: কিসের বলো তো?'

'আরে প্রতীক-ট্রতিক বাজে কথা।' রহমান বললে, 'আসলে ব্যবসাই ওটা।'

'হ'তে পারে।' পরিবেশ হাল্কা করার ভঙ্গিতে বললে, 'দুটো টাকা তো পেয়েছে ছোকরাটা। কিন্তু তুমি হঠাৎ এ-গল্পটা বললে কেন? একটু আগেই তোমার প্রেমিকার কথা বলছিলে? তারপরেই হঠাৎ বয়ান করতে শুরু করলে গম্ভীর এই ঘটনাটা। তোমার প্রেমিকার সঙ্গে ঐ ছোকরা মানে ঐ ঘটনার যোগ কোথায়?'

আমি মাথার উপরে বালবের দিকে চেয়ে একটু ফ্যাকাশে হাসলাম; কোনো কথা বললাম না। কায়সার কোনো মন্তব্য করেনি, সে আমার উল্টোদিকের চেয়ার থেকে উঠলো; উঠে ওখান থেকে ঘুরে পা খোঁড়াতে-খোঁড়াতে এসে হঠাৎ অবিরাম চড় মেরে যেতে লাগলো আমার গালে, চড় মারতে-মারতে বললে, 'কোন ব্যথা পেয়েছো, না? আত্মহত্যা ভান ক'রে

খুব মৌজে আছো তুমি—যতোসব ভণ্ড, বদমাশ! সত্যি-সত্যি আত্মহত্যা করতে পারবে তুমি?' আমার মুখটা বেঁকে গেলো, আমি কোনো কথা বললাম না, বলতে পারলাম না। পারলাম না ঘ্যাঁক করে তার ঘাড়ের উপর কামড় বসিয়ে দিতে, কুকুরের মতো কুঁকড়ে চ'লে এলাম।